আমার দেখা বৃটিশ-ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ

মেজর (অবঃ) মোহাম্মদ আফসার উদ্দিন

আমার দেখা বৃটিশ-ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ

আমার দেখা বৃটিশ-ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ

মেজর (অবঃ) মোহাম্মদ আফসার উদ্দিন

বুলবুল প্রকাশনী

আমার দেখা বৃটিশ-ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ
মেজর (অবঃ) মোহাম্মদ আফসার উদ্দিন

প্রকাশক ঃ
আফসার উদ্দিন ফাউণ্ডেশনের পক্ষে
মোহাম্মদ মঈন উদ্দিন

বুলবুল প্রকাশনী
বাড়ী নং- ৫৩
সড়ক নং- ৩/এ
ধানমণ্ডি আ/এ,
ঢাকা- ১২০৯
ফোন - ৫০৬৮৬৮

প্রকাশকাল ঃ
১৭ই কার্তিক ১৪০০ বাংলা
১লা নভেম্বর ১৯৯৩ইং

BPATC LIBRARY
Accession No. 77744
Class No.
Source Cost

গ্রন্থস্বত্ব ঃ গ্রন্থকার

প্রচ্ছদ ঃ মৃণাল নন্দী

মূল্য ঃ
একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র
(১০ ডলার)

মেজর মুহাম্মদ আফসার উদ্দিন বৃটিশ ইন্ডিয়ান আর্মি (১৯৪৬) ইউনিফর্ম

উৎসর্গ ঃ

জাতি, ধর্ম, দল ও মত নির্বিশেষে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সকল ত্যাগী, দেশপ্রেমিক, সৎ, নির্ভীক ও জনদরদী বিগত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল রাজনীতিবিদকে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি।

লেখকের আব্বাজী মরহুম মোহাম্মদ ওসমান গণি

গ্রন্থকারের আম্মাজী মরহুমা সালেহা ওসমান গণি।

প্রকাশকের কথা

মেজর (অবঃ) মোহাম্মদ আফসার উদ্দীন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীর সৈনিক, সৎসাহসী দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ, ত্যাগ ও জনসেবায় অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব। তিনি মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত খাঁটি মুসলমান, বাঙ্গালী ও অসাম্প্রদায়িক। তার কিছু আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় ক্রিয়া কর্ম এক নজরে দেখার জন্য নিম্নে দেয়া হল।

ঐতিহাসিক ও আন্তর্জাতিক ক্রিয়া কর্ম ঃ

১। বাকেরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত হিজলা থানার শ্রীপুর গ্রামের অধিবাসী আলহাজ মেজর (অবঃ) মোহাম্মদ আফসার উদ্দীন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (১৯৩৯–১৯৪৫) এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন রণক্ষেত্রের বীর সেনানী। তিনি পাকিস্তানের পাঞ্জাব রেজিমেন্ট থেকে ১৯৫৬ সনে অবসর গ্রহণ করেন।

২। তিনি বিশ্ব প্রাক্তন সামরিক সংস্থার আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে যোগ দিতে ১৯৫৯ সনে ইটালীর রাজধানী রোমে এবং ১৯৬১ সনে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে যোগদান করেন। সেই বৎসরই লণ্ডনে অনুষ্ঠিত যুক্তরাজ্যের সকল প্রাক্তন সামরিক সংস্থার যুক্ত কনফারেন্সে যোগ দিতে আমন্ত্রিত হন।

৩। ইরাকের রাজধানী বাগদাদে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ইসলামী কনফারেন্সে তিনি একবার ১৯৮৫ সনে ও দ্বিতীয় বার ১৯৯১ইং সনে যোগদান করেন। তখন তিনি ইরাকের রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হোসেনের সাথে আন্তরিকভাবে সাক্ষাত লাভ করেন। বাগদাদে অবস্থানকালে তিনি বড়পীর হজরত আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) ইমাম হজরত আবু হানিফা (রঃ) ও হজরত মুসা কাজেমী (রঃ) মাজার জিয়ারত করেন ও দেশবাসী সকলের মঙ্গলের জন্য মোনাজাত করেন। তিনি তখন কারবালা, কুফা ও হজরত আলীর মাজার নজফ জিয়ারত করেন।

৪। তিনি চেয়ারম্যান সৈয়দ মাসুদ হোসেনের সংগে ১৯৫৮ সালে ইনল্যাণ্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (আই. ডব্লিউ. টি. এ) প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠান তাহাকে ১৯৬১ সালে সুইজারল্যাণ্ডে, ফ্রান্স, জার্মানী, লুকসেম্বার্গ, হল্যান্ড, ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে আভ্যন্তরীন নৌ চলাচল ও নৌ যানের উন্নয়ন প্রভৃতি জেনে আসার (ষ্ট্যাডি করার) জন্য পাঠান।

৫। তিনি দু'বার পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন (১৯৭৮ ও ১৯৮০ সন)।

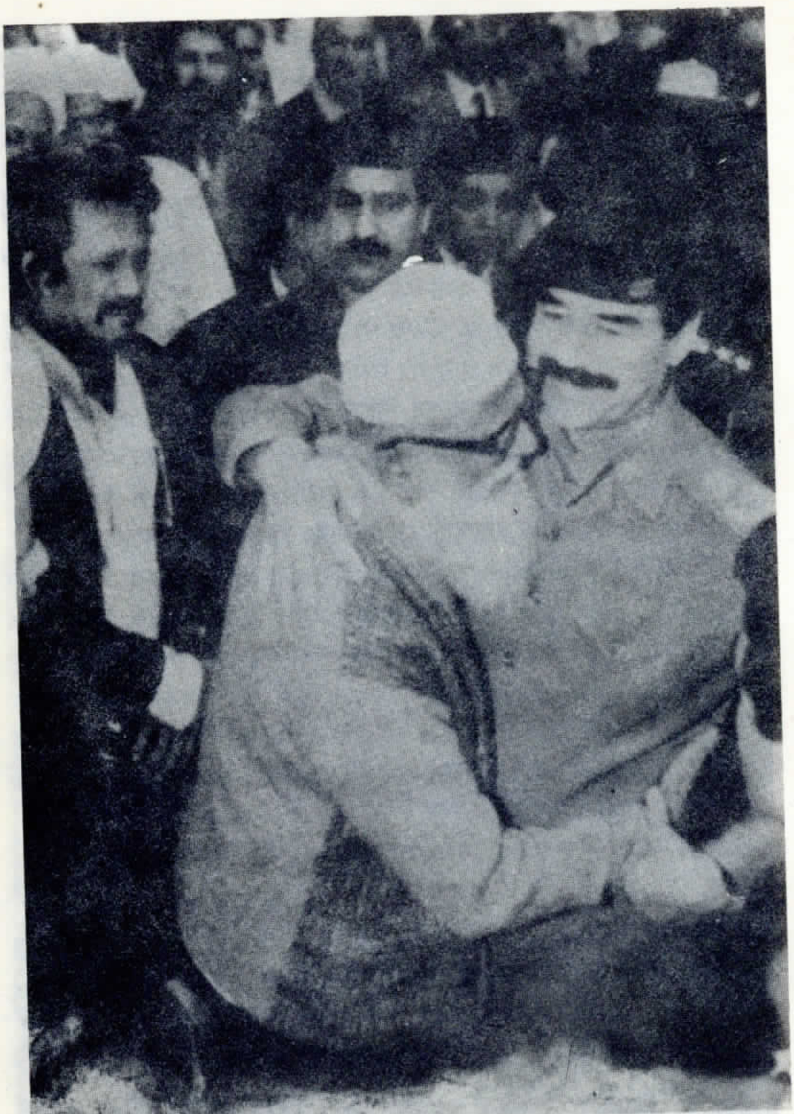

ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে গভীর আলিঙ্গনরত গ্রন্থকার বাগদাদে। (১১-১-৯১ইং)

৬। তিনি বাংলাদেশ মুজাহিদ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ইয়াসির আরাফাতের আহবানে ১৯৮০ সনে বাংলাদেশী মুজাহিদ নিয়ে পি, এল, ও এর সাথে যৌথভাবে ইসরাইলী ইহুদীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করেন।

৭। বাংলাদেশ মুজাহিদ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মেজর (অবঃ) মোঃ আফসার উদ্দীনের মহা বাংলাদেশ গড়বার দুইটি ঐতিহাসিক আহবান ঃ

(ক) বাংলাদেশ মুজাহিদ বাহিনী ঘোষণাপত্র ২

আপনারা যারা স্বাধীন বাংলাদেশের আশে পাশে পরাধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত জীবন অতিবাহিত করছেন, তাদের নিকট আমাদের প্রস্তাব – আসুন,স্বাধীনতাহীনতার-শৃংখল ভেঙ্গে ফেলে আপনাদের রাজ্য কয়টি নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে যোগ দিন। আমরা বাংলা ভাষা-ভাষী সকলে মিলে এক স্বাধীন, সার্বভৌম, অখন্ড, শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী মহাবাংলাদেশ গঠন করি। দুনিয়ার বুকে বাংলা ভাষা-ভাষীদের এক মহাজাতির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করি। এপার বাংলা, ওপার বাংলা, সকল বাংলা লীন হোক এক মহাবাংলাদেশে। আমরা আপনাদের সকলকে এই মহা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে আকুল আহবান জানাচ্ছি।

ভারতীয় আগ্রাসন প্রতিহত করতে ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তুলুন।

আলহাজ্ব মেজর (অবঃ) মোহাম্মদ আফসার উদ্দিন, সর্বাধিনায়ক

প্রধান কার্য্যালয়– বাড়ী নং – ৫৩ সড়ক নং ৩/এ, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা– ঢাকা

ভাইসব,
আসসালামু আলাইকুম।

বিগত ১০ই মার্চ ১৯৮০ সন ঢাকাস্থ ঐতিহাসিক বায়তুল মোকাররাম ময়দানে অনুষ্ঠিত এক মহতী জনসভায় আলহাজ্ব মেজর (অবঃ) মোহাম্মদ আফসার উদ্দীনের নেতৃতে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে বাংলাদেশ মুজাহিদ বাহিনী গঠন করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়েছে এবং সেই দিন মাগরিবের নামাজের পূর্বেই পবিত্র বায়তুল মোকাররাম মসজিদে বসে আল্লাহ্ ও রসূলের নাম নিয়ে মুজাহিদ বাহিনীতে লোক ভর্তি করা শুরু হয়েছে। সেই বছরই পি, এল, ও'র নেতা ইয়াসির আরাফাতের আহবানে বাংলাদেশ মুজাহিদ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আলহাজ্ব মেজর (অবঃ) মোহাম্মদ আফসার উদ্দীনের নেতৃত্বে মাসজিদুল আক্সাসহ ফিলিস্তিন রাষ্ট্র পুনরুদ্ধারের জন্য ইসরাইলের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে লেবানন গিয়েছে।

উদ্দেশ্যে ঃ

* বাংলাদেশে ইসলামী শরীয়ত ও সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ, জুলুম ও শোষণ বন্ধ করা।
* বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা নিশ্চিতকরণে জিহাদ করা।
* রুশ আক্রমণ প্রতিহত করতে ভ্রাতৃপ্রতিম আফগান মুজাহিদ বাহিনীকে সাহায্য করা।
* পবিত্র বায়তুল মোকাদ্দাস পুনরুদ্ধার করতে, ফিলিস্তিন রাষ্ট্র পুনঃ কায়েম করতে ও মুসলিম জাহানের যে কোন স্থানে অন্য কোন জাতির সম্প্রসারণকে প্রতিহত করতে জেহাদ করা।

প্রত্যেক মুজাহিদ আল্লাহর পথে জিহাদ করতে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছা প্রণোদিত ও অবৈতনিক হবেন। মুজাহিদগণ কোন ধর্মের লোকের প্রতি, দলের প্রতি, কারও প্রতি এমন কি শত্রুর প্রতিও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করতে পারবেন না। অতীতে এদেশে যত প্রকার হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংঘটিত হয়েছে মুজাহিদ বাহিনী তা ঘৃণা করে। যাতে উহার পুনরাবৃত্তি ঘটতে না পারে তার জন্য বাংলাদেশ মুজাহিদ বাহিনী অবিরাম চেষ্টা করে যাবে। সেবা ও ভালবাসাই হবে মুজাহিদ বাহিনীর বৈশিষ্ট্য।

অতীব দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, আমরা যতই বন্ধুতার হাত বাড়াইনা

কেন, আমাদের প্রতিবেশী ভারত সরকার আসমুদ্রহিমাচল এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে পরাশক্তি (সুপার পাওয়ার) হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। এই স্বপ্ন সফল করতে ভারত সরকার তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল, সিকিম, ভুটান, শ্রীলংকা ও বাংলাদেশকে তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়। তাই বাংলাদেশের বিভিন্ন নদীর উৎসমুখে ফারাক্কাসহ বহু বাঁধ-ব্যারাজ ও গোয়াইন তৈরী করে বাংলাদেশের মানুষকে খরা ও প্লাবনে মারতে চায়। তালপট্টি, আঙ্গুরপোতা ও দহগ্রাম প্রভৃতি জবর দখল তো করেই আছে এর পরেও বাংলাদেশকে ত্রি-খণ্ডিত করে এক খণ্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ও কক্সবাজার সহ), আর এক খণ্ড তথাকথিত স্বাধীন বঙ্গভূমি (সাবেক ফরিদপুর-কুষ্টিয়া-যশোহর বরিশাল-পটুয়াখালি ও খুলনা জেলা সমূহ, মংলা ও চালনা সমুদ্র বন্দরসহ) সৃষ্টি করে চিরতরে আমাদের ভারতের সাম্রাজ্যভূক্ত ক্ষুদ্র প্রদেশে পরিণত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বহু গুপ্তচর ও গেরিলা বাহিনী তৈয়ার করেছে। দিল্লী সরকারের নির্দেশ পাওয়া মাত্রই এই গেরিলা বাহিনী পরিকল্পনা মোতাবেক তৎপরতা শুরু করে দিবে। খুব সম্ভব প্রথম পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নরহত্যা, লুট-তরাজ ও শরণার্থী সমস্যা সৃষ্টি করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সামরিক তৎপরতার জন্য রিক্রুট পাওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করবে। তারপরে সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করার বিষয়বস্তু তৈয়ার করবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জানমাল ইজ্জত হুরমাত আমাদের নিকট পবিত্র আমানত। মুজাহিদ বহিনী এই পবিত্র আমানত রক্ষা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

প্রতিবাদ আর বিক্ষোভ করে ভারতের এই ঘৃণ্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বন্ধ করা যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করিনা। আমরা বিশ্বাস করি এর প্রতিকার ও প্রতিহত করতে। অতীতে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র পুনঃকায়েম করতে জিহাদ করেছি। এবার স্বদেশের পবিত্র স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করতে আবার জিহাদ করবো। প্রয়োজন হয় শহীদ হবো। ইনশাল্লাহ, মুজাহিদদের শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকতে বাংলাদেশের এক ইঞ্চি ভূমিও বিচ্ছিন্ন হতে দেবো না। আমাদের এ জিহাদ—স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার জিহাদ। আমাদের এই জিহাদ আত্মরক্ষার জিহাদ। তাই আমরা তথাকথিত স্বাধীন বঙ্গভূমি পূর্ব ঘোষিত ২২ শে জুলাই' ৮৯ আমাদের যশোর জিলার অভ্যন্তরে আগ্রাসন প্রতিহত করতে সর্বাধিনায়ক আলহাজ্জ মেজর (অবঃ) মোহাম্মদ আফসার উদ্দীনের নেতৃত্বে, উপ-সর্বাধিনায়ক এডভোকেট নূরুল হক মজুমদার, উপ-সর্বাধিনায়ক মোঃ রফিকুল ইসলাম ও উপ-সর্বাধিনায়ক এস, এম, নুরুন্নবীসহ বাংলাদেশ মুজাহিদ বাহিনী

২২ শে জুলাই স্থানীয় জনগণসহ সকাল দশ ঘটিকায় যশোর শহর হতে ঝিকরগাছা, নাভারন ও শার্শা হয়ে বেনাপোল সীমান্তে লং মার্চ করতে যায়। স্থানীয় হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ জনতার ঢল লং মার্চে যোগ দেয়। মুজাহিদ বাহিনী ও জনতার সংগ্রামী রুদ্র রোষের খবর পেয়ে বঙ্গসেনারা এবারের আগ্রাসন স্থগিত রেখে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। ভবিষ্যতে আর যাতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আগ্রাসনের সাহস না করে সেজন্য আমাদের সদা অতন্দ্র প্রহরীর মত প্রস্তুত থাকতে হবে।

আমাদের সর্বাধিনায়ক মেজর (অবঃ) মোঃ আফসার উদ্দিনের হুঁসিয়ারী ঃ

* এতদ্বারা আমি বাংলাদেশ সরকারকে হুঁসিয়ার করে দিতে চাই যে, দেশপ্রমিক জনদরদী কর্মী জননেতাদের গ্রেফতার, হুলিয়া, হয়রানি বন্ধ করুন। দুষ্কৃতকারী, কালোবাজারী, হিরোইন ব্যবসায়ী, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ধ্বংসকারী ও বিদেশী গুপ্তচর, গেরিলা ও দালালদের কঠোর হস্তে দমন করুন।
* যে সব ভারতবাসী মুসলমান ১৯৪৭ হতে ১৯৮৯ ইং পর্যন্ত পৈত্রিক সম্পত্তি বিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে তাদের জায়গা জমি যাতে আইনমত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পেতে পারে এবং তাদের পুনর্বাসন করার জন্য সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।
* সকল দল ও দেশপ্রেমিক জনগণকে ভারতীয় আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহবান জানাচ্ছি।
* নিশ্চুপ ঘুমন্ত সরকার শোন, এদেশের স্বাধীনচেতা জনগণ শ্রীলংকার ''জয়বর্ধন নাটক'' মঞ্চায়িত হতে দিবে না। জাগো, উঠ, কোমর বাঁধ, দেশকে জঙ্গী জিহাদের জন্য তৈরী কর।

এই প্রসংগে আমরা সারা বিশ্বের বাংলা ভাষা-ভাষী সকল ভাই বোনদের বলতে চাই যে পৃথিবীতে বাঙ্গালীদের একটি মাত্র স্বাধীন দেশ— বাংলাদেশ। বাংলাদেশের নামে বাঙ্গালী জাতি বিশ্বে পরিচিত। স্বাধীন বাংলাদেশ না হলে জাতিসংঘে বা বিশ্ব মানব সমাজে বাঙ্গালীদের আলাদা কোন পরিচয় থাকত না। কাজেই কোন খাঁটি বাঙ্গালী সন্তান যদি তার বাঙ্গালী জাতিত্বে ও মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলতে গর্ব অনুভব করে, সে কখনও দিল্লীর প্ররোচনায় স্বাধীন বাংলাদেশকে ভেঙ্গে ত্রি-খণ্ডিত করে তথাকথিত স্বাধীন বঙ্গভূমি ও স্বাধীন

পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে দুটি আলাদা রাষ্ট্র কায়েম করতে সাহায্য করতে পারে না। যদি কেউ করে, সে হবে এই যুগের মীর জাফর, জগৎ শেঠ, উমি চাঁদ, রায় বল্লভ বা ঘসেটি বেগম।

আপনারা যারা স্বাধীন বাংলাদেশের আশে পাশে পরাধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত জীবন অতিবাহিত করছেন, তাদের নিকট আমাদের প্রস্তাব— আসুন, স্বাধীনতাহীনতার-শৃংখল ভেঙ্গে ফেলে আপনাদের রাজ্যকয়টি নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে যোগ দিন। আমরা বাংলা ভাষা-ভাষী সকলে মিলে এক স্বাধীন, সার্বভৌম, অখন্ড, শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী মহাবাংলাদেশ গঠন করি। দুনিয়ার বুকে বাংলা ভাষা-ভাষীদের এক মহাজাতির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করি। এপার বাংলা, ওপার বাংলা, সকল বাংলা লীন হোক এক মহাবাংলাদেশে। আমরা আপনাদের সকলকে এই মহাবাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে আকুল আহবান জানাচ্ছি।

তাই প্রাক্তন সামরিক, বি-ডি-আর, পুলিশ, আনসার ও মুক্তি বাহিনীর সদস্য ও জনগণকে নিয়ে প্রতি জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, স্কুল, কলেজ, ইউনিভারসিটি, মিল, ফ্যাক্টরী, মসজিদ, মাদ্রাসা ও গ্রাম পর্যায়ে মুজাহিদ বাহিনী সুসংগঠন করে প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য দুর্গ তৈরী করার অনুরোধ করছি। বিদেশী গুপ্তচর ও গেরিলাদের প্রতিহত করতে আহবান জানাচ্ছি। সংশ্লিষ্ট আইন ও শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করতে আহবান জানাচ্ছি।

আল্লাহ আমাদের সহায় হউন। নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়াফাতহুন ক্বারীব।

মুজাহিদ বাহিনী জিন্দাবাদ। বাংলাদেশজিন্দাবাদ।

নূরুল হক মজুমদার এডভোকেট
উপ-সর্বাধিনায়ক

মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপ-সর্বাধিনায়ক

এস, এম নুরুন্নবী
উপ-সর্বাধিনায়ক

বাংলাদেশ মুজাহিদ বাহিনীর প্রচার দপ্তর এর পক্ষে ফয়েজ আহম্মদ ও আলমগীর মিয়া কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। প্রধান কার্য্যালয়–বাড়ি নং ৫৩, সড়ক নং ৩/এ, ধানমণ্ডি আ/এ ঢাকা।
১ লা আগষ্ট–১৯৮৯

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ মহা বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এন. ডি. পি) সভাপতি
মেজর (অবঃ) মোঃ আফসার উদ্দীন-এর

মহা বাংলাদেশ গড়ার আহবান

আপনারা যারা স্বাধীন বাংলাদেশের আশে পাশে পরাধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত জীবন অতিবাহিত করছেন, তাদের নিকট আমাদের প্রস্তাব— আসুন, স্বাধীনতাহীনতার-শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলে আপনাদের রাজ্য কয়টি নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে যোগ দিন। আমরা বাংলা ভাষা-ভাষী সকলে মিলে এক স্বাধীন, সার্বভৌম, অখণ্ড শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী মহা বাংলাদেশ গঠন করি। দুনিয়ার বুকে বাংলা ভাষা-ভাষীদের এক মহাজাতির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করি। এপার বাংলা, ওপার বাংলা, সকল বাংলা লীন হোক এক মহা-বাংলাদেশে।

বাংলা ভাষাভাষী ভাই ও বোনেরা,
আমার সশ্রদ্ধ সালাম নিন।

অতীব দুঃখের বিষয় যে, আমাদের বাংলা ভাষা-ভাষী যে সব ভাই বোনেরা ভারতে বসবাস করছেন তারা সকলে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অবাংগালীদের হাতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ভাষাগত দিক দিয়ে নিগৃহীত হচ্ছেন। ঘরে মাতৃভাষা বাংলা বললেও কলিকাতার রাজপথে বা অফিসে হিন্দিতে কথা বলতে বাধ্য হন। স্বাধীনতাত্তোর এই দীর্ঘ দিনে আজ পর্যন্ত একজন বাংগালীকে ভারতের রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী বা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী দিল্লী সরকার করলেন না। উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত, রাজপুতনার মরুভূমিসমূহ উত্তরোত্তর কৃষি ও শিল্পে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠলেও বাংগালী অধ্যুষিত পশ্চিম বাংলা এবং ত্রিপুরা স্টেট দিন দিন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হতে চলছে। এভাবে আরো কিছুদিন চলতে থাকলে বাংগালী জাতির অবশিষ্ট আর্থিক স্বচ্ছলতা, ভাষা, কৃষ্টি, এমনকি বাংগালী জাতির পরিচয়টুকু পর্যন্ত হারাবার সম্ভাবনা আছে। বাংগালী জাতির অতীত

গৌরব, ভাষা ও কৃষ্টি একমাত্র বাংলাদেশই যতটুকু সম্ভব সমুজ্জ্বল করে ধরে রাখছে এবং ভবিষ্যতেও রাখবার সম্ভাবনা আছে।

দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, তাই দিল্লী সরকার বাংলাদেশকে ত্রি-খণ্ডিত করে এক খণ্ড তথাকথিত স্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম, (চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ও কক্সবাজারসহ), আর এক খণ্ড স্বাধীন বংগভূমি (সাবেক ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোহর, বরিশাল, পটুয়াখালি ও খুলনা জিলাসমূহ, মংগলা ও চালনা সমুদ্র বন্দরসহ) সৃষ্টি করে চিরতরে বাংলাদেশকে ভারতের সাম্রাজ্যভূক্ত ক্ষুদ্র প্রদেশে পরিণত করার করার পরিকল্পনা নিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে আমরা সারা বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী সকল ভাই বোনদের বলতে চাই যে, পৃথিবীতে একটি মাত্র স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের নামে বাংগালী জাতি বিশ্বে পরিচিত। স্বাধীন বাংলাদেশ না হলে জাতিসংঘে বা বিশ্ব মানব সমাজে বাংগালীদের আলাদা কোন পরিচয় থাকত না। কাজেই কোন খাঁটি বাংগালী সন্তান যদি তার বাংগালী জাতিতে ও মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলতে গর্ব অনুভব করে, সে কখনও দিল্লী সরকারের প্ররোচনায় স্বাধীন বাংলাদেশকে ভেঙ্গে ত্রি-খণ্ডিত করে তথাকথিত স্বাধীন বংগভূমি ও স্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে দু'টি আলাদা রাষ্ট্র কায়েম করতে সাহায্য করতে পারে না। যদি কেউ করে সে হবে এই যুগের কুখ্যাত মীর জাফর, জগৎ শেঠ, উমি চাঁদ, রায় বল্লভ বা ঘসেটি বেগম। আপনারা যারা স্বাধীন বাংলাদেশের আশে পাশে অবাংগালী দিল্লী সরকারের হাতে পরাধীনতার নিগড়ে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত জীবন অতিবাহিত করছেন, তাদের নিকট আমাদের প্রস্তাব–আসুন, স্বাধীনতাহীনতার-শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলে আপনাদের রাজ্য কয়টি নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে যোগ দিন। আমরা বাংলা ভাষা-ভাষী সকলে মিলে এক স্বাধীন, সার্বভৌম, অখন্ড, শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী মহা বাংলাদেশ গঠন করি। দুনিয়ার বুকে বাংলা ভাষা-ভাষীদের এক মহাজাতির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করি। এপার বাংলা, ওপার বাংলা, সকল বাংলা লীন হোক এক মহা বাংলাদেশে।

আমরা যদি হিন্দু, মুসলিম ও বৃটিশ আমলে সকল ধর্মাবলম্বিরা (হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান) একত্রে সুখে-দুঃখে এক বাংলাদেশের মাটিতে বসবাস করতে পেরে থাকি, তবে আজও পারব। কোন স্বার্থান্বেষীর বাধা আমরা মানবোনা। বৃটিশ শাসন আমলে যেভাবে বংগ-ভংগ ১৯১১ সনে রদ করা হয়েছিল, সেভাবেই ১৯৪৭ সনের দিল্লী সরকারের বাংগালী জাতিকে বিভক্ত করার হীন কুটনীতির কুফল বংগ-ভংগ আইন রদ করা হবে, সকল বাংলা ভাষাভাষী এক বাংগালী

জাতি। আমাদের জাতীয় স্বকীয়তা রক্ষা করতে এবং এক মহা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে বাংলা ভাষাভাষী সকল ভাই বোনদের আকুল আহবান জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

মেজর মোহাম্মদ আফসার উদ্দীন

সভাপতি
ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি বাংলাদেশ,
প্রধান কার্য্যালয় ঃ
বাড়ী ৫৩, সড়ক ৩/এ, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা।
১লা ডিসেম্বর, ১৯৯২ ইং

জাতীয় ক্রিয়া কর্ম

৮। স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের উভয় অংশের রক্ষণ ব্যবস্থা মজবুত করতে তিনি মরহুম মেজর গনির সাথে একত্রে ১৯৪৮ সনে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন করেন। এই রেজিমেন্টের অফিসার মেজর (পরে লেঃ জেনারেল ও রাষ্ট্রপতি) জিয়াউর রহমান আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ও মুক্তিযুদ্ধের জন্য দেশবাসীকেআহবানকরেন।

৯। পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৫০ সনে তিনি ঢাকা ইউ, ও, টি সির এ্যাডজুটেন্ট হিসাবে নিযুক্ত হন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে ঢাকার ইউ, ও, টি সির একটি কোম্পানীর স্থানে একটি ব্যাটালিয়ন মঞ্জুর হয় এবং ঢাকা ইউ, ও, টি. সির বর্ধিত করার মূখ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এবং সে মতে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমাদের ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর সারা বাংলাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মঞ্জুর হয়।

১০। খুব সম্ভব ১৯৫৪ সনের দিকে তাঁকে যে সব ভারতীয় সামরিক কর্মচারি পূর্ব পাকিস্তানে অপট্ করেন তাদের দিনাজপুর জেলার ঘোড়া-ঘাট থানার এবং রংপুর জেলার গবিন্দগঞ্জ থানার কিছু অংশে ঐ সব ভারত থেকে আগত সামরিক বাহিনীর লোকদের পুনর্বাসনের জন্য উত্তর বঙ্গে পোষ্টিং করেন। তিনি বহু কষ্ট করে জংগলময় এলাকা বুলডোজার দিয়ে পরিষ্কার করে বর্তমান নেছারাবাদ, মালিকাবাদ, নুরজাহানপুর, খোদাদাদপুর, ওসমানপুর ও আফসারাবাদ আদর্শ গ্রাম স্থাপন করেন।

১১। মহিমাগঞ্জ সুগার মিল স্থাপন করার জন্য বড় বড় ও ভারী ভারী যন্ত্রপাতি মহিমাগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশনে পড়ে থেকে জংপড়ে যাচ্ছিল। কারণ মহিমাগঞ্জ সুগার মিলের এত ভারী ও বড় যন্ত্রপাতি নেওয়ার উপযুক্ত লরি

বা ট্রান্সপোর্ট ছিল না। এই অবস্থা দেখে মেজর আফসার উদ্দিন তাঁর মিলিটারী বড় বড় ট্রাক দিয়ে এই মালগুলি বহন করে স্টেশন থেকে মহিমাগঞ্জ সুগার মিলে পৌছে দেন। এইভাবে মহিমাগঞ্জ সুগার মিল প্রথম চালু হওয়ার জন্য তিনি বিরাট অবদান রাখেন।

১২। তিনি স্বৈরতন্ত্র শাসনের অবসানের জন্য ১৯৮৬ সনে প্রেসিডেন্ট হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বলাবাহুল্য নির্বাচনে সীমাহীন কারচুপি ও মিডিয়া ক্যুর মারফতে মিঃ এরশাদ তাকে পরাজিত করেন। মেজর (অবঃ) মোঃ আফসার উদ্দীন ব্যতীত আর কোন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এবং পাকিস্তান জাতীয় সংসদের অভিজ্ঞ ব্যক্তি রাজনীতির অঙ্গনে নেই বা বেঁচে নেই।

১৩। হিজলা মুলাদী ও মেহেন্দীগঞ্জ থানা এলাকা হতে তিনিই সর্ব প্রথম পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন (১৯৬২ সনে)। এর পূর্বে এই এলাকা হতে অন্য এলাকাবাসী এমনকি অন্য জেলাবাসী পর্যন্ত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হতেন। পাকিস্তান সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর তিনিই এই এলাকাবাসীর মধ্যে সর্বপ্রথম পাকিস্তানে পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী (প্রতিমন্ত্রী) নিযুক্ত হন। ঐ সময় তিনি ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে আরও বর্ধিত, পূর্ব পাকিস্তান রক্ষণ ব্যবস্থা আরও মজবুত, সামরিক বাহিনীতে নগণ্য ৫% থেকে বাড়িয়ে অন্তত পক্ষে ৫০% পূর্ব পাকিস্তানবাসী ভর্তি করা, পাকিস্তান রক্ষণব্যবস্থা আরও মজবুত করতে অরক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানে পদাতিক, নৌ, ও বিমান বাহিনীর যুক্ত সামরিক বাহিনীর অপারেশনাল হেড কোয়ার্টার্স স্থাপন এবং পর্যাপ্ত সামরিক বাহিনী মোতায়েন রাখা, প্রত্যেক সামরিক বিভাগের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের মত পূর্ব পাকিস্তানেও ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন, বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষাদান ও গ্রাম গঞ্জে গণবাহিনী গঠন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

চিন্তাবিদ ও গ্রন্থকার

১৪। 'তিনি আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ' 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও আমার সৈনিক জীবন' এবং 'আমার দেখা বৃটিশ-ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ' তিন খানা বই লিখেছেন। আরও কিছু বই লেখার উপাদান তাঁর কাছে মওজুদ আছে। তিনি বেশ কিছু সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে অত্যাধুনিক চিন্তা প্রসূত সারগর্ভ বক্তৃতা ও লেখা পেশ করেছেন। ইরানের বর্তমান ইসলামী সরকার

প্রতিষ্ঠাতা বিপ্লবী নেতা আয়েতুল্লাহ্ রুহুল্লাহ খোমেনী, সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভ, মার্কিনী সাবেক প্রেসিডেন্ট– জর্জ বুশকে তাদের শাসন নীতির সমালোচনা করে কয়েকটি চিঠি দিয়েছেন।

তিনি ইসলামী ফাউন্ডেশন, বাংলা একাডেমির, মসজিদ সমাজ বাংলাদেশ ও প্রবীণ হিতৈষী সংঘের আজীবন সদস্য।

শরীর চর্চা

১৫। তিনি এই বৃদ্ধ বয়সেও নিয়মিত প্রত্যুষে উঠে নামাজ কালাম শেষ করে প্রাতঃভ্রমণে দুই আড়াই মাইল হাঁটেন ও জগিং করেন। তারপরে ঘরে এসে কিছু শরীর চর্চা করেন। এই জন্য তিনি ধানমন্ডি শতায়ু অংগনের আজীবন সদস্য ও ধানমণ্ডি ওয়ার্কার্স ক্লাবের সাধারণ সদস্য।

বাকেরগঞ্জ জেলার উন্নয়নের প্রচেষ্টা ঃ

১৬। তার বিশেষ উদ্যোগে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল রহমতপুরে সুপারী গবেষণা ইনষ্টিটিউট, গৌরনদী কলেজ, পাতারহাট আর, সি কলেজ ও মুলাদী কলেজ স্থাপিত হয়।

১৭। তার একক চেষ্টায় হিজলা, মুলাদী ও মেহেন্দীগঞ্জ থানায় বেতার টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস স্থাপন করা হয়।

হিজলা থানার উন্নয়নে তার অবদান ঃ

১৮। বহু বৎসর পূর্বে হিজলা থানা বদরটুনী মৌজায় থাকাকালীন এই থানার নাম ছিল বদরটুনী থানা। বদরটুনী মৌজা কালক্রমে মেঘনা নদী গর্ভে বিলীন হওয়ার পর এই থানা সাবেক হিজলা মৌজায় স্থানান্তরিত হলে পরে এর নাম বদলী করে মৌজার নাম অনুসারে "হিজলা থানা" নাম রাখা হয়। কালক্রমে সাবেক হিজলা মৌজা মেঘনা নদী গর্ভে বিলীন হওয়ার পর তিনিই হিজলা থানাকে ১৯৬৩ সনে শ্রীপুর মৌজায় বর্তমান স্থানে নিজ খরচে থানার জন্য টিনের ঘর তুলে পুনঃস্থাপিত করেন। সহযোগিতায় ছিলেন জনাব মরহুম সা'দত হোসেন ব্যাপারী, জনাব মোঃ শামসুদ্দিন ও জনাব সৈয়দ মকবুল হোসেন মানিক মিয়া। পরে তারই তদবীরে এই থানার সকল ঘর সরকার দালান করে দেয় কিন্তু আজ প্রায় ৩০ বৎসর অতিবাহিত হতে চলল থানার পুরানো নাম বর্তমান মৌজার নামে শ্রীপুর থানা না হয়ে হিজলা থানাই রয়ে গেল কেন তার কোন যুক্তি নেই।

১৯। তিনি এই থানার দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি সরকারকে দান করেন এবং সরকার কর্তৃক পাকা দালান তৈরী করার তদবির করেন। যতদিন এই থানায় হাসপাতাল মঞ্জুর না হয়, ততদিন এই দাতব্য চিকিৎসালয়ই হিজলা থানার আপামর জনসাধারণের খেদমত করে। পরে অবশ্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হয়।

২০। এই থানার ডাক বাঙ্গলো স্থাপন করতে তিনি সরকারকে ৪০ শতাংশ জমি দান করেন। এই জমির উপরে তারই চেষ্টায় পরবর্তীতে দালান তৈরী হয়। এই থানার ৩/৪ মাইলের মধ্যে কলেজ তো দূরের কথা কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও না থাকাতে তিনি নিজ খরচে থানা সদরে ১৯৬৯ সনে সংহতি (পাইলট) মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই উদ্যোগে যথেষ্ট সযোগিতা করেন জনাব সৈয়দ মকবুল আলম মানিক মিয়া ও পণ্ডিত জমশেদ সাহেব।

২১। তার ঐকান্তিক চেষ্টায় ও এককালীন ৫০,০০০/= (পঞ্চাশ হাজার) টাকা দানে হিজলা কলেজটি স্থাপিত হয় এবং পরীক্ষার সেন্টার মঞ্জুর করা হয়।

২২। তারই একক চেষ্টায়ও প্রায় ৫,০০,০০০/= (পাঁচ লক্ষ) টাকা ব্যয়ে হিজলা থানা সদরে নিজ মৌজা শ্রীপুরে আফসার উদ্দীন সিনিয়র মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ফাজেল পর্যন্ত পরীক্ষার সেন্টার মঞ্জুর হয়। তারই ঐকান্তিক চেষ্টায় মিশর সরকারের সহায়তায় ঐতিহাসিক আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় হতে এক দক্ষ মিশরী প্রফেসর এই মাদ্রাসায় শিক্ষকতার জন্য আনা হয় এই নজীর বিহীন সুযোগ বাংলাদেশে আর কোন মাদ্রাসায় আজও হয়নি। এই মাদ্রাসা স্থাপনে তার সাথে একান্ত সহযোগিতা করেন তার সহোদর ভাই জনাব মোহাম্মদ শামসুদ্দিন, মৌলানা শাহে আলম, সৈয়দ মকবুল আলম মাকিন মিয়া, আব্দুল হাকিম বাঘা ও আরো অনেকে।

২৩। তারই দানকৃত জমির উপরে সরকারী মঞ্জুরী প্রাপ্ত "সালেহা ওসমান গণি শিশু সদন (এতিমখানা)" এই থানা সদরে অবস্থিত। আলহাজ্ব মেজর মোহাম্মদ আফসার উদ্দীন নিজের টাকা পয়সা ও জমিজমা দান করে এই নূতন থানার (১৯৬৩ সন) ডাক বাঙ্গলো, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, এতিমখানা ও ডাকঘর প্রভৃতি সবকিছু নিজহাতে গড়ে তুলেছেন, বাকেরগঞ্জ জেলা ও জাতীয় উন্নয়নে জনগণের কল্যাণকর বহু অবদান রেখেছেন।

১. ১০. ১৯৯৩ — প্রকাশক

গ্রন্থকারের আরজ

আল্লাহ্তায়ালার অসীম রহমতে আমার লেখা 'আল্লাহ্র 'আদেশ ও নিষেধ', 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও আমার সৈনিক জীবন' 'আমার দেখা বৃটিশ-ভারত,পাকিস্তানও বাংলাদেশ নামক এই তিনখানি বই মুদ্রণ সম্পন্ন করে পাঠকদের সামনে পেশ করতে পারার জন্য আল্লাহ্তায়ালাকে অসীম শুকরিয়া আদায় করছি।

আমার স্মৃতিপটে সঞ্চিত দীর্ঘ প্রায় পৌনে এক শতাব্দীর এই উপমহাদেশের তিন দেশ– ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মধ্যে যাহা আমার স্মরণে সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে তাহা এই বইতে লিপিবদ্ধ করেছি। অন্য কেহ হয়ত এই ঘটনাবলি অন্যভাবে পেশ করবেন কিন্তু গণতন্ত্র আমাকেও অধিকার দিয়েছে যে, যাহা সত্য বলে জানব তাহা বলিষ্ঠ ও সঠিকভাবে বলব। কাজেই আমার বইটি প্রথমে পড়ার জন্য সহৃদয় পাঠকবর্গকে অনুরোধ করছি। তারপরে তাঁরা যেন বিবেচনা করেন আমার লেখাগুলি ঐতিহাসিক সত্য ও যুক্তিযুক্ত হলো কিনা। কারো মনে ব্যাথা দেয়ার জন্য আমি এই বইতে এমন কিছু লিখিনি। আর্য্য, অনার্য্য, বর্ণ হিন্দু, ভারতীয় কংগ্রেস, গান্ধিজী, পণ্ডিত নেহেরু, সর্দার প্যাটেল, মুসলিম লীগ, কায়েদে আজম জিন্নাহ্ ও তাঁর সহযোগী নেতৃবর্গ, বৃটিশজাতি, গভর্ণর জেনারেল লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন, পাঞ্জাবি, পাঠান ও বাংলাদেশের অতীত ও বর্তমান শাসন আমলের বিরুদ্ধে অনর্থক ও অসত্য এমন কিছু লিখি নাই যাতে কারো মনে ব্যথা লাগতে পারে। যাহা সত্য বলে জেনেছি, বুঝেছি, তাহাই সঠিকভাবে বর্ণনা করেছি। তবুও যদি কোন সম্প্রদায়, রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তি আমার লেখাতে মনে ব্যথা পেয়ে থাকেন তা'হলে আমি তাঁদের নিকট পূর্বেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

বৃটিশ ভারত স্বাধীন হওয়ার পরেও আমি তিনমাস ভারত ভূখণ্ডে চাকুরিরত ছিলাম। তখন যদিও ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন হয়েছিল তবুও বৃটিশ রাজের প্রতিনিধি লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত ছিলেন, যাহার নিযুক্তিপত্র ভারত সরকার নয়, স্বয়ং বৃটিশ সরকার দিয়েছিলেন, এবং আরো বহু চাকুরিরত বৃটিশ নাগরিক ভারতে সামরিক ও বেসামরিক বিভাগে চাকুরিরত ছিলেন। নব্য স্বাধীন ভারতে পরিবেশ যেন বৃটিশ রাজত্বের মতই আমার অনুভূত হচ্ছিল। তাই আমার দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা বৃটিশ ভারতই এই বইতে বর্ণনা করেছি।

প্রায় সোয়া দুইশত বছর পূর্বে যেই– আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভারতের মতই

বৃটিশ শাসনাধীন কলোনী ছিল। তারা প্রথমে মাত্র তেরটি অংগ রাজ্য নিয়ে বৃটিশ সরকারের নিকট হতে স্বাধীনতা লাভ করেছিল। আজ সেই যুক্তরাষ্ট্র ক্রমাগত বেড়ে বেড়ে অর্ধশতাধিক অংগ রাজ্য নিয়ে পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ শক্তিশালী (সুপার পাওয়ার) দেশে পরিণত হল। পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি বড় ও আরো শক্তিশালী হওয়ার জন্য শিথিল ফেডারেশন গঠন করে ব্রাসেল্সে স্ব-স্ব রাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোটে এক ইউরোপীয়ন পার্লামেন্ট গঠন করেছে। আবার এখন এক মুদ্রা ও এক বাণিজ্য ব্যবস্থা স্থাপনের চেষ্টা হচ্ছে।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কৌশলে কূটনৈতিক প্রভাবে এই ইউরোপীয়ান রাষ্ট্রগুলি এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলিকে ছোট, আরো ছোটো রাষ্ট্র করবার চেষ্টা করছে, যেমন– ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে ভেঙ্গে ইস্রাইলের সৃষ্টি, সিরিয়াকে ভেঙ্গে লেবাননের সৃষ্টি, ইরাককে ভেঙ্গে কুয়েতের সৃষ্টি ইত্যাদি। তেমনি ভারতকে ভেঙ্গে পাকিস্তান, তারপরে পাকিস্তানকে ভেঙ্গে বাংলাদেশ তারপরেও বাংলাদেশকে ভেঙ্গে তথাকথিত স্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশের পশ্চিম অংশে স্বাধীন বঙ্গভূমি নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য সম্প্রসারণবাদীদের অপচেষ্টা চলছে। এককালের শক্তিশালী (সুপার পাওয়ার) কমিউনিস্ট রাশিয়া পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার চাপে খণ্ড বিখণ্ডিত। তবুও তারা আবার বড় ও শক্তিশালী হওয়ার জন্য সংসদের ভিতরে ও বাইরে চেষ্টা করছে।

মূলতঃ যেই বৃটিশ জাতি তাদের শাসন আমলে বৃহত্তম ভারত সম্রাজ্য স্থাপন করেছিল, তারাই এই উপমহাদেশ থেকে চিরবিদায় নেওয়ার পূর্বে ভারত উপমহাদেশকে খণ্ড বিখণ্ডিত করার বীজ বপন করে গেল। সেই বিখ্যাত বৃটিশ কূটনীতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বলকান রাষ্ট্র খণ্ড বিখণ্ডিত করল। তাতেও তারা সন্তুষ্ট রইলো না। এখন তারা স্বাধীনতার নামে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে যুগোস্লোভিয়া রাষ্ট্রকে ভেঙ্গেচুরে খানখান করে ছোট ছোট আরো ছোট বসনিয়া-হারজোগোভিনিয়া, সার্ভিয়া, ক্রোশিয়া, নামক তাবেদার রাষ্ট্র সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

ভারতীয় আর্য্য ও বর্ণ-হিন্দুদের মত যারা বলে যে– ভারত আসমুদ্র হিমাচল এক হিন্দু রাষ্ট্র, এখানে মুসলমান বা অন্য কোন ধর্মাবলম্বিকে হিন্দু হয়ে থাকতে হবে, নতুবা ভারত ছেড়ে যেতে হবে। সেইরূপ বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী জন মেজর মুসলিম বিদ্বেষের কারণে বলেই ফেল্‌ল যে খৃষ্টান ইউরোপের বুকে কোন স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র সহ্য করা হবে না। (দৈনিক ইনকিলাব তারিখ ২৮–৫–৯৩ইং ও সমকালীন অন্যান্য পত্রিকা দ্রষ্টব্য]

পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকা যখন বড় আরো বড় শক্তিশালী হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, এশিয়া ও আফ্রিকাতে স্বাধীনতার টোপ গিলিয়ে ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র তাবেদার রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হচ্ছে। বড় হওয়ার কার না সাধ হয়? আমাদেরও মান সম্মান ও ঐতিহ্য নিয়ে টিকে থাকতে হলে বড় ও শক্তিশালী হতে হবে। কিন্তু এজন্য বাধা আর্য ও বর্ণবাদী হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি যে কারণে দিল্লীর সরকারের সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারিগণের নাকের ডগা ও চোখের সামনে সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা চারিশত বছরের ঐতিহ্যবাহী অযোধ্যার পবিত্র বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে নিশ্চিহ্ন করে দিল। তারপরে সেখানে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা করে পূজা অর্চনা শুরু করে দিল। কাটা ঘায়ে নুন ছিটানোর মত এলাহাবাদ হাইকোর্ট রায় দিল যে– ঐ মসজিদের স্থানে মুসলমানরা নামাজ পড়তে পারবে না। কিন্তু হিন্দুরা পূজো করতে পারবে। যে দেশের উচ্চ আদালতের (হাইকোর্টের) মহা বিচারকগণ এত সাম্প্রদায়িক, সে দেশে সাম্প্রদায়িকতা কত ভয়াবহ তাহা বুদ্ধিমান পাঠকের বিবেচনার উপর ছেড়ে দিলাম।

বৃটিশ আমলে ভারত বিশাল ও শক্তিশালী ছিল। একে টুকরা টুকরা করে দিল উগ্র সাম্প্রদায়িক বর্ণবাদী হিন্দু সম্প্রদায়। ভারত যদি কোন দিন ফেডারেশন বা কনফেডারেশন যে আকারেই হউক, এই উপমহাদেশকে একতাবদ্ধ দেখতে চায় তবে ভারতের বর্ণবাদী হিন্দুগণমনে পূর্বে তাদের মনের বিশালতা আনতে হবে। অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মের নামে মানুষে মানুষে হানাহানি চিরতরে বন্ধ করে, শুধু কথায়ই নয় কাজেও প্রমাণ করতে হবে। এই উপমহাদেশের সকল মানুষ সুখে দুঃখে, আপদে-বিপদে, ভাইয়ে-ভাইয়ের মত একসাথে থাকবে, একসাথে মনে প্রাণে এই উপমহাদেশের মঙ্গলের জন্য, উন্নতির জন্য কাজ করবে। যতদিন ভারতের হিন্দুগণমনে এই পরিবর্তন না আসবে দিল্লীর সম্প্রসারণবাদী যে কোন পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য হবে।

হিন্দু আমলেও অবিভক্ত বঙ্গদেশবাসীকে আর্য্যরা একটি আলাদা হীন জাতি বলে মনে করত। উত্তর ভারতের বর্ণ হিন্দুরা বঙ্গদেশে আসলে দেশে ফিরে গেলে তাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো। এইভাবে বঙ্গদেশকে হিংসা করে ব্রাহ্মণ ও বর্ণ হিন্দুরাই একটা আলাদা দেশে পরিণত করেছিল। সুলতানী মুসলিম আমল হতে এই জনগোষ্ঠী বাঙ্গালী জাতি বলে আখ্যায়িত হতে লাগল। বাঙ্গালিদের মুখের ভাষা বাংলাভাষা বলে প্রথম বারের মত সংরক্ষিত হল। সেই মুসলিম আমল থেকে বৃটিশ আমলেও অবিভক্ত বঙ্গ একমাত্র "দেশ" নামে অর্থাৎ বঙ্গদেশ নামে সারা ভারতে সরকারি দলিলপত্রে পরিচিত ছিল। বৃটিশ আমলে ভারতে আর কোন

প্রদেশ বঙ্গদেশ ব্যতীত "দেশ" বলে আখ্যায়িত হয়নি।

তারপরে আমাদের স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ ভারতের মতই আর একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ ও জাতি। অন্যান্য স্বাধীন দেশের মত আমাদের স্বাধীনতা। সার্বভৌমত্ব। বাংলা ভাষা জাতীয় পতাকা জাতিসংঘের (UNO) মঞ্জুরি লাভ করল। তখন পশ্চিম বঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয়ে বসবাসরত সকল বাংলা ভাষা-ভাষীদের যাদের বৃটিশ আমলেও বাঙ্গালি জাতির অঙ্গ বলে মনে করা হতো, তাদের অবাঙ্গালীদের সেবাদাসরূপে ভারতে ফেলে রেখে আমাদের স্বাধীন বাঙ্গালীজাতির অঙ্গহানি করা কোনক্রমে বিধেয় নয়। এই বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের উপরেই (১৯০৫–১৯১১) সন পর্য্যন্ত সংগ্রাম করে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়েছিল, বাঙ্গালীজাতীর পুনঃসংযোগ হয়ে এক জাতিতে পরিণত হয়েছিল। মাত্র ৩৬ বৎসর পরে আবার কি হলো সেই হিন্দুরাই স্বভোটে বঙ্গদেশ ভঙ্গ করে ভারতীয় সাম্প্রদায়িক কংগ্রেসের চাপে উস্কানিতে ভারতে অন্তর্ভূক্ত হলো। বাঙ্গালী জাতিকে এই বহুধা বিভক্ত রাখা আর সম্ভব হবে না।

উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম যদি এক হয়ে এক রাষ্ট্র হতে পারে, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি যদি প্রায় অর্ধ শতাব্দী পৃথক থেকেও এক জার্মান রাষ্ট্র হতে পারে, তবে আমরা বাঙ্গালীরা কেন স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের পতাকাতলে একত্র হতে পারব না? আমরাও নিশ্চয় পারব। আমার আকুল আহবান, আসুন সকল বাংলা ভাষা-ভাষী ভারতীয় বাঙ্গালীরা আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে যোগ দিয়ে এক শক্তিশালী মহা বাংলাদেশ গঠন করুন। যেভাবে ১৯১১ সনে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়েছিল, সেভাবেই আমরা সকলে মিলে ১৯৪৭ সনের অবৈধ বঙ্গভঙ্গ আবার রদ করব। আশা করি সকল বাংলা ভাষা-ভাষীরা ভারতের যত দূরেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকুক না কেন আমার এই আকুল আহবান– মহা বাংলাদেশ গড়ার ডাক তাদের কর্ণকুহরে পৌছবেই। এবং সকল বাঙ্গালীরা মিলে বাংলাদেশের স্বাধীন পতাকাতলে এক মহা বাংলাদেশ গড়বেই।

আমাদের দেশে সন্ত্রাস দুই প্রকার– সরকার যেমন সামরিক বাহিনী দ্বারা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেন। দেশের ভিতর ও বাইরের শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে, তদ্রূপ আমাদের দেশের কয়েকটি বড় বড় রাজনৈতিক দল তাদের নিজেদের ক্ষমতার গদিতে নিয়ে সেখানে কায়েম রাখার জন্য সম্ভাব্য বিরোধী রাজনৈতিক দলকে প্রতিহত করার জন্য বেসামরিক বাহিনী গঠন করে। তাদের সমকালীন অন্যান্য রাজনৈতিক দল থেকে শক্তিশালী করে গোপনে অস্ত্রপাতি রাখার জন্য বিপুল অংকের টাকা পয়সা ব্যয় করছে বলেও শোনা যায়।

সেনানিবাসের মত একস্থানে বিপুল সংখ্যক জন শক্তি পাওয়ার জন্য তারা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে নিজেদের কর্মক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেয়। এছাড়াও কলকারখানায় শ্রমিকদের মধ্যে ঐভাবে শক্তিধর শ্রমিকপার্টি গঠন করে, উদ্দেশ্য একই। এই উভয় দলই নিজেদের স্বার্থের খাতিরে বা উপরোক্ত রাজনৈতিক দলের উচ্চমহলের ইঙ্গিতে শিক্ষাঙ্গনে ও মিল কারখানায় ভাংচুর হরতাল এমনকি মারধর করে, সহকর্মী ও সহপাটিদের নিহত ও আহত করে। সরকারি ও বেসরকারি সম্পদের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। এই সম্প্রদায় হল রাজনৈতিক সন্ত্রাসী দল।

দ্বিতীয় সন্ত্রাসী দল হল শহরে-বন্দরে, গ্রাম-গঞ্জে, হাটে-বাজারে, সাধারণ মানুষ থেকে নিজেদের স্বার্থে ডাকাতি, খুন খারাবি ও জোর করে চাঁদা আদায় করে, এই দল এখন দেশময় ভরে গেছে। প্রত্যেকটি থানাতে পুলিশ ও আনসারের নিকট যেসব অস্ত্র আছে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী ও ক্ষমতাবান অস্ত্র থানা এলাকার সন্ত্রাসীদের হাতে আছে। কাজেই পুলিশ নিরূপায় হয়ে কোন রকমে চাকুরি করে যাচ্ছে। এমনকি দরকার বোধে সন্ত্রাসীদের সাথে হাত মিলিয়েও নিজেদের চাকুরি রক্ষা করছে বলে শোনা যায়। তাদের সাথে রাজনৈতিকদলের কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। এইটি হল স্বাধীন সন্ত্রাসী দল।

সকল রাজনৈতিক দল প্রকৃতই যদি সন্ত্রাস দমন করতে চায় তবে সকলে একত্রে সন্ত্রাস দমনে প্রতিজ্ঞা নিয়ে কাজ করলে অতিসত্বর শিক্ষাঙ্গনে ও মিল কারখানায় সন্ত্রাস বন্ধ করতে পারে। যদি তারা না করেন তা'হলে আমার মতে সরকার আইন পাশ করে ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের মত নির্দলীয় ছাত্র, শিক্ষক নিয়ে ক্যাম্পাস পুলিশ সৃষ্টি করা উচিত। এই ক্যাম্পাস পুলিশ বাহিনী নিজেদের শিক্ষকদের অধীনে যে কোন সন্ত্রাসীকে আটক, বিচার ও সাজা দেয়ার ক্ষমতা থাকবে। এই অবৈতনিক ক্যাম্পাস পুলিশ বাহিনীর যে সব ছাত্র থাকবে তাদের উৎসাহ দেয়ার জন্য পরীক্ষার সময় কিছু মার্ক গ্রেস দিতে হবে। চাকুরির সময়ও তাদের অগ্রাধিকার বা কিছু সুযোগ বাড়তি থাকা দরকার বলে আমি মনে করি।

অনুরূপভাবে কলকারখানায়ও অবৈতনিক শ্রমিক পুলিশ বাহিনী থাকবে। তারাও তাদের কর্মকর্তার অধীনে উপরোক্ত ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবেন। সন্ত্রাস যখন একটি নতুন মারাত্মক ব্যাধি এর নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল করার জন্যও নতুন প্রতিরোধক এর ব্যবস্থা করতে হবে। দেশ আজ সন্ত্রাসীদের হাতে সম্পূর্ণ জিম্মি, অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা গ্রামে-গঞ্জে হাটে-বাজারে লুটপাট করে। অস্ত্রবিহীন শান্তিপ্রিয় নাগরিক তাদের ধন সম্পদ লুটপাট, নারী-নির্যাতন এমনকি নর হত্যা

রোধের কোন সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে পারছে না। এই অবস্থায় আমার মনে হয় পাকিস্তানের উপজাতীয় এলাকার মত সরকার প্রত্যেক নাগরিককে তাদের নিজ নিজ সাধ্যমত তাদের নিজ খরচে এক বা একাধিক অস্ত্র রাখার অনুমতি দেয়া উচিত। অবশ্য এই অস্ত্রগুলি নিজ নিজ থানায় রেজিষ্টার করে রাখতে হবে। এতে বেআইনি অস্ত্রধারীরাও তাদের অস্ত্র থানায় রেজিষ্টারি করাবে। এতে অভাবনীয় সুফল পাওয়া যাবে। প্রথম হল প্রত্যেকের আছে অস্ত্র কাছে বলে উপরোক্ত উপজাতীয়দের মত বাংলাদেশেও কোন সন্ত্রাসবাদী দল নিজের জানের ভয়ে অন্য কোন নাগরিকের বাড়ী বা লোকালয়ে হাট-বাজারে আক্রমণ করতে সাহস পাবে না।

দ্বিতীয়ত ঃ দেশের গোপন অস্ত্র আর গোপন থাকবে না, সবই সরকারের রেজিষ্টারভুক্ত হবে।

তৃতীয়তঃ দেশরক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের নিয়মিত সামরিক বাহিনীর শক্তি বহুগুণ বর্ধিত হবে। বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রাম এক একটি দুর্ভেদ্য দূর্গে পরিণত হবে। দেশের সকল নাগরিক এককেজন শক্তিশালী মুক্তিযোদ্ধায় পরিণত হবে। এর চেয়ে বেশী বিস্তারিত এখানে বলা বিধেয় মনে করছি না।

আজ প্রায় মাসাধিক কাল হলো C M H (Combined military Hospital)-এর সুদক্ষ চক্ষু চিকিৎসক বৈদেশিক আধুনিক চক্ষু চিকিৎসায় শিক্ষা প্রাপ্ত লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন-এর চিকিৎসাধীন আছি। তিনি আমার বাম চোখে মাইক্রো সার্জারী করে অত্যাধুনিক লেন্স বসিয়েছেন। আরও দুই এক মাস তাঁর চিকিৎসাধীন থাকতে হবে। কারণ, আমার বাম চোখটি আল্লাহর রহমতে দ্রুত উন্নতির দিকে যাচ্ছে, পরে তিনি একইভাবে আমার ডান চোখটি অপারেশন করবেন। ডাক্তার সাহেবের অতি যত্ন সহকারে আমার অপারেশন ও চিকিৎসা করার জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আমি তাঁর দীর্ঘজীবন, সুস্বাস্থ্য ও চাকুরিতে দ্রুত উন্নতি কামনা করছি।

উপরোক্ত কারণে আমি আমার এই বইয়ের কেনো প্রুফ কপি নিজ চোখে দেখে সংশোধন করতে পারিনি। এই বিষয়ে আমাকে যারা বিশেষ সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে আমার প্রিয়তমা স্ত্রী– নূরজাহান সাংসারিক শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাকে কখনো কখনো সাহায্য করেছেন। আমার মেঝো পুত্র মোহাম্মদ নেছার উদ্দীন এই বইয়ের প্রায় সবগুলি ছবি অতি যত্নে এই বইয়ে ছাপানোর জন্য দীর্ঘদিন রক্ষা করে আসছিল এবং আমাকে এই ছবি ছাপাবার জন্য বর্তমানে তার অবস্থানস্থল নিউজিল্যাণ্ডের অকল্যাণ্ড শহর থেকে টেলিফোন যোগে তাগাদা

দিচ্ছিল। আমার শ্যালিকা বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীত গায়িকা মালেকা আজিম ও তার স্বামী হায়দার আলী খান, আমার বড় ভায়েরা মরহুম ছফিউল্লাহ সাহেবের একমাত্র পুত্র কুতুবউদ্দীন মাহমুদ, আমার বইয়ের প্রকাশক আমার কনিষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদমঈনউদ্দিন-এর, কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। এই বইয়ের অনুলেখক সৈয়দ আবদুস শহীদ ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সহৃদয় পাঠক উক্ত বইয়ের কোন ভুলত্রুটি লক্ষ্য করলে আমাকে লিখে জানালে বাধিত হব এবং ভবিষ্যতে সংশোধন করতে চেষ্টা করব।

মোহাম্মদ আফসার উদ্দীন
বাড়ী নং– ৫৩, সড়ক নং– ৩/এ, ধানমণ্ডি আ/এ, ঢাকা– ১২০৯, ফোন – ৫০৬৮৬৮
তারিখ – ১–১০–১৯৯৩ইং

প্রাচীন ভারতের কিছু কথা

অতি প্রাচীনকালে ভারত উপমহাদেশে যে জনগোষ্ঠী বাস করতো তাদের আজও আদিবাসী বা দ্রাবিড় জাতি বলে পরিচয় দেয়া হয়। তারা বিশেষ করে সিন্ধু নদ ও গঙ্গা নদের অববাহিকা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে থাকত। কারণ পানি মানুষের জীবন রক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। শহর, নগর, বন্দর বা যে কোন স্থানে বসতি স্থাপন করে বসবাস করা বা কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য পানি অপরিহার্য্য প্রয়োজন। তাই তারা ভারতের এই প্রখ্যাত নদ-নদী বহুল স্থানে বসবাস করতে শুরু করল। তাই বলে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে যে জনপদ ছিল না তা নয়। কিন্তু তুলনামূলক ভাবে খুব বিরল ছিল। বহু গোত্র, বহু জাতি ও উপজাতিতে তারা বিভক্ত ছিল। সে সুযোগে আজ থেকে প্রায় ৩৫০০ বছর পূর্বে আর্য জাতিরা মধ্য এশিয়া হতে ভারত আগমন করে। তারা উত্তর পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। প্রথম দিকে সিন্ধু ও গঙ্গা বিধৌত অঞ্চল জয় করে অনার্যদের তাড়িয়ে দিয়ে বসতি স্থাপন করে এবং পরে আস্তে আস্তে বিশাল ভারত উপমহাদেশে বিস্তার লাভ করে।

কিন্তু সেই আর্যদের আমলেও দেখা গেছে যে ভারত বেশ কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিল–তারা কখনও পূর্ণ ভারতকে এক রাষ্ট্রের অধীন করতে পারেনি যদিও তারা ধর্মে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ছিল। সেই হিন্দুদের মধ্যেও বহু নরপতি স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করেছে। কাজেই তখন ভারতে বহু জাতির আবাস ছিল। আর্যরা নিজেরাই নিজেদেরকে আর্য জাতি বলত এবং ভারতের অবশিষ্ট লোককে যেমন দ্রাবিড়, সাওতাল প্রভৃতি আদিবাসীদের অনার্য বা অসভ্য বা হীন জাতি বলে ঘৃণা করত। আর্যরা নিজেদের মধ্যে বর্ণ বিভেদ সৃষ্টি করে কেহ ব্রাহ্মণ সবচেয়ে উচ্চ বংশ যারা শুধু পূজাপাবর্ণে পৌরহিত্য করবে। কেহ ক্ষত্রিয় যারা শুধু সরকার পরিচালনা ও যুদ্ধ বিগ্রহ করবে। কেহ বৈশ্য যারা শুধু ব্যবসা বাণিজ্য করবে এবং সরকার ও পূজাপাবর্ণের খরচ যোগাবে, কেহ শুদ্র যারা শুধু হাল চাষ ও উপরোক্ত শ্রেণীদের সেবা বা দাসত্ব করবে। এইভাবে এক জনগোষ্ঠী আর এক জনগোষ্ঠীর উপর আধিপত্য করবে, এক বর্ণের মানবগোষ্ঠীকে আর এক বর্ণের

মানবগোষ্ঠীর অধীনস্থ করার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করল। ধীরে ধীরে এই বর্ণ বৈষম্য এমন প্রবল আকার ধারণ করল যে এক হিন্দু ধর্মাবলম্বী হয়েও শুদ্র জাতি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মন্দিরে প্রবেশ করতে পারত না। যদিও মন্দির তৈরীর সময় এরাই শ্রম দিয়েছে এবং যে পথ দিয়ে ব্রাহ্মণ বা তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুরা যাতায়াত করতো তাদের ছায়া মাড়াবার ভয়ে সেই পথে শুদ্রদের যাতায়াত করা বা এক কূপের জল পান করাও নিষিদ্ধ ছিল। যদিও জনপদ ও পথগুলির মলমূত্র সাফ করা সহ অন্যান্য কাজ এদেরই করতে হতো। কিন্তু এদের বাস করতে হতো নগরের বাইরে নোংরা বস্তিতে।

পাঠকরা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন হাজার হাজার বছর পর আজও ভারতের কোন কোন অংশে এই প্রথা চালু আছে এবং নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা উপরোক্ত অপরাধ করলে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করে, তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে, তাদের ভগবানই এই ছোট বড় জাত সৃষ্টি করেছে। তাই হিন্দুদের মধ্যে এক জাতিত্ব বোধ হয়নি বা হতে দেওয়া হয়নি।

এই দূর্বিসহ পরিস্থিতিতে মহাসাধক মহাবীরের (আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৫৬৩ থেকে খৃঃ পূঃ ৪৮৩) নেতৃত্বে অহিংসা পরম ধর্ম, এই নীতিতে বিশ্বাসী জৈন ধর্ম নামে এক জনগোষ্ঠী হিন্দু ধর্ম থেকে আলাদা হয়ে যায়। আজও তারা ভারতের রাজস্থান প্রদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে বিরাজ করছে। যদিও তাদের হিন্দুরা বর্তমানে হিন্দু বলে সংখ্যা গণনা করছে।

এর পরে বর্ণ হিন্দুদের অত্যাচারে এক জনগোষ্ঠীর উপর আর এক জনগোষ্ঠীর নির্মম শাসন-শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে বুদ্ধদেব সবার প্রতি ভালবাসা, কারও প্রতি বিদ্বেষ নয়, এই আদর্শের প্রতি আস্থা রেখে ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম কায়েম করেন। ভারতের এক বিরাট জনগোষ্ঠী এই ধর্মে দীক্ষিত হয়।

এই ধর্মাবলম্বী অনেকেই ছিলেন ভারতের প্রাচীন আমলে সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যের অধিকারী। তার জন্যই তার সাম্রাজ্যের প্রতীক অশোক চক্র আজও ভারতের জাতীয় পতাকায় শোভা পায়, কিন্তু এহেন বড় সম্রাটের আমলেও ভারত উপমহাদেশে যেমন দাক্ষিণাত্য, উত্তর পূর্ব ভারত যথা আসাম, নাগাল্যাণ্ড, মনিপুর, এমনকি বাংলাদেশও তার রাজত্বের অন্তর্গত ছিল না। তাই সারা ভারতে তখনও এক জাতিত্ব কায়েম হয়নি। অশোকের পর গুপ্ত রাজাদের আমলে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মেরে কেটে ভারত থেকে প্রায় নিঃশেষ করে ফেলা হয়। আজ ভারত সীমার বাইরে শ্রীলংকা, বার্মা, ইন্দোচীন, জাপান, কোরিয়া, ভূটান ও আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে এরা সংখ্যাগরিষ্ঠভাবে বাস করছে।

মিথ্যা প্রচারে ভারতীয় আর্যরা পৃথিবীর গুরু। বর্ণ বৈষম্যবাদেও আর্যদের আর একটি বৈশিষ্ট ছিল তা হলো কাল্পনিক প্রচারে (প্রপাগান্ডা) পারদর্শিতা। যেমন খৃষ্টের জন্মের প্রায় ২০০০ বছর পূর্বে মহাভারত নামে সংস্কৃত ভাষায় মহামুনি ব্যস রচিত কল্পিত মহাকাব্যের রচনা। তার বহু পরে রামায়ণ নামে আর একটি কল্পিত মহাকাব্য রচিত হয়। অথচ কল্পিত রাম রাজাকে দিয়ে রামায়ণ লেখার পূর্বেই কল্পিত রাজা রাবণকে হত্যা করা হয়। এই কল্পিত লংকার রাজ্য রাবণকে রাক্ষস কূলের রাজা বলে অভিহিত করা হয়। আজ দু'হাজার বছরের উর্ধ্বে এই কল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য হিন্দু মুনী ঋষীরা এমন জোর প্রচার (প্রপাগান্ডা) চালাতে লাগলো যে, হিন্দু জনমনে রামকে সত্যই বিষ্ণুর অবতার ভগবান বলে প্রকৃতই স্থান দিয়েছে। আর শ্রীলংকাবাসীদের রাক্ষস জাতির উত্তরসূরী বলে মনে করে বসে আছে। আজকেও সাম্প্রদায়িক হিন্দু সম্প্রদায় ও সংগঠন যেমন হিন্দু মহাসভা, হিন্দু পরিষদ, ভারতীয় জনতা পার্টি এই অলীক কল্পনাকে বাস্তবায়নের জন্য প্রায় সকল বড় বড় হোটেল, রেস্তোরাঁ, বিমানবন্দর, হাট-বাজারে মহাভারত ও রামায়ণের অসত্য, অলীক কল্পনার দেবতা, রামের ভিডিও কেসেট ও ছায়াছবি দেখানো হচ্ছে। থিয়েটার মঞ্চেও অভিনয় করা হচ্ছে। সিনেমাতে দেখানো হচ্ছে। এগুলো বিশ্বাস না করে হিন্দুদের উপায়ই বা কি? তাদের তো কোন ঐশী কিতাব বা নীতি মালা নাই, যে রামের কোনদিন প্রকৃত পক্ষে জন্মই হয়নি, সেই কল্পনার রামকে মুসলিম নিধন যজ্ঞে ব্যবহার করার জন্য অযোধ্যায় ৪০০ বৎসরের পুরানো বাবরী মসজিদের স্থানে কল্পিত রাম জন্ম গ্রহণ করেছে বলে প্রচার করা হচ্ছে। এবং সে স্থানে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা করার অবিরত চেষ্টা করা হচ্ছে। শিক্ষিত হিন্দু পরিষদ, ভারতীয় জনতা পার্টি ও আরও কয়েকটি হিন্দু সাম্প্রদায়িক দল এলাহাবাদে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সেখানে রাম মন্দির নির্মাণ করবে বলে মসজিদ ভেঙ্গে সাফ করে, সেখানে রামের মূর্তি বসিয়েছে। যদিও বহু শিক্ষিত হিন্দু আর এইসব ধর্মীয় কল্পিত কাহিনীতে বিশ্বাস করেন না। ফলে অনেকে হিন্দু ধর্ম ছেড়ে একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম হয়ে গেছে। যেমন এককালের পূজারী ব্রাহ্মণ ঠাকুর, ভারতের একমাত্র সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ বিজেতা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামমোহন রায় ও আরও অনেকে। ভিত্তিহীন তথ্যের উপর নির্ভর করে অকারণে মসজিদের উপর মন্দির তৈরীর বিরুদ্ধে অবশ্য বহু হিন্দুও আজ সোচ্চার, দেখা যাক কি এর পরিণতি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জার্মান জেনারেল গোয়েবলসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় যে, মিথ্যাকে যদি সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করতে চাও তবে জোরে জোরে এবং বার বার বল তাহলে জনমনে মিথ্যা সত্য বলে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। গোয়েবলস নিজেও আর্য

বলে দাবী করেছিল। তাই আমার মনে হয় তিনি দু'হাজার বছর পূর্বের ভারতীয় আর্যদের মিথ্যা প্রপাগান্ডা ও তার ফল অনুধাবন করে তিনি তার প্রপাগান্ডা থিওরী উদ্ভাবন করেছিলেন। এ দেখে আমার মনে প্রতীয়মান হয় যে, মিথ্যা প্রচারে ভারতীয় উচ্চ শিক্ষিত বর্ণ হিন্দুরা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু বল্লে অতিরঞ্জিত বা অত্যুক্তি হবে না।

মুসলিম আমল

বর্ণবাদী হিন্দু রাজা বা শাসকদের অত্যাচারে হিন্দু প্রজাগণ এত অতিষ্ঠ ছিল যে, মুসলমান রাজা বাদশা বা শাসকদের ভারতে আগমণকে খোদা প্রদত্ত পরিত্রাণ বলে গ্রহণ করল। যদি স্থানীয় লোকেরা সদল বলে মুসলমান আগমন ও আক্রমণকে সমর্থন না করত তবে ১৭ জন অশ্বারোহী মুসলিম সৈন্য নিয়ে বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী কিছুতেই বাংলাদেশ জয় করতে পারতেন না। এটা একটি হিন্দু রাজত্বের রাজা প্রজার অনৈক্য ও অসম্পর্কের ঐতিহাসিক জাজ্বল্য প্রমাণ। যা বহু হিন্দু স্বাধীনচেতা, সত্যবাদী এদেশীয় ও ভারতীয় লেখক স্বীকার করেছেন।

কিছু কিছু সাম্প্রদায়িক হিন্দু ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবীরা বলে থাকেন যে, মুসলমানেরা তলোয়ারের জোরে ভারতে ইসলাম ধর্ম কায়েম করেছে। এই কথা সম্পূর্ন মিথ্যা। কারণ তাই যদি হতো তাহলে অযোধ্যার নবাব, লক্ষ্ণৌর নবাব, মহীশূরের হায়দর আলী, হায়দারাবাদের নিজাম, দিল্লীর মুঘল পাঠান বাদশা তাদের রাজধানী ও তার আশে পাশে তলোয়ারের জোরে সব মুসলমান করে ফেলতে পারতেন। কিন্তু দেখা যায় ঐ সব জায়গাতে হিন্দুরা খুবই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং মুসলিম রাজা বাদশা ও নবাবদের সাথে তাদের সম্পর্ক খুবই ভালো। তারা ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুসলিম আমলে বহু ওজির নাজির ও সৈন্যাদি হিন্দু ছিল, মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো রাজধানী থেকে বহু দূরে সুদূর বাংলাদেশে। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানে। এ অকাট্য দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ধর্মের ব্যাপারে মুসলমান রাজা বাদশারা পর ধর্মকে শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতার চোখে দেখতেন। তবে যদি তারা শক্তি প্রয়োগ করে থাকেন তা তারা করেছেন হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকল রাজা বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে। তাদের বাদশাহী রক্ষা করা ও প্রসার করার জন্য যেমন মুসলিম পাঠান বাদশাহ্‌রা লড়াই করেছেন মুঘল বাদ্‌শাহদের বিরুদ্ধে এদিকে হিন্দু রাজারাও যুদ্ধ করেছেন হিন্দু রাজাদের সঙ্গে যার যার রাজ্য রক্ষা ও প্রসারের জন্য।

আভ্যন্তরীণ ব্যাপার যাই হোক মুদ্দা কথা কোন মুসলিম রাজা বাদশা সারা

ভারতে অখণ্ড রাজত্ব করতে পারেনি। যদিও তারা প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছর ভারতে রাজত্ব করে গেছেন তবুও সারা ভারতবাসীকে একটা জাতিতে পরিণত করতে পারেনি। যেমন পারেনি কোন হিন্দু, বৌদ্ধ রাজারা। আর একটি বড় কথা যে, যদিও মুঘল পাঠান সুলতানী মুসলমানেরা আর্যদের মত ভারতে বহিরাগত কিন্তু মুসলমানরাও আর্যদের মতো যুদ্ধ করে ভারত জয় করেছে। শাসন করেছে এবং আর্যদের মতই এই ভারতকে নিজেদের বাসস্থান এবং স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছে। কাজেই মুসলমানরাও আর্যদের মতো ভারতবাসী। ভারতের দুঃখ-সুখের সম অংশীদার।

দীর্ঘ সাড়ে পাঁচশত বছর মোঘল পাঠান সুলতানরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে রাজত্ব ও শাসন করে গেছেন। মুসলিম সম্প্রদায় তখন রাজ-দরবার, কোর্ট, কাচারী, সামরিক বাহিনী ও সরকারী কাজে বেশীর ভাগ লোক নিয়োজিত। তারা মুসলিম রাজা বাদশাহ্‌দের তাবেদার রাষ্ট্র ও বড় বড় জমিদারী তালুকদারী অর্থাৎ শাসকের কাজ পরিচালনা করতেন। তাদের ব্যবসা বাণিজ্যে তেমন আগ্রহ দেখাবার প্রয়োজন হতো না। অথচ হিন্দু সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগ বিশেষ করে বর্ণবাদী উন্নত হিন্দুরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে টাকা পয়সা ও সোনাদানার মালিক হওয়াটাই বেশি পছন্দ করতেন। কিছু সংখ্যক সাহসী হিন্দু সামরিক বাহিনীতে উচ্চপদসহ বিভিন্ন সরকারী অফিস আদালতে মুসলমান শাসকদের অধীনে চাকুরী করতেন। কিন্তু বেশির ভাগ হিন্দু সম্প্রদায় ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়া আর কোন কাজে মনোনিবেশ করতেন না। নীচু শ্রেণীর হিন্দুরা বেশির ভাগ চাষবাস, শহর ও নগরের সাফ-সাফাইর কাজ করত। ইংল্যান্ড ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এমন সময় উন্নতমানের শিল্প বাণিজ্য সম্ভার ও যন্ত্রপাতি তৈরীর হিড়িক পড়ে গেল। তাই বৃটিশ, ফ্রান্স, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ বিভিন্ন জাতি তাদের উন্নতমানের শিল্প-বাণিজ্য-সম্ভার, সামরিক বাহিনীর ব্যবহৃত যুদ্ধে আধুনিক-যন্ত্রপাতির বাজার খুঁজে বের করার জন্য ভারত সহ পৃথিবীর নানা দেশে গমন করলেন। পশ্চিম বাংলার হুগ্‌লী জেলায় পন্ডিচেরীতে ফরাসী বাণিজ্য ঘাঁটি বসল। কলিকাতায় ইংরেজরা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ঘাঁটি করল। তখনকার দিনে বিদেশীরা নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্য দস্যু-তস্করদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের দেশ থেকে অনেক অস্ত্র আনতে ও সাথে রাখতে পারত।

পলাশীর যুদ্ধ ও বিশ্বাসঘাতকতা

তখন হিন্দু ব্যবসায়ীরা দেশীয় মাল বিক্রি ও বিদেশী পণ্য ক্রয় করে ব্যবসা

বাণিজ্যে ধনী হওয়ার সুযোগ সন্ধানে বিদেশী ইংরেজদের সাথে হাত মিলালো। এই ব্যবসায়ী সম্পর্ক পরে বন্ধুত্ব ও সখ্যতায় পরিণত হয়েছিল। তারা প্রথমে মোঘল বাদশাহদের কাছ থেকে ব্যবসায়ের অনুমতি গ্রহণ করলেন। এবং আস্তে আস্তে আরও সুবিধা আদায়ের জন্য স্থানীয় হিন্দু দালালদের পরামর্শে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আদায় করেও ক্ষান্ত হলো না। স্থানীয় হিন্দু ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে নবাব দরবারেও কুটবুদ্ধি চালিয়ে কিছু উজির নাজির ও সামরিক বাহিনীতে কিছু স্বার্থপর, ক্ষমতালোভী দালাল, বিশ্বাসঘাতক বন্ধু সৃষ্টি করলো। ঐ সব বিশ্বাসঘাতকরা ছিলেন যেমন সিরাজ উদ্দৌলার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ বিশ্ব কুখ্যাত বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর, ব্যবসায়ী জগৎশেঠ, নন্দকুমার , উমিচাঁদ প্রভৃতি। তাদের সহায়তায় বৃটিশ পলাশীর যুদ্ধে ১৭৫৭ সনে সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত করে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা দখল করলো। যদিও মীরমদন, মোহন লালের মত দেশ প্রেমিক অসীম সাহসী সেনাপতিরা স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। এদিকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান রবার্ট ক্লাইভ ও ওয়াটসন প্রমুখ কুটবুদ্ধি বলে কয়েকদিনের জন্য নবাব সিরাজদ্দৌলার স্থলে বিশ্ব কুখ্যাত বিশ্বাসঘাতক মীর জাফরকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব ঘোষণা করল। আবার কিছু দিন পরে মীর জাফরের জামাতা মীর কাশিমকে মীর জাফরের স্থানে নবাব বানানো হল।

এইভাবে কয়েকবার নাটকীয় রদবদলের ফলে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান রবার্ট ক্লাইভ, ওয়াটসন প্রভৃতি নিজেরাই বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার রাজদণ্ড হাতে নিল। কবির ভাষায় "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে— পোহালে শর্বরী।"

কলিকাতায় রাজধানী ঃ হিন্দুদের পোয়াবারো

ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী রাজদণ্ড হাতে নেবার পর মুর্শিদাবাদ থেকে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার রাজধানী কলিকাতা স্থানান্তরিত করল। এবং যথাশীঘ্র বাংলায় বৃটিশের প্রথম ও একমাত্র দূর্গ ফোর্ট উইলিয়ামকে শক্তিশালী এবং কলিকাতাকে পরিকল্পনানুযায়ী সমৃদ্ধশালী করতে চেষ্টা শুরু করল। তাদের চেষ্টায় সম্পূর্ণ সহযোগিতা করল বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার বর্ধিষ্ণু হিন্দু সম্প্রদায়। যদিও কিছু সংখ্যক দেশ প্রেমিক হিন্দু ইংরেজদের এদেশ শাসন-শোষণ মোটেই পছন্দ করতেন না। যেমন নাটোরের রাণী ভবানী প্রমুখ। মুসলমানের পরিবর্তে ইংরেজরা রাজত্ব পাকাপোক্ত করার জন্য হিন্দুদের পূর্ণ সাহায্য সহযোগিতা দিতে লাগল।

ফলে তারা দলে দলে কলিকাতায় এসে স্থায়ী বসতি স্থাপন করতে লাগল। এদিকে বিজিত মুসলমানরা হল ইংরেজদের পরম শত্রু। ইংরেজ ও হিন্দু সম্প্রদায় উভয়ে মিলে চালালো মুসলমানদের উপর অত্যাচারের ষ্টীম রোলার। আগেই বলেছি যে, বর্ধিষ্ণু মুসলিম সম্প্রদায় ছিল নবাব জমিদার তালুকদার ইত্যাদি ও বড় বড় সরকারী কর্মচারী। ইংরেজদের রাজত্ব শক্তিশালী করার জন্য তারা সকল মুসলমান জমিদারী তালুকদারী হিন্দুদের মধ্যে ভাগ করে দিল এবং সকল মুসলমান কর্মচারীদের বিদায় দিয়ে হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করা হল। এভাবে মুসলিম সম্প্রদায়কে অর্থহীন, সম্পদহীন, বেকার ও প্রতিপত্তিহীন জাতিতে পরিণত করা হল। শুধু তাই নয়, এতদিন অফিসের ভাষা এবং শিক্ষিত মহলের ভাষা ছিল ফারসী, ইংরেজদের হুকুমে অফিসের ভাষা হয়ে গেল ইংরেজী।

এই হুকুমের ফলে শিক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায় অশিক্ষিত বলে পরিগণিত হলো, অপরদিকে হিন্দুদের ইংরেজী শিখাবার জন্য ইংরেজ আমলের প্রথম কালের যার নাম ছিল ফোর্ট উইলিয়াম হিন্দু কলেজ। যেখানে শুধু হিন্দু ও খৃষ্টানদের ভর্তি হবারই অনুমতি ছিল। পরে ছাত্র সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে এই হিন্দু কলেজ বর্তমানে প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত করা হলো। এইভাবে হিন্দুদের শিক্ষিত করে যেখানে যেখানে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে অনুগত ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুদের নিয়ে গিয়ে ইংরেজরা উপযুক্ত সরকারী ও বেসরকারী পদে নিয়োগ করলো। বাঙালী হিন্দুরা ইংরেজী ও সাইন্স ও টেকনোলজীতে অগ্রগামী হলেও অবাঙ্গালীরাই আজ ভারতে সকল বিষয় অফিস আদালতে ও শিল্প বাণিজ্যে সবার চেয়ে এগিয়ে আছে। দুঃখ হলেও সত্য গোপন করে লাভ কি?

পাঁচশালা, দশশালা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন করে বাংলাদেশের প্রায় সকল জমিদারীর মালিক হিন্দুদের করে দিলেন। মুসলিম আমলে জমিদার তালুকদাররা উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ নিত, কিন্তু জমির মালিক ছিল উপায়হীন। তার পরে ব্যবসা বাণিজ্যে, দেশীয় কিংবা বৈদেশিক হোক, তাও সকল ইংরেজ ও স্থানীয় হিন্দুর হাতে কুক্ষিগত হলো। ১৮৬৯ সালের ২১শে জানুয়ারী বেঙ্গল সোস্যাল সাইন্স এসোসিয়েশনের অধিবেশনে রেভারেন্ড জেলং তৎকালীন বাঙ্গালী মুসলমানের সামাজিক, আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করে বললেন, 'জীর্ণ প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ শোচনীয় সামাজিক দূরবস্থার দিকে চেয়ে দেখলে বুঝা যায় এ দেশের মুসলমানরা নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। এক সময় যারা বড় একটা রাজ্য শাসন করেছেন আজ তাদের বংশধররা কায়-ক্লেশে জীবন যাপন করছেন। বাংলাদেশের কোন গভর্ণমেন্ট অফিসে উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্মচারী

বিশেষ দেখা যায় না। কিন্তু মুসলমান দপ্তরী আর পিয়নে সব অফিস ভরে গেছে।' প্রথম থেকে প্রায় শত বছরের ইংরেজ রাজত্বে হিন্দু সম্প্রদায়ের সক্রিয় সহযোগিতায় মুসলমানদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার এই হলো পরিণতি।

তদানীন্তন হিন্দু সম্প্রদায়ের উগ্রদালালী মাত্র দু' একটি হিন্দুদের লেখা বই হতে পাঠকের অবগতির জন্য লিপিবদ্ধ করা হলো।

১৮৫৭ সালের ২০শে জুন তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় সে যুগের প্রখ্যাত কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন 'কয়েক দল অধার্মিক, অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ ও হিতাহিত বিবেচনাহীন, এতদুদ্দেশ্যে সেনা অধার্মিকতা প্রচার সূচক রাজবিদ্রোহী হওয়াতে রাজবাসী শান্ত সভার অধন শোধন প্রজা মাত্রই দিবারাত্রি জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করছেন। এই দণ্ডেই হিন্দুস্থানের পূর্ববৎ শান্তি স্থাপিত হোক, হে বিস্মর, তুমি সহৃদয় বিস্মহর। সকল উপদ্রব নিবারন কর, যাহারা গোপনে গোপনে অথবা প্রকাশ্য রূপে এই বিষম ও অনিষ্টকর ঘটনার ঘটক হয়ে উল্লিখিত জ্ঞানান্ধ সেনাগণকে কুপারমর্শ প্রদান করছে ও করছেন উহাদিগকে দন্ডদান কর। তারা অবিলম্বেই আপনাদের অপরাধের ফল ভোগ করুক।" এই হইল ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে কবি ঈশ্বর চন্দ্রের মন্তব্য। তখন ঘরে ঘরে পূজামণ্ডপে হিন্দুরা এইভাবে ইংরেজের জয় কামনা করেছিল। সে কালে হিন্দু বুদ্ধিজীবী মহলের মন মানসিকতার প্রতিধ্বনি করে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় আরো লেখেন "এই রাজ্যই (ইংরেজ রাজত্ব) তো রাম রাজ্যের ন্যায় সুখের রাজত্ব হয়েছে। আমরা যথার্থ রূপ স্বাধীনতা সহযোগে পদ, বিদ্যা এবং ধর্ম কর্মাদি সকল প্রকার সাংসারিক সুখে সুখী হয়েছি।

কোন বিষয় ক্লেশের লেশ মাত্র জানতে পারি না। জননীর নিকট পুত্রেরা লালিত পালিত হয়ে যে রূপ উৎসাহ ও সাহসে অভিপ্রায় ব্যক্ত করে অন্তঃকরণে কৃতার্থ বোধ করেন আমরাও অবিকল সেইরূপ পৃথিবেশ্বরী, ইংলেণ্ডেশ্বরী জননীর নিকট পুত্রের ন্যায় প্রতিপালিত হয়ে সর্ব মতে চরিতার্থ হয়েছি।" ইংলণ্ডের রাণীকে স্মরণ করে কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত এই কথা লিখে সে কালের হিন্দুগণ মনের কথা প্রকাশ করেছেন।

পণ্ডিত গৌরীর ভট্টাচার্য সম্পাদিত ও কলিকাতা থেকে প্রকাশিত "সংবাদ ভাস্কর" পত্রিকায় ২০শে জনু ১৮৫৭-এ যা লিখেছেন তা আরও লজ্জাকর। তিনি লিখেছেন, হে পাঠক সকল উর্ধ্ববাহু হয়ে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে জয়ধ্বনি করতে করতে নৃত্য কর। আমাদিগের (ইংরেজের) প্রধান সেনাপতি মহাশয় সশস্ত্র হয়ে দিল্লী প্রদেশে প্রবেশ করেছে, সৈন্যদের মোর্চা (সিপাহী বিদ্রোহীদের) ছিন্ন

ভিন্ন করে দিয়েছে। তারা বাইরে যুদ্ধে এসেছিল। আমাদের তোপ মুখে অসংখ্য লোক নিহত হয়েছে। রাজ সৈন্যরা (ইংরেজ সৈন্যরা) ন্যূনাধিক ৪০টি তোপ ও অস্ত্রাদি নিয়েছেন এবং হত্যাবশিষ্ট পাপিষ্টরা দুর্গে প্রবিষ্ট হয়ে কবাট বন্ধ করেছে। "আমাদের সৈন্যরা দিল্লী প্রাচীরে উঠে নৃত্য করছে।" বৃটিশের মত একটি বিদেশী শক্তির পক্ষে এর চেয়ে বড় ধরনের দালালী আর কি হতে পারে? আজ কালকার ভাষায় এই দালালদের আর কি নামে আখ্যায়িত করা যায় তা পাঠক মনের বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া হল।

পলাশী যুদ্ধের জয়ের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে বিশ্বাসঘাতক মীর জাফরের ও বৃটিশ দালালদের সমভিব্যহারে রাজধানী মুর্শিদাবাদে গমন করে দালালদের সহায়তায় রবার্ট ক্লাইভ যে সব স্বাধীনতা প্রিয়লোক নবাব সিরাজদ্দৌলার পক্ষে যুদ্ধ করেছিল তাদের খুঁজে খুঁজে এক গণহত্যা ও লুট-পাটের অনুষ্ঠান করে। এ কালে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নবাব সিরাজদ্দৌলার মৃত দেহকে হাতির পায়ে বেঁধে রবার্ট ক্লাইভ ও মীর জাফর মুর্শিদাবাদ শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। ভয় ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার করে। জনগণ এতে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। রবার্ট ক্লাইভ তার ডায়েরীতে লিখে গেছে যে ঐ সময় মুর্শিদাবাদে সমাগত জনগণ যদি একটি করে ঢিলও ইংরেজ সৈন্যদের উপর নিক্ষেপ করত তবে তাদের কারও বাঁচার উপায় ছিল না। কিন্তু কেউই তা করেনি, আমার মনে হয় জনগণের নীরব দর্শকের ভূমিকা পালনের কারণ, যারা স্বদেশ প্রেমিক সিরাজের পক্ষ অবলম্বন করেছিল তাদের দেশীয় দালালের সহায়তায় খুঁজে খুঁজে বের করে হত্যা করা হয়েছিল। লুট-পাট করে তাদের সর্বশান্ত করা হয়েছিল। স্বদেশ প্রেমিক নবাবের লোক কিছু বেঁচে থাকলেও প্রাণ ভয়ে তারা মুর্শিদাবাদ ছেড়ে যে যেখানে পেরেছে,- চলে গেছে। শুধু মীর জাফর ও দালালগণ, তাদের ভক্ত, অনুরক্তদের ভয় ভীতি প্রদর্শন করে কিছু জনগণকে সিরাজের মৃত দেহ দেখানোর জন্য জমা করেছিল। তাই তাদের কোন প্রতিবাদ করার সাহস ও মনোবৃত্তি ছিল না। তাছাড়া সেকালে সাধারণ প্রজাগণকে রাজা বাদশা বা তাদের নবাবের কি হলো তা জানার প্রয়োজন তাদের ছিল না, কারণ রাজা প্রজায় সম্পর্ক ছিল শুধু কর ও শুল্ক আদান প্রদান করা। প্রজার সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের আর কোন কারণ ছিল না।

পরম পরিতাপের বিষয় পলাশীর যুদ্ধে কোন দুই রাজার দুই সামরিক বাহিনী জড়িত ছিল না। সামান্য একটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া নামক মুষ্টিমেয় ইংরেজদের প্রাইভেট কোম্পানীর সাথে বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব সিরাজদ্দৌলার সাথে তারই দেশে

যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক গোষ্ঠী নবাবকে এই যুদ্ধে হারাল। অতি নিষ্ঠুরের মত হত্যা করল। এবং ভারত উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনের গোড়া পত্তন করল। ইংরেজদের কূটবুদ্ধি ও মিথ্যা ওয়াদা সেই আমলে সিরাজদ্দৌলার উজির নাজির ও সেনাপতিদের আর কিছু ব্যবসায়ীর বিশ্বাসঘাতকতার নামে মাত্র পলাশীতে যুদ্ধের প্রহসন করে ইংরেজরা বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার রাজদণ্ড হাতে নিল।

এই প্রহসন বাংলার মাটি মুর্শিদাবাদে সংগঠিত হয়ে ছিল বটে, কিন্তু এটাকে কিছুতেই বাঙ্গালীর বিশ্বাসঘাতকতা বলা যায় না। কারণ নবাব সিরাজদ্দৌলা, বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর ও ঘষেটি বেগম প্রভৃতি স্থানীয় ব্যক্তিগণ কেহই প্রকৃত বাঙ্গালী ছিল না। এই বিধায়ও ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতা বাঙ্গালীর মাথায় চাপিয়ে দেয়া একটি মহা অন্যায়, যাহা প্রকৃতই মিথ্যা, সেই অপবাদ বাঙ্গালীরা মাথায় নিয়ে চলবে কেন?

মুর্শিদাবাদে কিছু দিন নাটকীয়ভাবে নবাব পরিবর্তনের পর রবার্ট ক্লাইভ বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার রাজধানী কলিকাতায় স্থানান্তরিত করে।

স্বদেশ প্রেমিক রাজ কর্মচারী ও সৈন্য সামন্তদের মুর্শিদাবাদে ফেলে রেখে এসে শুধু বৃটিশ ভক্ত দালাল ও বিশ্বাস ঘাতকদের নিয়ে কলকাতা নগরীকে নতুন রাজধানী ঘোষণা করা হলো।

প্রথমে পরিকল্পনানুযায়ী ফোর্ট উইলিয়ামকে আরো শক্তিশালী করা এবং কলিকাতা নগরীকে রাজধানীর উপযুক্ত করে গড়ে তোলার প্রয়াস নিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বড় সাহেবদের উচ্ছিষ্ট লাভের আশায় ইংরেজদের পদলেহনের সুবিধার জন্য হুড়হুড় করে বর্ণ হিন্দুরা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দালালেরা কলিকাতায় বাসস্থান গড়তে শুরু করল। এই নূতন শহর নূতন রাজধানী কলিকাতায় বসে নির্ভেজাল বর্ণ হিন্দু দালালরা ও বিশ্বাসঘাতকরা পরিকল্পিত উপায়ে বিজিত মুসলমান জাতিকে কি করে চিরতরে পরাভূত ও পরাজিত, পদানত করে রাখা যায় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে লাগল। এইভাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসা বাণিজ্য ও তাদের শাসনদণ্ড সংহত করতে লাগল।

ঢাকায় ইংরেজদের হত্যাকাণ্ড

আমাদের চোখের সামনে ঢাকার উদাহরণ দিলে তা কিছুটা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। মুর্শিদাবাদে রাজধানী হওয়ার আগেও ঢাকা-মোঘল আমলের রাজধানী ছিল। লালবাগ দূর্গে শাসনকর্তার অফিস বসত। দূর্গের ভগ্নাবশেষ, মসজিদ, কবরস্থান

আজও তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। লালবাগের উত্তরে হাতিশালা, দূর্গ ছিল। আরবী ও ফারসীতে যথাক্রমে কিলখানা ও পিলখানা বলা হতো। যেটা বি. ডি. আর ক্যান্টনমেন্ট নামে আজও পরিচিত। এর অনতিদূরে উত্তর পার্শ্বে আমীর উমরাদের ও সিপাহীদের ঈদের নামাজের জন্য ছিলো ঈদগাহ্—যা বর্তমান সময়ে ধানমন্ডি ঈদগাহ্ নামে বহুল পরিচিত। মোঘল আমলের কিছু কিছু দেয়াল ও শিলালিপি এই ঈদগাহে এখনও পরিদৃষ্ট যা মোঘল আমলের সাক্ষ্য দেয়। এখানে প্রায় ২০/২৫ হাজার লোকের একত্রে নামাজের জায়গা আছে। তার উত্তরে লালমাটিয়াতে মোঘল আমলের বিবির মসজিদ ও অজু গোসলের জন্য বিরাট দীঘি অবস্থিত। এই মসজিদটি এখনও বেশ চালু আছে। এখনও এখানে প্রচুর লোকের এক সাথে নামাজ পড়ার জায়গা আছে। তার কিছুটা উত্তরে একেবারে বুড়িগঙ্গার পাড়ে সাত গম্বুজ মসজিদ তাওে মোঘল আমলের— সেখানেও বিরাট মসজিদ ও ঈদগাহ্, এই সম্পূর্ণ এলাকা (যার পূর্ব নাম ছিল ইস্‌লামাবাদ) মোঘল আমলের রাজধানী ও ক্যান্টনমেন্ট ছিল।

তাহলে দেখা যায় কি বিপুল সংখ্যক মুসলমান তখন ঢাকায় ছিল। তা না হলে এতগুলি বিরাট মসজিদ ও ঈদগাহ্ নির্মাণের প্রশ্নই আসত না। ইংরেজ ও তার দালালরা নিশ্চয় এদের পর্যায়ক্রমে হত্যা করে নিশ্চিহ্ন করেছে।

পিলখানা ক্যান্টনমেন্ট হতে হাতীদের গোসলের জন্য বড় রাস্তা ধরে বুড়িগঙ্গা নদীতে নিয়ে যাওয়া হতো। হাতীদের গোসল করানোর জন্য পীলখানা থেকে বের করে বর্তমান এলিফ্যান্ট রোড (হাতী সড়ক) দিয়ে পূর্বদিকে মগবাজারে নিয়ে গাছগাছালী আহার করানো হতো। সে জন্য রাস্তার নাম আজও ইংরেজীতে এলিফ্যান্ট রোড যার অর্থ হাতী সড়ক রাখা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো এই যে, বিরাট ক্যান্টনমেন্ট এরিয়া তাতে সেই মোঘল আমলের জনগোষ্ঠীর বংশধরদের পুরানো শহর ছাড়া কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না কেন? কারণ সেই আমলের সকল মুসলমানদের ইংরেজ ও তাদের দালালরা শত্রু মনে করত। এজন্য তাদের পাইকারীভাবে হত্যা করা হয়েছে। তার সাক্ষী পুরাতন ভিক্টোরিয়া পার্ক। বর্তমান বাহাদুর শাহ্ পার্ক। যেখানে হাজার হাজার মানুষকে বিনা বিচারে বৃটিশরা ফাঁসি দিয়েছে। যা-ও বা কিছু লোক বেঁচে ছিল তা-ও প্রাণ ভয়ে শহর ছেড়ে কোথাও পালিয়ে গেছে। এখন যে সব লোক আমরা লালবাগ থেকে পিলখানা ধানমন্ডি রায়ের বাজার জাফরাবাদ লালমাটিয়া ও মোহাম্মদপুরে দেখতে পাই তারা প্রায় সবাই বহিরাগত, নবাগত বাসিন্দা। কেহই সে আমলের পুরানো বাসিন্দাদের উত্তরসূরী নয়। এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও তাদের দালালদের সহায়তায় যে ধ্বংসলীলা সাধিত হয়েছে তা কত নির্মম ছিল।

মোঘল সাম্রাজ্য দখলের স্বপ্ন

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার রাজধানী কলিকাতাতে স্থানান্তরিত করার পর ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গকে সুদৃঢ় করতে লাগল বিলেত থেকে বহু আধুনিক অস্ত্র কামান বন্দুক এনে ফোর্ট উইলিয়ামে জমা করল। কোম্পানীর নামে আরও কিছু ইংরেজ ইংল্যান্ড থেকে আনয়ন করে দূর্গকে সামরিকভাবে শক্তিশালী করল। অপরদিকে ইংরেজ তোষণকারী, সাহায্যপ্রার্থী, খেতাবপ্রার্থী, অর্থ লোভী, ভারতীয় দালালদের কলিকাতাতে সুসংহত ও সংঘবদ্ধ করতে লাগল।

ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে তখন অনৈক্য ও শক্রতা বিরাজ করছিল। তদানীন্তন ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে দিল্লীর মোঘল সম্রাট সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যের অধিকারী কিন্তু ছিল অযোগ্য ও দূর্বল। আরাম প্রিয়তার জন্য আরও দূর্বল হয়ে পড়েছিল ওরা। এই সুযোগে কোন কোন প্রাদেশিক সুবেদাররা (গভর্ণর) দিল্লীতে রাজস্ব পাঠানো বন্ধ করে দিল। বন্ধ করে দিয়ে অঘোষিত স্বাধীনতা লাভ করল। কেহ বা রাজস্ব প্রদান খুবই কমিয়ে দিয়ে নাম মাত্র দিল্লীর আনুগত্য স্বীকার করে রইল। নানা কারণে সামরিক বাহিনীতে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে লাগলো। এই সুবর্ণ সুযোগ দেখে এবং অতি সহজেই বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার নওয়াবী হাত করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নেতৃত্বে খুবই উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হলো। তারা মোঘল সাম্রাজ্য অধিকার করার স্বপ্ন দেখতে লাগল।

সামরিক শক্তিতে নয়, যে কূটনীতি, ছলনা ও প্রবঞ্চনা করে ভারতীয়দের দিয়ে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়ে যে ভাবে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার রাজ্য নবাব সিরাজদ্দৌলার নিকট থেকে অধিকার করিয়েছে অনুরূপভাবে ভারতীয় দালাল দিয়ে মোঘল রাজধানী দিল্লী জয়ের পরিকল্পনা করল। পরিকল্পনার মূলনীতি হল একটি শক্তিশালী ভারতীয় দালালদের দ্বারা বিশ্বাসঘাতক দল সৃষ্টি করবে। কি করে ভারতীয় রাজন্যবর্গকে জমিদার মহাজনদের বিনাযুদ্ধে বশ করা যায়। তবে ফন্দী করবে। যদি বিনা যুদ্ধে ইংরেজ কোম্পানী আসে তবে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাহিনী যাতে স্থানীয় সাহায্য ও সমর্থন পায়, তার সকল ব্যবস্থা ভারতীয় দালালরা করে দিবে। অথবা ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিবে। এবং ইংরেজ কোম্পানী তাদের অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে অতি অল্প সংখ্যক ইংরেজ সৈন্য ক্ষয় করে যাতে যুদ্ধে জিতে যায়, তার ব্যবস্থা করবে। তাছাড়া বিবদমান রাজন্য ও জমিদার বর্গের মধ্যে একপক্ষ অবলম্বন করে অন্য পক্ষকে দমন করার সঙ্গে সঙ্গে বিজেতা পক্ষকে করদ রাজ্য ও মিত্র পক্ষ হিসেবে

বশে এনে ভবিষ্যতের যুদ্ধে তাদের সৈন্য সামন্ত ধনবল ও জনবল দিয়ে সাহায্য করার ব্যবস্থা করবে। এই নীতি নির্ধারণ করে মোঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লীকে টার্গেট করে গোয়েন্দাদের একটি জাল সৃষ্টি করে চর্তুদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল।

দিল্লী বিজয়

সময় সুযোগ মতো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাহিনী স্থানীয় মিত্র বাহিনী সমভিব্যহারে দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হলো। তাদের দালালরা কূটবুদ্ধির দরুণ পথিমধ্যে তেমন কোন বাধার সৃষ্টি হলো না। প্রবঞ্চনা, ছলনা, কূটবুদ্ধির সাহায্যে সহজেই অগ্রসর হতে লাগল। স্বদেশ প্রেমিক স্থানীয় সামরিক বাহিনী ও মুসলিম জনগণকে গণহত্যা লুণ্ঠন করে অযোধ্যার নবাব ও তার পরিবার পরিজনকে অযোধ্যা থেকে বহু দূরে কলিকাতার মাটিয়া বুরুজে এনে নির্বাসন দেয়া হল। এইভাবে ধীরে ধীরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী (১৮৫৭) খৃঃ মোঘল রাজধানী দিল্লী জয় করে আমীর ওমরাহ্ ও সামরিক বাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়ে দিল্লীর শেষ পরাজিত সম্রাট বাহাদুর শাহ্‌কে অল্প কিছু পরিবার পরিজনসহ সুদূর বার্মার রাজধানী রেঙ্গুনে নির্বাসিত করে। রেঙ্গুনের উপকণ্ঠে আজও মোঘল বাদশাহ্ বাহাদুরশাহ-এর কবর পর্যটকের দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছে।

নিজেদের মধ্যে অনৈক্য ও সামরিক দুর্বলতার কারণে দুঃখের বিষয় বেশির ভাগ ভারতীয় রাজন্যবর্গ বিনা যুদ্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বশ্যতা স্বীকার করে করদ মিত্র রাজ্যের নতজানু হয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গোলামী করল। আর গুটি কয়েক রাজন্যবর্গ যারা বশ্যতা স্বীকার করলো না, তাদের সাথে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্য ও ভারতীয় মিত্র শক্তির সাথে যুদ্ধ করে বশ্যতা স্বীকার করানো গেল। অতীব দুঃখ ও লজ্জার কথা ভারত উপমহাদেশ জয় করল বিদেশী কোন রাজা বা রাজন্যবর্গ বা দুর্দ্ধর্ষ সামরিক বাহিনী নয়, ক্ষুদ্র একটি ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া নামক প্রাইভেট কোম্পানী। এই লজ্জা রাখার স্থান কোথায়?

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারত শাসন গ্রহণ

যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারত উপমহাদেশে সবচেয়ে বড় মোঘল সাম্রাজ্য জয় করল তখন বৃটিশ সরকারের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হলো। এত বড়

উপনিবেশের শাসন বৃটিশ সরকার একটি ক্ষুদ্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে রেখে দেয়া সমীচিন মনে করল না, তাই মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনামলে (১৮৫৮ ইং) ভারতের শাসন বৃটিশ সরকার নিজ হাতে গ্রহণ করলেন। তখন থেকে ভারত বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটি উপনিবেশ হিসেবে শাসিত হতে লাগল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময় রবার্ট ক্লাইভ এত বড় বৃটিশ ভারতীয় উপনিবেশের সৃষ্টিকর্তা হয়েও তার লুট-পাট অজস্র সম্পদ আত্মসাৎ করা, অমানুষিক গণহত্যা বিলেত সরকারের দৃষ্টি এড়ালো না। এবং সে কারণে রবার্ট ক্লাইভ বিলেতে ফেরার পর তার বিচার শুরু হয়। বিচারে তার নিশ্চিত সাজা হবে ভেবে এবং রবার্ট ক্লাইভের দুষ্কৃতি খবরের কাগজের মাধ্যমে প্রচার হওয়াতে রবার্ট ক্লাইভ বিচার শেষ হবার পূর্বেই অপমানের হাত থেকে বাঁচবার জন্য আত্মহত্যা করল। পরবর্তীতে লর্ড হেষ্টিংস-এরও লুট-পাট ও অবাধভাবে সম্পদ আহরণের জন্য ইংল্যাণ্ডে বিচার হয়েছিল। ভাগ্যের কি পরিহাস যেখানে আমাদের দেশের সর্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত শাসককে রবার্ট ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেষ্টিংসের তুলনায় অতি সামান্য উপঢৌকনে কেনাকাটা করা যায় সেখানে ভারত উপমহাদেশের মত একটি পৃথিবী বিখ্যাত উপনিবেশ উপঢৌকন দিয়েও রবার্ট ক্লাইভ ইংল্যাণ্ডের আইনের কঠোর হস্ত থেকে নিস্তার পেল না। লর্ড ওয়ারেন হেষ্টিংসের মত এত বড় উচ্চপদস্থ রাজকীয় কর্মচারী ইংল্যাণ্ডের আইনের শাসন থেকে অব্যাহতি পেল না। এই কারণে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রায় দুশো বছর শুধু ভারত কেন বার্মা, শ্রীলংকা, নেপাল, সিকিম, ভূটানের উপর রাজত্ব করে গেছেন। আর আমাদের বাংলাদেশে আইনের শাসন নেই বলে একাধারে দশ বছরও কোন দল আমাদের দেশ শাসন করতে পারল না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের জন্ম লগ্ন থেকে প্রায় ১০০ বছর বিজিত ভারতীয় মুসলমানরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজদের সাথে দলবদ্ধ ভাবে এমনকি একক ভাবেও সংগ্রাম করে নিঃস্ব হয়ে গেছে। আর এই এক শ বছর, অতীব দুঃখের সাথে বলতে হয়, আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায় ইংরেজের সহযোগিতা সাহায্য ও দালালী করে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে গেছেন। কত মুসলমান যে বৃটিশের বিরদ্ধে বিদ্রোহ করে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলেছেন। কেউ বা জায়গা জমি থেকে উৎখাত হয়েছে। কেউ বা নারী পুরুষ ন্রির্বিশেষে ইংরেজ ও তাদের দালালের হাতে পর্যুদস্ত ও নিহত হয়েছে। তার ইতিহাস আমাদের দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা পড়েছেন কিনা জানি না। না পড়ে থাকলে এখনও পড়ার সময় আছে।

দিল্লী সুসংহত করে সারা ভারত জয়ের পদক্ষেপ

অমানুষিক হত্যা লুণ্ঠন উৎখাত যত রকম জুলুম ও নির্যাতন করা সম্ভব তা করে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা যখন ইংরেজদের বশে আনা হল তখন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী পরিকল্পিত ভাবে তাদের টার্গেট মোঘল রাজধানী দিল্লী জয় করতে অগ্রসর হলো; তা আগেই বলেছি, বাহাদুর শাহ্‌কে বার্মাতে নির্বাসন করে সিপাহী বিদ্রোহ দমনের পর দিল্লীতে শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুসংহত করতে মনোযোগ দিল। আস্তে আস্তে ইংরেজরা পাঞ্জাব, উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ জয় করে অপর দিকে রাজপুতনা, মধ্যভারত, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি সহ সারা ভারত উপমহাদেশে একক বৃটিশ শাসন আনয়ন করে। ইতিপূর্বে হিন্দু বৌদ্ধ বা মুসলমান আমলে যা সম্ভব হয়নি, বলে রাখা ভাল ইতিমধ্যে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ভারত উপমহাদেশের শাসন ক্ষমতা বৃটিশ সরকার নিজ হাতে গ্রহণ করে (১৮৫৮) ভারত উপমহাদেশ এই প্রথমবারের মত বৃটিশের একমাত্র শাসনের অধীনে আনয়ন করা হলো এবং এর পর ক্রমে ক্রমে পার্শ্ববর্তী রাজ্য নেপাল, ভুটান, সিকিম, বার্মা, শ্রীলংকা ও ভারত মহাসাগরের ছোট ছোট দ্বীপ দিল্লীর শাসনাধীনে আনীত হলো। বৃটিশের প্রাচ্য জয়ে ভারতের অবদান কম নয়। এই শক্তিশালী বিরাট উপমহাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে ভিত্তি করে শক্তিশালী সামরিকবাহিনী গঠন করে প্রাচ্যজয়ের সূচনা করে যেমন বার্মা, মালয়, সিঙ্গাপুর, হংকং, প্রশান্ত মহাসাগরের কিছু কিছু দ্বীপপুঞ্জ জয় করে। এই বিরাট জয়ের মূলেও ভারতীয় উপনিবেশ শক্তি ও সামর্থ্য জুগিয়েছে। দুঃখের বিষয় বৃটিশ জাতির জন্যও তাদের নেতৃত্বে শক্তিশালী ভারতীয় সামরিক বাহিনী বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রায় প্রত্যেকটি উপনিবেশ নিজেদের বাহু বলে জয় করে দিল অথচ ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী ও প্রতিহিংসা পরায়ণ নেতৃত্বের জন্য ভারত উপমহাদেশ ভারতবাসীদের দ্বারা অতীতে কখনও হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান যেই হোক না কেন? ভারতবাসীর জন্য একচ্ছত্র শাসন কায়েম করতে পারল না। এ দুঃখ ও লজ্জা হিমালয়ের মত উঁচু আর ভারত মহাসাগরের মত গভীর, বিদেশী ইংরেজ যা করতে পারল ভারতবাসীদের দ্বারা অতীতে তা সম্ভব হলো না ভবিষ্যতে হবে কি না গায়েবের মালিক আল্লাহ্ জানেন। ভারত উপনিবেশ থেকে মধ্য প্রাচ্যের দিকে নজর।

ভারতের পশ্চিম দিকে আরব সাগরের পশ্চিম পাড়ে এডেন, কাতার, কুয়েত, বাহ্‌রাইন নামক ছোট ছোট উপনিবেশ স্থাপন করে দিল্লী সরকার ও ভাইসরয়ের শাসনাধীনে আনা হলো। এই সকল আরব উপনিবেশে ও ভারত সীমান্তবর্তী নেপাল, ভুটান, মিকিম, বার্মা ও শ্রীলংকা শুধু ভারতের ভাইসরয়ের অধীনেই

গ্রন্থাগার
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
ঢাকা

আনা হল না সেখানে ভারতের মুদ্রাও চালু হল, এটা সম্পূর্ণ বৃটিশ জাতির কর্তৃত্ব বলে আমি মনে করি। যা ভারতীয় নেতৃত্বের কল্পনার বাহিরে ছিল।

এই বিশাল ভারতীয় ও প্রাচ্য দেশের উপনিবেশগুলি শাসন করার জন্য বাণিজ্য সম্ভার চলাচলের জন্য বৃটিশ ও ইউরোপিয়ান জাতিকে আফ্রিকা উপমহাদেশ ঘুরে বহু লম্বা জল পথে গমনাগমন করতে বহু সময় লাগত। এই বাণিজ্য পথ সংরক্ষণ করার জন্য বৃটিশ জাতিকে আফ্রিকা মহাদেশের কয়েকটি রাজ্য জয় করে উপনিবেশ স্থাপন করতে হয়েছিল। ভারত উপমহাদেশ ও পাশ্চাত্যদেশের বাণিজ্য পথকে ছোট করার জন্য সুয়েজ খাল খনন করা হল। এবং এই পথ সংরক্ষণ করার জন্য মিশর সহ অন্যান্য পার্শ্ববর্তী দেশে বৃটিশ প্রভাব প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন রাখার জন্য বৃটিশ জাতি ব্যবহার করল ভারত ও তার শক্তিশালী সামরিক বাহিনীকে।

ভারত মাতা বলে গান্ধী, নেহেরু, প্যাটেল প্রভৃতি কংগ্রেসী হিন্দুরা যতই স্লোগান দিক না কেন ভারতের স্বাধীনতার সময় তার উল্টো কাজ করে ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত এক ভারত উপমহাদেশকে নিজ হাতে দ্বিখণ্ডিত করে ভারতের বর্ণবাদী হিন্দুর নেতৃত্বে (ভারতীয় কংগ্রেস দল) দেখিয়ে দিল যে তাদের নিকট হিন্দু জাতীয়তাবাদ অখণ্ড ভারতের চেয়ে অনেক বড়।

তারা ভারতকে প্রথমে দ্বিখণ্ডিত (পণ্ডিত নেহেরু যখন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট) পরে পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করে (ইন্দিরা গান্ধী যখন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট) ভারত উপমহাদেশকে তৃখণ্ডিত করা হলো, ভারত উপমহাদেশ আরও কত খণ্ড হয় তা ভবিষ্যৎই বলতে পারে।

বৃটিশ মার খেল আফগানিস্তানে। বৃটিশের এই অগ্রযাত্রায় বাধা পড়ল যখন তারা আফগানিস্তান জয়ের জন্য জালালাবাদ আক্রমণ করল। স্বাধীনতা ও ধর্ম রক্ষার্থে পাঠানরা যে কত দুর্ধর্ষ হতে পারে বৃটিশরা তা কল্পনাও করতে পারেনি। অস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও ভারতীয় সামরিক বাহিনীর শক্তির উপর ভরসা করে ইংরেজ আফগানিস্তান আক্রমণ করে রাজধানী কাবুল অভিমুখে ভারতের সীমান্ত থেকে মাত্র কয়েক মাইল অভ্যন্তরে জালালাবাদ শহর পর্যন্ত পৌছে। আল্লাহর উপর ভরসাকারী লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সঃ) যাদের অন্তরে ধ্বনিত সেই গরীব মুসলমান আফগানরা যা কিছু সামান্য অস্ত্রপাতি তুলে নিতে পেরেছে তা নিয়েই বিরাট বৃটিশ সামরিক বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাদের অস্ত্রপাতি ও রসদ ছিনিয়ে নিয়ে তাদেরই অস্ত্র দ্বারা এমন মার দিল যে বৃটিশ সামরিক বাহিনী চিরদিনের জন্য আফগানিস্তান থেকে ফিরে আসে ও ভারতের

অভ্যন্তরে প্রত্যাগমন করে রক্ষা পায়।

ইংরেজ জাতির মনে রাখা উচিৎ ছিল যে, আফগানিস্তানের বাদশা সুলতান মাহমুদ এই বিশাল ভারত ভূমি ১৭ বার আক্রমণ করেছে। এবং সোমনাথ মন্দিরে লুক্কায়িত বহু ধনরত্ন নিয়ে নিজ দেশে চলে গিয়েছে। আফগান পাঠানরা ভারতে বহু দিন রাজত্ব করেছে, তারা স্বাধীনতা প্রিয় বীর সাহসী শাসক জাতি। তাদের পরাজিত ও পরাভূত রাখা কোন জাতির পক্ষে এত সহজ নয়।

ইংরেজ রাজত্ব উৎখাত করতে প্রথমে মুসলমানদের যুদ্ধ জেহাদ

১৭৫৭ সনে পলাশীর যুদ্ধ বা ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভ থেকে শতাধিক বৎসর পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য যে যুদ্ধ বিগ্রহ সংগঠিত হয় এবং যারা এই স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছে তারা প্রায় সকলেই ছিলেন মুসলমান। ঐ সময়ের মধ্যে যদি কোন হিন্দু শিখ ইত্যাদি যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে থাকেন সংখ্যায় তারা ছিলেন খুব কম। ওয়াহাবী আন্দোলন, ফকির আন্দোলন, বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানরা এক সাগর রক্ত দিয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা ইংরেজের হাত থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য যখন হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায় তাদের স্বার্থোদ্ধারের জন্য বৃটিশ রাজত্ব ভারতে সুদৃঢ় ভাবে কায়েমের জন্য পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন, তখন মুসলমানরা সমষ্টিগত ভাবে আন্দোলন, যুদ্ধ বা জেহাদ করা ঠাণ্ডা মেজাজে একক ও ব্যক্তিগত সাহস দেখিয়ে ইংরেজদের হত্যা করেছে। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ১৮৭১ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে সুদূর আন্দামান দ্বীপে যেখানে ভারতীয় যাবজ্জীবন সাজা প্রাপ্তরা দ্বীপান্তরে (কালা পানি) নির্বাসিত হত। সেখানে পরিদর্শণরত ভারতীয় গভর্নর জেনারেল লর্ড মেউকে যখন আর কোন অস্ত্র পায়নি তখন রান্না ঘরের ছুরি দিয়ে আক্রমণ করে হত্যা করল। সাজা প্রাপ্ত মুসলমান আসামী হল শের আলী এবং ১৮৭১ সনের ২০শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জাষ্টিস নর্মানকে যে হত্যা করল সেও একজন মুসলমান, নাম আব্দুল্লাহ। বলাবাহুল্য দু'জনেরই ফাঁসি হয়, কিন্তু তারা এ জন্যই কেউই দুঃখিত হয়নি। তখনকার দিনে প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায় তাদের স্বার্থ উদ্ধারে বৃটিশ সহযোগিতায় ব্যস্ত। এর পূর্বে কোন হিন্দু নামধারী ভারতবাসী কোন ইংরেজকে হত্যা করেছেন বলে রেকর্ড পত্রে পাওয়া যায় নাই। এইভাবে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ বা জেহাদ করতে করতে এতদিনের শাসকের জাত

মুসলমান, মান, সম্ভ্রম, ধন, সম্পদ সব হারিয়ে ফেলেছে। এবং শেষ পর্যন্ত নিঃস্ব কৃষক, কুলি, অফিসার, চাপরাসি, ট্রলীওয়ালা, দারোয়ান, পিয়ন প্রভৃতিতে পর্যবসিত হয়। আর ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়কে সক্রিয় সহযোগিতার ফলে মুসলমানের চোখের সামনে এককালে তাদেরই হিন্দু প্রজাপুঞ্জ, আমলা কর্মচারীর উত্তরসুরীরা হয়ে গেল ইংরেজদের পরই এদেশের দ্বিতীয় শাসক শ্রেণী। জমিদার, মহাজন, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুরা হয়ে গেলো সর্বস্থানে, সকল স্তরের রাজ-কর্মচারী।

মুসলমানদের নতুন চিন্তাধারা

এই পারিপার্শিক অবস্থা দেখে মুসলমান গণ্যমান্য ব্যক্তিরা যাঁরা ঐ কালে বেঁচেছিলেন তারা চিন্তা করতে লাগলেন যে, মুসলমানদের এখন ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে আর কোথাও বিদ্রোহ ও সংগ্রাম করে লাভ হবে না এবং ইংরেজদের সাথে সহযোগিতা করে প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের মত সুশিক্ষিত, সম্মানিত ও সমৃদ্ধিশালী হওয়া উচিৎ। এই নব্য চিন্তাধারার অগ্রদূত ছিলেন বাংলাদেশের নবাব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী, দিল্লীর স্যার সৈয়দ আহমেদ ও আরো অনেকে। তারা চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন কিভাবে মুসলমানদের ভাগ্যের উন্নতি করা যায়। এতে তারা কিছু কিছু কামিয়াবও হয়েছেন।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম (১৮৮৫)

অপর দিকে হিন্দু সম্প্রদায়কে আরও সুসংহত ও সুসংগঠিত করে ইংরেজ সরকারকে সংঘবদ্ধ সহযোগিতা দেয়ার জন্য ১৮৮৫ খৃঃ অবসরপ্রাপ্ত মিঃ এ, হিউম নামক একজন ইংরেজ আই. সি. এস এর উদ্যোগে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়।

সরকারী রেকর্ড পত্রে পাওয়া যায় যে, তৎকালীন ইংরেজ ভাইসরয় লর্ড ডাকরিন এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠা কল্পে সর্বত্র সমর্থন দান করেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যখন ভারতের মুখপাত্র সেজে ইংরেজ শাসনের সমর্থন দিবে তখন ইংরেজ ভাইসরয় ও লর্ড ডাকরিনের কংগ্রেসের সংগঠন প্রচার ও প্রসারে সর্বস্তরে সমর্থন দান খুবই স্বাভাবিক। তারপর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের

জন্মদাতা মিঃ হিউম প্রায় ২৭ বৎসর যাবৎ একাধারে কংগ্রেসের সম্পাদক (সেক্রেটারী) ছিলেন। মিঃ হিউম ছাড়াও কংগ্রেসের কার্য্যনির্বাহী কমিটিতে আরও একজন রাজপুরুষের নাম পাওয়া যায়। তাই দেখা যায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয় ইংরেজ সূতিকাগারে। কংগ্রেসের জন্ম লগ্ন থেকে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিলো ইংরেজ সরকারের ভারত শাসনের পূর্ণ সহযোগিতা করা ও সেই সুবাদে ভারতে হিন্দু স্বার্থবর্ধিত ও সংরক্ষিত করা। উল্লেখ্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তার জন্ম লগ্ন থেকেই ইংরেজ শাসকদের সমর্থন দিয়ে প্রচুর হিন্দু স্বার্থ ও সুযোগ ভারত সরকারের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছিলেন।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জন্ম (১৯০৬ সন)

এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় মুসলিম নেতারাও ভাবল যে, মুসলমানরা যদি জাতিগতভাবে একটি সংগঠন তৈরী করে প্রতিবেশী হিন্দুদের মত ইংরেজ শাসনকে সমর্থন ও সহযোগিতা দেয় তা হলে মুসলমানরা হয়ত ইংরেজদের রোষানল হতে অব্যাহতি পাবে এবং ইংরেজদের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারলে সংখ্যানুপাতে ভারতীয় সকল সুযোগ সুবিধার সক্রিয় অংশীদার হতে পারবে।

এই উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে ১৯০৬ খৃঃ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জন্ম হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বুকে সর্বভারতীয় মুসলিম প্রতিনিধিদের দ্বারা ভারতীয় কংগ্রেসের মত ইংরেজ রাজপুরুষদের দ্বারা ইংরেজ শাসন ও শোষণ পাকা পোক্ত করার জন্য নয়, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে এই যে বিরাট পার্থক্য তা এই জামানার অনেকেই জানে না। কারণ ইংরেজ আমলে বই পুস্তক ও সংবাদ পত্র ও সংবাদ সংস্থাগুলি (নিউজ মিডিয়া) প্রায় সবগুলির মালিকই ছিল হয় ইংরেজ নয় হিন্দু। যারা সত্য কথা চেপে রেখে তাদের মতলবের কথা জনগণকে পড়তে জানতে দিত। আগেই বলেছি যে মিথ্যা প্রপাগান্ডায় বর্ণহিন্দুরা সকলের ওস্তাদ ও গুরু।

ইংরেজদের সাথে হিন্দুদের মনোমালিন্য শুরু

বিগত শতাধিক বছর বৃটিশ আমলে ইংরেজ সরকারের সহযোগিতায় প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায় আধুনিক বিলেতের লন্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি

থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করে ভারতীয় প্রশাসনে ইংরেজদের পরেই শীর্ষস্থান দখল করে বসেছে। ভারতের প্রায় সকল জমিদারী, মহাজনী, ব্যবসা-বাণিজ্য হিন্দু সম্প্রদায় দখল করে আছে। ভারত বর্ষের শাসন ক্ষমতা দখল করা ছাড়া বাকী সকল প্রশাসনিক অর্থোপার্জনের কর্মক্ষেত্র ও সামাজিক প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব হিন্দু সম্প্রদায়ের দখলেই ছিলো। এখন হিন্দুরা পরিষ্কার দেখতে পেল যে, ইংরেজদের তাড়াতে না পারলে গোটা ভারতবর্ষের শাসন দন্ড তাদের হাতে আসবে না। ঐশ্বর্য লাভ ও ধনরত্ন উপার্জনের সকল ক্ষেত্র তাদের করায়ত্ব হবে না গ্রাম থেকে রাজধানী পর্যন্ত সকল পর্যায়ে যেমন ইউনিয়ন পরিষদ, (কাউন্সিল) জিলা পরিষদ, (কাউন্সিল) পৌরসভা, আইন আদালত, প্রাদেশিক আইন সভা এবং মায় ভারতীয় পার্লামেন্ট প্রভৃতি সম্পূর্ণ তাদের একচ্ছত্র দখলে থাকবে। এই প্রয়াসে তারা ১১৮ বছর ভারতে ইংরেজ সরকারের সার্বিক সহযোগিতা করার পরে আস্তে আস্তে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রথমে সাহিত্য ও নাটকের মাধ্যমে ও পরে দেশীয় ভাষায় খবরের কাগজের মাধ্যমে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে শুরু করলো।

এই অবস্থা দেখে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের সম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণের পর ১৮৭৬ সনে ভারত সরকার নাটক নিয়ন্ত্রণ আইন, ভার্নকুলার নিয়ন্ত্রণ আইন ও অস্ত্র আইন পাশ করায়।

হিন্দুদের সাথে ইংরেজদের প্রথম মনোমালিন্য শুরু হল। এই মনোমালিন্য ক্রমান্বয়ে ভারতীয় জনসমাজে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের আকারে বাড়তে শুরু করল। এদেশে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী এলেন। অক্টাভিয়ান হিউম নামে একজন ইংরেজ আই. সি. এস দ্বারা ১৮৮৫ খৃঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন। যার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় জনগোষ্ঠীকে এই রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে একত্রিত করে বৃটিশের সমর্থক ও দালাল করে তাদের (বৃটিশের) অনুগত রাখা। এই ইংরেজ মিঃ হিউম ১৮৮৫ সন থেকে ১৯১২ সন পর্যন্ত দীর্ঘ ২৭ বছর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি আরও ৫ জন ইংরেজ (অবসর প্রাপ্ত) রাজকর্মচারীকে কংগ্রেস পার্টিতে যুক্ত করলেন।

ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি

এরা হলেন মিঃ জর্জ হউল, এলাহাবাদ ১৮৮৮, স্যার ডাব্লিউ ওয়েডার বার্ন, বম্বে ১৮৮৯, মিঃ এ. ওয়েন, মাদ্রাজ ১৮৯৪, মিঃ আর. টি. সিয়ানী, কলিকাতা

১৮৯৬, স্যার হেনরী কটন, বম্বে ১৯০৪। স্যার ডাব্লিউ ওয়েডার বার্ন (২য় বার) এলাহাবাদ ১৯১০, আর ১৮৮৫ সনে কংগ্রেসের জন্মলগ্ন থেকে মিঃ হিউম লাগাতার ১৯১২ সন পর্যন্ত মোট ২৭ বৎসর সেক্রেটারীতো ছিলেনই। এতগুলি ইংরেজ প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী কংগ্রেসের ৫০০ আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন কি ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করে আনয়নের জন্য না ইংরেজ রাজত্বের স্থায়িত্ব দীর্ঘায়িত করার জন্য?

হিন্দু জাতীয়তাবাদ আন্দোলন ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড

এখন থেকে এই সুযোগে হিন্দুরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের নামে হিন্দু জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি ত্বরান্বিত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা নিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে হিন্দুদের ছোট ছোট গোপন বিপ্লবী দল সৃষ্টি করার উদ্যোগও নিলেন। গোপন বিপ্লবীদের মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পাদস্পর্শ করে শপথ নিতে হত। (যা কোন মুসলমান করতে পারে না।)

তারা দলের কর্মকান্ডের গোপনীয়তা রক্ষা করবে এবং ভারত থেকে ইংরেজ শাসন বিলুপ্তির জন্য প্রয়োজন হলে ইংরেজ মেরে নিজেদের প্রাণ বলি দেবে ফাঁসি কাষ্ঠে।

এই পদ্ধতিতে গোড়াতেই মুসলমানদের সন্ত্রাসী আন্দোলন থেকে বাদ রাখার জন্য ব্যবস্থা করা হলো। এই সন্ত্রাসী দল ইংরেজ শাসনের শেষ পর্বে কিছু কিছু সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। যেমন চট্টগ্রামে পুলিশ অস্ত্রাগার লুন্ঠন, মীরাট ষড়যন্ত্র এবং কিছু ইংরেজের সন্ত্রাসী আক্রমণ করে ফাঁসির মঞ্চেও ঝুলেছিল যেমন ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, জগৎ সিংহ প্রমুখ। এবং আরও কয়েকজন।

আমাদের নব্য তথাকথিত বুদ্ধিজীবী শুধু ভারতে বৃটিশ শাসনের শেষ দিকের এই ইতিহাসটুকু বলতে চান যে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য শুধু হিন্দুরাই রক্ত দিয়েছে। মুসলমানরাও যে প্রথম দিকে একশ সোয়া'শ বছর ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এক সাগর রক্ত দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে, ধনজন সহায় সম্পদ সম্পূর্ণ উজাড় করে দিয়ে নিঃস্ব হয়েছে— সেই অগণিত মুসলমানের প্রাণদানের কথা বা ইতিহাস তারা পড়েননি বা পড়ার সুযোগ পাননি। তাই তাদের চোখে শুধু ইদানীং কালের হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মদানের কথাই ভেসে উঠে। সুখের বিষয় এ দেশে ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে কিছু কিছু হিন্দু ও মুসলমান ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক যারা সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির উর্ধ্বে উঠে সত্য

ইতিহাস লিখতে শুরু করেছেন। তারা আমাদের শ্রদ্ধা ও অভিনন্দনের পাত্র।

মুসলমানদের কংগ্রেস ত্যাগ

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫) যেহেতু সবচেয়ে পুরানো রাজনৈতিক দল এবং মুসলমানদের নিখিল ভারত মুসলীম লীগ (১৯০৬) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে প্রথমদিকে স্বাধীনতাকামী প্রায় সকল মুসলমানই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। যেমন আলী ভ্রাতৃদ্বয়, মাওলানা মোঃ আলী, মাওলানা শওকত আলী, বদরুদ্দীন তায়েবজী, ডঃ আনসারী, কায়েদে আজম মোঃ আলী জিন্নাহ এবং আরও অনেকে। তারপর ঐ সব মুসলমানগণ যখন দেখলেন যে ভারতীয় কংগ্রেস শুধু হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে, ইংরেজ শাসন বদলের পূর্ণ চেষ্টা করছে না তখন তারা অনেকে কংগ্রেসের সদস্য পদ থাকা সত্বেও নিখিল ভারত মুসলীম লীগের মাধ্যমে মুসলিম স্বার্থোদ্ধারের জন্য যা ভারতীয় কংগ্রেস বরাবরই উপেক্ষা করে আসছেন, তার জন্য সচেষ্ট হলেন। কংগ্রেস যে তখন পর্যন্ত স্বাধীনতা চায়নি তার বহু প্রমাণ ১৯২৮ সনে যখন মাওলানা হসরত মোহানী কংগ্রেস কাউন্সিল মিটিং যে প্রথমবারের মত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব আনয়ন করেন বহু কংগ্রেস সদস্য যেমন সুভাষ চন্দ্র বোস ও আরও অনেকে তা সমর্থন করেন। কিন্তু বৃটিশ রাজশক্তি এবং ভারতীয় বৃটিশ শাসন কর্তাগণ কংগ্রেসের উপর চটে যাবার ভয়ে গান্ধীজী ও তার সমর্থক দল এই পূর্ণ স্বরাজের কট্টর বিরোধিতা করার ফলে কংগ্রেসের প্রথম স্বাধীনতার প্রস্তাব বানচাল হয়ে যায়। পাঠক বর্গ বিবেচনা করুন, আধুনিক ভাষায় এই কর্মকান্ডের জন্য গান্ধীজী ও তার সমর্থকদের ইংরেজ সরকারের দালাল বললে কি অত্যুক্তি হবে?

কংগ্রেসের এই সব মনোবৃত্তি দেখে অনেক মুসলমান কংগ্রেস ছেড়ে মুসলীম লীগে যোগদান করেন এবং মুসলিম লীগের মাধ্যমে বৃটিশ সরকার থেকে মুসলমানের ন্যায্য অধিকার আদায়ের চেষ্টা করতে লাগলেন। আবার কোন কোন সদস্য যারা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন এবং যথাক্রমে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের হিন্দু মুসলমান উভয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে ভারতের হিন্দু মুসলমানের মহামিলনের পথ সুগম করার চেষ্টা করেন, যেমন কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ও শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক। এককালে কংগ্রেস নেতারা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মিলনের পথ সৃষ্টির জন্য কায়েদে আযম মোঃ আলী জিন্নাহ্‌কে "এম্বাসেডার অব

হিন্দু মুসলীম ইউনিটি” বলা হতো, কিন্তু সে উভয় নেতা যখন দেখলেন যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যা আগেই বলেছি যে তারা স্বাধীনতার নামে তাদের সকল ক্রিয়াকাণ্ডে শুধু হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন তখন তারা কংগ্রেস থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে আসেন। মুষ্টিমেয় মুসলমান ছাড়া যেমন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এহেন বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও একনিষ্ঠ কংগ্রেসভক্ত মুসলমানকে হিন্দুরা সভাপতি করল, এমনকি ভারতে শিক্ষামন্ত্রীও বানাল। কিন্তু কংগ্রেসী হিন্দু মনের গভীরে হিন্দু জাতীয়তাবাদ লুকিয়ে থাকাতে মাওলানা আবুল কালাম আজাদের মত জ্ঞানী ধীর স্থির নেতাকে তারা কংগ্রেসী সরকারের অর্থাৎ পণ্ডিত নেহেরু সরকারের ডেপুটি লীডারও বানায়নি। এমনকি কেবিনেট মিশন প্লান মেনে নিয়ে ভারত অখণ্ড রাখার জন্য মাওলানার উপদেশ নেহেরু প্যাটেন গং হিন্দু গ্রহণ না করে ভারতকে দ্বি-খণ্ডিত করে পাকিস্তান প্রস্তাবই যার বিরুদ্ধে কংগ্রেস আজীবন বিরোধিতা করেছে হঠাৎ করে তারা সেই প্রস্তাবই মেনে নিল।

মুসলীম লীগ বা জিন্নাহ্ নয় কংগ্রেস এবং নেহেরুরাই ভারত বিভাগের জন্য দায়ী।

মাওলানা তার লেখা বই ইন্ডিয়া উইন্‌স ফ্রিডম-এর ১৪৭ পৃষ্টায় লিখেছেন ঃ

"In fairness I have to want that on this point (Cabinet mission plan) Mr. Jinnah was on the whole right. both Justice of expediency demanded that the plan (of cabinet mission) unequivocally." এর অর্থ হলো, "সঠিক মূল্যায়নে আমাকে এটা স্বীকার করতেই হবে যে ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে মিঃ জিন্নাহ্ ছিলেন সর্বতোভাবে সঠিক–ন্যায় এবং উভয়ের দাবী ছিল যে, কংগ্রেসের অকুণ্ঠ চিত্তে এই পরিকল্পনা (ক্যাবিনেট মিশন) মেনে নেয়া উচিৎ ছিল।"

ভারতের স্বায়ত্বশাসনের পথে পা

১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী বিদ্রোহের পরিণাম দেখে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে ভারতীয় প্রজারা যাতে আস্তে আস্তে সরকারী চাকুরীতে স্থান পায়, স্বায়ত্বশাসন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা লাভ ও বিশেষ কারণে অস্ত্র রাখার অধিকার পায় তা এবং বিচার ব্যবস্থার দাবী কিছু কিছু মেনে নিলেন। এই উদ্দেশ্যে

১৮৮০ খৃঃ থেকে ১৮৮৩ খৃঃ ভারতে প্রথম হাইকোর্ট এবং সম্পূর্ণ মনোনীত সদস্য সমন্বিত ব্যবস্থাপক সভা (লেজিসলেটিভ কাউন্সিল) প্রবর্তিত হয়।

১৮৯২ খৃঃ লর্ড ক্রসের (কাউন্সিল রিফর্ম) আইন গৃহীত হয় এতে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ও অন্যান্য নির্বাচক মন্ডলীকে ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচনের অধিকার দেয়া হল। কিন্তু ঐ নির্বাচিত সদস্য থেকেই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য কে কে হবেন তা বাছাইয়ের অধিকার সরকারের হাতে রইলো। কাজেই ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের মনোনীত সদস্য ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে। ইতিমধ্যে মহামান্য আগা খাঁনের নেতৃত্বে মুসলিম প্রতিনিধি মণ্ডলী ভারতীয় মুসলিম লীগ অধঃপতিত ও সর্বশান্ত মুসলিমদের দাবী দাওয়া ইংরেজ ভারত সরকারের নিকট পেশ করতে লাগলেন। ইংরেজ সরকার যখন নিশ্চিত বুঝতে পারলেন যে, সাম্প্রদায়িকতাবাদী সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের দ্বারা যুক্ত নির্বাচনে কিছুতেই সংখ্যালঘিষ্ঠ ভারতীয় মুসলিমগণ তাদের ন্যায্য দাবী দাওয়া আদায় করতে পারবে না তখন ভারত সরকার ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের নতুন শাসন সংস্কারের মাধ্যমে সর্বপ্রথম সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচনের সূত্রপাত করেন। দেড়শ বছর ইংরেজ সরকার ভারতীয় হিন্দুদের সার্বিক উন্নতি করার চেষ্টা করেছেন এবং প্রতিবেশী মুসলমান সাম্প্রদায়কে উভয়ে মিলে নির্যাতন ও নিস্পেষণ করে যথা সম্ভব নীচে আরও নীচ ফেলতে চেষ্টা করেছেন। তাই বোধহয় ইংরেজ শাসকের প্রায় ১৫০ বছর পরে নির্যাতিত ও নিস্পেষিত মুসলমানের জন্য কিছুটা অনুশোচনার বশে ও কিছুটা ন্যায়ের শাসনের ইচ্ছার উদ্রেক হওয়াতে এই প্রথম মুসলমান ও হিন্দুর জন্য আলাদা আলাদা ভোটের ব্যবস্থা করল। ১৯২০ খৃঃ এই আইনকে হিন্দুরা ভারতে প্রথম সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ রোপন বলে অভিহিত ও প্রভাবিত করতে লাগলো। কিন্তু হিন্দুরা কি ভেবে দেখেছিলো বা এখনও দেখে যে তাদের মনের মধ্যে বর্ণবাদিতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ রোপিত হয়েছিল কয়েক হাজার বছর পূর্বে হিন্দু শাসনামলে। যে কারণে ভারতের সংখ্যাগুরু তফসিলী সম্প্রদায় আজও সংখ্যা লঘিষ্ঠ বর্ণহিন্দুদের নিকট তাদের ন্যায্য অধিকার পাচ্ছে না। বলা বাহুল্য আজও অধিকারের দাবী করলে সাম্প্রদায়িক ও কট্টর বর্ণবাদীরা সংঘবদ্ধ ভাবে তফসিলীদের দাবী দাওয়া পূরণ তো দূরের কথা তাদের পুড়িয়ে মারে। অন্যান্য অত্যাচারের কথা না-ই বললাম। সংখ্যাগুরু তফসিলীদের ন্যায্যদাবী আদায়ের পরিবর্তে ভারতীয় মণ্ডল কমিশনের পরিকল্পনা কিছুটা বাস্তবায়নের জন্য শতকরা ৬০% এর পরিবর্তে মাত্র ২৮টি চাকুরী তাদের জন্য সংরক্ষিত করার দাবী উথাপন করে ভি. পি. সিংহ ভারতের প্রধানমন্ত্রীত্ব হারালেন। এবং তাকে নিশ্চিত গদীচ্যুত করার আন্দোলন তুঙ্গে নিয়ে যাওয়ার

লক্ষে ভারতীয় ইউনিভার্সিটির কয়েকজন ছাত্রছাত্রী নিজেদের গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহুতি দিয়ে ভি. পি. সিংহের এই মহান উদ্দেশ্য বানচাল করে দিল। সাম্প্রদায়িক ও বর্ণবাদীরা যে কতখানি কট্টর তা দৃশ্যত দেখা গেল তাদের এই আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে। এভাবে নিজেদের বলিদানের মধ্য দিয়ে তাদের সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করল। তাদেরকে বর্ণবাদী হিন্দুরা ছোট জাত বলে ঘৃণা করে। এই সাম্প্রদায়িক ও বর্ণবাদী বিষবৃক্ষ ইংরেজ শাসনের কয়েক হাজার বছর পূর্বেই ভারতীয় আর্যদের মনে রোপিত হয়। ফলে-ফুলে বর্ধিত হয়ে তা বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়েছে। এর শাখা প্রশাখা ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছেয়ে ফেলেছে। পৃথিবীর মধ্যে হিন্দুদের চেয়ে বেশী বর্ণবাদী ও সাম্প্রদায়িক কেউ আছে বলে মনে হয় না।

অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ বনাম রামমন্দির

হিন্দুদের এই বর্ণবাদী চরিত্রের একটি প্রমাণ এলাহাবাদ হাইকোর্টের আদেশ অমান্য করে সাম্প্রদায়িক ও বর্ণবাদী ভারতীয় জনতা পার্টি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, শিব সেনা ও আরো কয়েকটি হিন্দু রাজনৈতিক দল অযোধ্যা নগরে বার শ বছরের পুরানো বাবরী মসজিদের স্থলে জোর করে রামমন্দির প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছার মধ্যে পাওয়া যাবে। যেই রাম শুধু কল্পনার দেবতা, যার প্রকৃতই কোন দিন জন্ম হয়নি, কোথাও হয়নি, অযোধ্যাতে জন্ম গ্রহণ করার তো প্রশ্নই আসে না, এহেন অলীক রাম দেবতার নামে অযোধ্যা মসজিদের স্থলে এলাহাবাদ হাইকোর্টের হুকুম বরখেলাপ করে উচ্চশিক্ষিত বর্ণবাদী হিন্দুরা চেষ্টা করেছে মন্দির প্রতিষ্ঠিত করতে। আর তার সহায়তা করেছে উত্তর প্রদেশের নির্বাচিত হিন্দু সরকার। সময় সুযোগ দিচ্ছে ভারতের কংগ্রেস সরকার। এতে প্রমাণিত হল যে শুধু হিন্দু জনগণই নয় ভারতীয় শিক্ষিত নির্বাচিত প্রতিনিধিগণও কত সাম্প্রদায়িক ও বর্ণবাদী হতে পারে যদিও অল্প সংখ্যক হিন্দু নেতা মুসলমানের সাথে একত্র হয়ে এই অধর্মীয় কাজ বন্ধ করার জন্য ভারত সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। কারাবরণ করছে। কিন্তু তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ বলে সংখ্যা গুরু সরকার তাদের কথায় কোন আমল দিচ্ছে না। বা তাদেরকে কোন পরওয়া করছে না। উত্তর প্রদেশের সাম্প্রদায়িক হিন্দু সরকার এই যে রামমন্দির ওয়ালাদের প্রটেকশন বা নিরাপত্তা দিচ্ছে মসজিদের স্থলে বেআইনীভাবে রামমন্দির তৈরীর নিরাপত্তা ও সুযোগ দিচ্ছে দিল্লীর কেন্দ্রীয় হিন্দু সরকার উত্তর প্রদেশের

সরকারকে বরখাস্ত না করে কালহরণের নাটক করছে— উদ্দেশ্য দুটি, এক কালক্ষেপণের মাধ্যমে রামমন্দির প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ দেওয়া, দুই ধর্মপ্রাণ সংখ্যা লঘিষ্ট মুসলমান যদি ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ রক্ষা করতে আসে তবে তাদের হত্যা করে রাম মন্দিরের ভিত্তি মূলে নরমেধ যজ্ঞ করা। ভারতীয় রেডিও খবর মতে এ পর্যন্ত আট হাজার লোক এ উপলক্ষে প্রাণ দিয়েছে। প্রকৃত সংখ্যা হয়ত এর বহুগুণ বেশী। স্বাধীনতার যুগে সাম্প্রদায়িক বর্ণ হিন্দুদের বহু সহস্র দাঙ্গা ও অযোধ্যার রামমন্দির নিয়ে কি ভয়াবহ দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িকতা দেখেও বাংলাদেশের তথাকথিত মুসলিম বুদ্ধিজীবী (কুবুদ্ধিজীবী) এবং মুষ্টিমেয় সাম্প্রদায়িক হিন্দু বাংলাদেশে কল্পিত সাম্প্রদায়িকতার দুঃস্বপ্ন দেখছেন। তারা আজ চুপ কেন? এ ব্যাপারে না হয় দিল্লীর প্রভুদের পক্ষেই কিছু বলেন। নুন খেলে তো তার গুণ গাওয়া উচিত। আরও বলা যায় যে, ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের আমলের বঙ্গ ভাগ করে পূর্ব বঙ্গের রাজধানী ঢাকাতে নির্মাণ করে পশ্চিম বঙ্গের রাজধানী কলিকাতাই থেকে যায়। এইভাবে ১৯০৫ সন থেকে ১৯১১ সন পর্যন্ত দুই বঙ্গকে বৃটিশ আলাদাভাবে শাসন করে। তারপর বঙ্গ ভঙ্গ রদের জন্য সর্বভারতীয় হিন্দু আন্দোলনের মুখে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ১৯১১ সনে আবার দুই বঙ্গকে একত্র করে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত শাসন করেন। বৃটিশ যুক্ত বাংলাদেশের হিন্দু নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের আলাদা ভোট নিয়ে তাদের অভিমত ভাঙ্গতে পারলেন। যে যুক্ত বাংলার সকল হিন্দুরা মুসলমান থেকে পৃথক হয়ে পশ্চিম বাংলা নিয়ে ভারতের অধীন একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ হতেও রাজী। তবুও তারা যুক্ত বাংলার মুসলমানের সাথে মিলে মিশে আলাদা স্বাধীন দেশে অথবা পাকিস্তানে সামিল হতে রাজী নয়। এটাকেই হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির পুরানো বিষবৃক্ষ আবার নতুন করে রোপন করা বলা যায়। যারা মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক বলে অভিহিত করেন ভারতের এবং বাংলাদেশের সেই বুদ্ধিজীবীরা এ বিষয়ে কি বলতে চান?

শিক্ষিত বর্ণবাদী হিন্দুর মনোবৃত্তি বুঝা ভার

মুসলিম বা ইংরেজ শাসনের বহু পূর্বে বর্তমান ভারতের মহারাষ্ট্র অধিবাসী মারাঠা জাতি তীর, ধনুক, অষ্টিচালনা ও অশ্বারোহনে অসীম পারদর্শিতা অর্জন করেছিল। নিজেরদের যথেষ্ট শক্তিশালী ভেবে ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত থেকে মধ্য প্রদেশ, নাগপুর প্রভৃতি দেশে লুটপাট করার পরে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে

সেই যুগের পোড়া মাটি নীতি অনুসরণ সাপেক্ষে লুটপাট, নরহত্যা, নারী ধর্ষণ আরও যত রকম দস্যুতা আছে তার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল। এই মারাঠাদের তখন বর্গী নামে অভিহিত করা হতো। তাদের ভয়ে গৃহের নরনারীরা জঙ্গলে পালিয়েও নিষ্কৃতি পেত না। লুটতরাজ ছাড়াও তারা যে কত নরহত্যা, নারী ধর্ষণ করেছে তার সঠিক পরিসংখ্যান জানা নেই।

তখনকার বাঙ্গালীরা বর্গীদের নামে এত ভীত ছিল যে, মায়েরা শিশুদের বর্গীদের ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়াত। কবির ভাষায় ঃ

'ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে, ধান ফুরাল, পান ফুরাল খাজনার উপায় কী? আর কটা দিন সবুর কর রসুনবুনেছি।'

বর্ণ হিন্দুদের মন বুঝা ভার। এত অত্যাচার ও লুণ্ঠিত সেই হিন্দুরা কী করে মারাঠী নেতা "শিবাজী উৎসব" পালন করে কলিকাতার বুকে? মারাঠা দস্যু কর্তৃক বাঙ্গালীদের উপর এত অত্যাচার ও নারী ধর্ষণের পরেও বাঙ্গালীর গৌরব কবিদের গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কী ভাবে 'শিবাজী উৎসব' লিখতে পারলেন? যার কয়েকটি পংক্তি হচ্ছে নিম্নরূপঃ

'মারাঠার সাথে আজি হে বাঙ্গালী
এক কণ্ঠে বল জয়তু শিবাজী।
মারাঠার সাথে আজি হে বাঙ্গালী
এক সাথে চলো মহোৎসবে সাজি।'

শুনতে পাচ্ছি পরিণত বয়সে ব্রাহ্মণ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ধর্মে আর বিশ্বাস করেননি। তিনি ব্রাহ্ম্য ধর্ম অবলম্বন করেছিলেন এবং শিবাজী উৎসবের বইখানাও আর বাজারে ছাড়েননি। দুঃখও করেছেন নাকি ঐ বই লেখার জন্য।

ইংরেজরা বাণিজ্যিক কারণে কলকাতা আসার পূর্বে মাদ্রাজে অবস্থান করেছিলেন সেই সুবাদে দাক্ষিণাত্যের মাদ্রাজীরা ঐ সময়ের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় শিক্ষিত হয়ে, ব্যবসা বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করে এবং ভারতের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে এবং তাতে একরূপ শীর্ষস্থান ও নেতৃত্ব লাভ করে। আজও তাদের ভারত শাসনের কর্তৃত্ব বজায় রয়েছে।

১৭৫৭ থেকে ১৯১২ সন পর্যন্ত অর্থাৎ ১৫৫ বছর ইংরেজ শাসনের রাজধানী ছিল কলিকাতায়। এখানে রাজধানী থাকা কালীন সময়ে বঙ্গবাসী বর্ণবাদী শিক্ষিত হিন্দুরা ছিল বৃটিশ শাসনের প্রথম থেকেই প্রথম সারির একান্ত অনুগত অগ্রযাত্রী।

কিন্তু ১৯১২ সন থেকে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হওয়ার পর এই অল্প সময় অর্থাৎ (১৯৪৭–১৯১২) অর্থাৎ ৩৫ বছরের মধ্যে সেই বাঙ্গালী হিন্দুরা শিক্ষা দীক্ষা ও বৃটিশ দালালীতে শুধু ভারত উপমহাদেশে কেন প্রাচ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে অগ্রগন্য ছিল তারা কলিকাতা হতে দিল্লীতে ভারতীয় রাজধানী স্থানান্তরের পর উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয়দের হাতে এই অল্প সময় ৩৫ বছরের মধ্যে নেতৃত্ব হারালো। কী আশ্চর্য স্বাধীনতার পরেও আজ অবধি পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুরা ভারত শাসন বা নেতৃত্বের অঙ্গনে কোন বিশেষ চিহ্ন রাখতে পারেনি। স্বাধীনতার জন্ম লগ্ন হতে আজ পর্যন্ত একজন বাঙ্গালী ভারতবর্ষের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হতে পারল না কেন তার কারণ কী?

আর একটি প্রশ্ন আমার মনের কোণে প্রায়ই উঁকি মারে তাহলো ১৯০৫ সালে যখন বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হয় তখন বাংলা প্রেসিডেন্সী এলাকা ছিল আমাদের যশোর, কুষ্টিয়া জেলা থেকে ভারতের ছোট নাগপুর পর্যন্ত প্রায় ১, ৪১,৫৮০ বর্গমাইল আর এর লোকসংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৪০ লাখের মতো। এবং হিন্দুরা ছিল বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্তু ১৯১১ সনে যখন বঙ্গভঙ্গ রদ হলো তখন বাংলা প্রেসিডেন্সীর আয়তন দাঁড়াল আমাদের চট্টগ্রাম থেকে ভারতীয় মেদিনীপুর জিলা পর্যন্ত মাত্র ৮৫ হাজার বর্গমাইলের মত। এবং বাঙ্গালী মুসলমান জনসংখ্যা ভিত্তিক দাঁড়াল সংখ্যা গুরু। হিন্দুরা হলো সংখ্যালঘিষ্ট। বঙ্গভঙ্গ রদ করে হিন্দুদের লাভ কী হল?

১৭৫৭ সন থেকে ১৯১১ সন পর্যন্ত হিন্দু প্রধান কলিকাতা নগরী ছিল ভারতের রাজধানী প্রায় ১০০ বৎসর। কিন্তু বঙ্গ ভঙ্গ রদের পরে ভারতীয় রাজধানী কলিকাতা থেকে বহু দূরে উত্তর ভারতের অবাঙ্গালী অধ্যুষিত দিল্লীতে স্থানান্তরিত হলো, অর্থাৎ বঙ্গ ভঙ্গ রদের ফলে বাঙ্গালী বর্ণবাদী হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও বিত্তশালীদের হাতের নাগাল থেকে ভারতের রাজধানী চলে গেল সুদূর দিল্লীতে। অবাঙ্গালীদের দোর গোড়ায়।

১৯১২ সন থেকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নেতৃত্ব যে বাঙ্গালী হিন্দুরা হারাল আজও তারা উদ্ধার করতে পারেনি। আর ভবিষ্যতে পারবে বলেও যুক্তিযুক্ত কোন কারণ দেখা যায় না। কারণ বাঙ্গালী হিন্দুরা ভারতের সর্বমোট জনসংখ্যার মাত্র শতকরা আট কি নয় শতাংশ এর মত। কলিকাতা শহরে বাঙ্গালী হিন্দুরা ঘরের মধ্যে বাংলায় কথা বলে কিন্তু রাস্তায় বেরুলেই বা সরকারী অফিস আদালতে হিন্দী বলতে বাধ্য হয়। আজ বাঙ্গালী হিন্দুরা নিজেদের স্বকীয়তা পর্যন্ত

হারাতে বসেছে। ভাগ্যের এমনি পরিহাস। ভারতে যোগ দিয়ে বাঙ্গালী হিন্দুদের কী লাভ হল? তারা আজ ভারতে সর্বক্ষেত্রে উপেক্ষিত অপাংক্তেয়।

অপরদিকে আমাদের বাংলাদেশ পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার সুবাদে স্বাধীন হল। স্বাধীন বাংলাদেশ যত ছোট দেশ হোক না কেন জাতিসংঘের সভ্য হল, বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা জাতিসংঘ ও বিভিন্ন স্বাধীন দেশের রাজধানীতে বাংলাদেশের দূতাবাসে উড়ছে। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা শুধু দেশের কোর্ট কাচারী, সরকারী অফিস আদালতে সরকারী ভাষা বলে গণ্য হয়নি জাতিসংঘের দরবারে বা যে কোন আন্তর্জাতিক সভা সমিতিতে ও পৃথিবীর মানব সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাহলে ইতিহাসের বিচারে কাদের লাভ হলো? ভারতীয় বাংলা ভাষাভাষীদের না বাংলাদেশীয়দের?

মহা বাংলাদেশ কায়েমই ভারতীয় বাঙ্গালীদের বাঁচার উপায়

তবে এখনও উপায় আছেঃ আমরা যেমন পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন হয়েছি তেমনি স্বাধীন বাংলাদেশের আশেপাশে যত বাংলা ভাষাভাষী ক্ষুদ্র রাজ্য আছে যেমন পশ্চিম বঙ্গ, সাবেক কুচবিহার, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে যে সব বাংলা ভাষাভাষী সকলে মিলে ভারত থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন বাংলাদেশের সাথে একত্রে মিলেমিশে এক অখণ্ড শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী মহা বাংলাদেশ গঠন করা যায়। আবারও দুনিয়ার বুকে সকল বাংলা ভাষাভাষীদের নিয়ে এক মহাজাতির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়। যদি হিন্দু মুসলিম ও বৃটিশ আমলের সকল ধর্মাবলম্বীরা (হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান) একত্রে সুখে দুঃখে এক বাংলাদেশের মাটিতে বসবাস করতে পারে তবে আজও পারবে।

বৃটিশ আমলে যে ভাবে ১৯০৫ সনের বঙ্গভঙ্গ ১৯১১ সনে রদ করা হয়েছিল সেভাবেই ১৯৪৭ সনের দিল্লী সরকারের বাঙ্গালী জাতিকে বিভক্ত করার হীন কূটনীতির কুফল বঙ্গ ভঙ্গ আইন আবার রোধ করা যাবে যদি ভারতীয় বাঙ্গালীরা সকল বাংলা ভাষাভাষী বাঙ্গালী জাতির সঙ্গে এক জাতি হতে চায়। আমাদের জাতীয় স্বকীয়তা রক্ষা করতে আমার মনে যে ভারতের বাংলা ভাষাভাষী ভাই বোনেরা মিলে আন্তরিক ও অকুতোভয় চেষ্টা করলে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সাথে একত্রে আবার পৃথিবীর মানচিত্রে এক মহা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা যায়। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় পশ্চিম বাংলার ভাই বোনেরা আমাদের যে সর্বতোরকম সাহায্য করেছেন, প্রায় ১ কোটির মত উদ্বাস্তু

77744
গ্রন্থাগার
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

বাঙ্গালীদের খাদ্য বাসস্থানসহ সার্বিক সাহায্য করেছিলেন তা আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি। আজ যদি সীমান্তের ওপারের বাংলা ভাষাভাষী ভাই বোনদের প্রয়োজন হয় তবে বাংলাদেশ ততোধিক যথা সর্বস্ব দিয়ে ভারতীয় বাঙ্গালীদের কাছে এদেশের ঋন পরিশোধের আপ্রাণ চেষ্টা করতে এতটুকু কুণ্ঠিত হবে না।

১৯৩৭ সনের নির্বাচন

গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া এক্ট ১৯৩৫ অনুযায়ী ১ম বারের মতো ১৯৩৭ সনে বৃটিশ শাসিত সারা ভারতে (করদ মিত্র রাজ্যসমূহ বাদে) প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রাদেশিক বিধান সভাগুলিতে সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। (সাম্প্রদায়িক পৃথক নির্বাচন) নির্বাচনের ফল মোটামুটি নিম্নরূপ ঃ

যুক্ত বাংলাদেশে শেরে বাংলা ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টি ও স্যার নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ যুক্তভাবে হিন্দুদের চেয়ে অনেক সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়। তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে শেরে বাংলা তার কৃষক শ্রমিক পার্টি নিয়ে মুসলিম লীগের অন্তর্ভূক্ত হয়। তখন শেরে বাংলা মুসলিম লীগের নেতা নির্বাচিত হন। তখনকার দিনে প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী বলা হতো না বলা হতো প্রাইম মিনিষ্টার। শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক প্রবীণ রাজনীতিবিদ এবং পূর্বেও বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন অবস্থায় শাসন করার (এডমিনিষ্ট্রেটিভ) দক্ষতা অর্জ করেছিলেন। তিনি নিজেও উচ্চ শিক্ষিত (এম. এম. সি. এবং এডভোকেট) তিনি তার মন্ত্রীসভায় বেছে বেছে সুদক্ষ, সুশিক্ষিত জননায়ক যেমন স্যার নাজিমুদ্দীন, মোঃ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দী এবং কলিকাতার সাবেক মেয়র নলিনী রঞ্জন সরকার প্রভৃতি দক্ষ শাসনকর্তা ও রাজনীতিবিদদের নিয়ে হিন্দু মুসলিম মিলিত এক শক্তিশালী মন্ত্রীসভা গঠন করেছিলেন।

সিন্ধু প্রদেশে মাত্র ১জন কি ২জন সংখ্যা গুরু সদস্য নিয়ে স্যার হেদায়েতুল্লাহ মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করেন। যেহেতু সিন্ধুতে মুসলিম লীগ সদস্য সংখ্যা খুবই কম (মার্জিনাল) সেহেতু কিছু স্বার্থপর সদস্য নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের জন্য একবার সরকারী দলে আবার কিছুদিন পরে বিরোধী দলে গিয়ে সরকারের পতন ঘটাতো— এই খেলার জন্য মুসলিম লীগ সিন্ধু প্রদেশে কোন স্থিতিশীল সরকার গঠন করতে অপারাগ হয়। যদিও সেখানে মোটের উপর মুসলমান সংখ্যাগুরু।

অবিভক্ত পাঞ্জাবে মুসলমানরা সংখ্যাগুরু সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু সেখানে মিঃ জিন্নাহ্‌র মুসলিম লীগ সরকার গঠন করতে পারেনি। কিছু সংখ্যক মুসলিম সদস্য ও আকালী দলের শিখদের নিয়ে খিজির হায়াত খান ইউনিয়নিষ্ট পার্টি সরকার গঠন করেন। স্বাভাবিক ভাবেই মন্ত্রীত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য খিজির হায়াত খান ও তার ইউনিয়নিষ্ট পার্টি পাঞ্জাবে মুসলিম লীগের বিপক্ষে ছিলেন।

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (পাঠান মুল্লুক) যেখানে দুর্ধষ প্রবীন কংগ্রেস নেতা বাদশা খান (যাকে সীমান্ত গান্ধী বলা হত) ও তার ছোট ভাই ডঃ খান সাহেবের নেতৃত্বে কংগ্রেস সংখ্যাগুরু মন্ত্রীসভা গঠন করেন। যদিও সেখানে বিধান সভাতে বোধহয় ৮০% শতাংশ সদস্য মুসলমান।

এই হল মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশগুলির ১৯৩৭ মনের প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটের পরের রাজনৈতিক চেহারা। তাছাড়া ভারতের বাকি প্রদেশগুলির সবগুলিতেই কংগ্রেস সংখ্যাধিক্য শক্তি হওয়াতে প্রত্যেক প্রদেশেই কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এই হল মোটামুটি তৎকালীন সর্বভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি। যে সব জায়গায় কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গঠন করেছেন সে সব জায়গায় মুসলিম লীগ বিরোধী দল গঠন করেছেন বা বিরোধী দলে যোগ দিয়ে কাজ করেছেন।

বর্ণবাদী হিন্দুরা প্রথম শাসনের সুযোগ পেল

প্রায় ৭ শত বৎসরের পরাধীনতার পর ভারতীয় হিন্দুরা দেশ শাসনের আবার সুযোগ পেল। মুখে মুখে হিন্দুরা যত (সেকুলারেজিম) ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলুক না কেন তাদের মনে প্রাণে যে হিন্দু জাতির স্বার্থই সর্ববৃহৎ তা সরকারী পর্যায়ে প্রকাশ হয়ে পড়ল হিন্দু প্রধান কংগ্রেস পার্টি ১৯৩৭ সনের নির্বাচনের পর সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে বম্বে প্রদেশে মিঃ নরী ম্যান সুশিক্ষিত সুদক্ষ যিনি আজীবন কংগ্রেসের সেবা করেও বম্বে প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী হতে পারলেন না। যেহেতু তিনি ছিলেন পারসিক সম্প্রদায়ের লোক। হিন্দুদের খুশী করার জন্য সরদার প্যাটেলের মনোনীত নব্য নির্বাচিত কংগ্রেসের হিন্দু সদস্য মিঃ বিজিমের বম্বে কংগ্রেস এসেম্বলী পার্টির নেতাও বম্বে সরকারের প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হল। ভারতের এককালের কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মাওলানা আবুল কালাম আজাদের বই ইণ্ডিয়ান উইনস ফ্রীডম পৃঃ ১৭ থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হল "None who knew the inner story was satisfied with the verdict we all knew that truth had been sacrificed in order to satisfy

Sarder Patel's communal demands Poor Nariman was heart broken and his public service came to an end" অর্থ : "ভিতরের কাহিনী না জানলে কেউই তো সিদ্ধান্তের মর্ম বুঝতে পারবেন না। আমরা সবাই জানি যে সরদার প্যাটেলের সাম্প্রদায়িক দাবী পূরণের লক্ষ্যে আসল আদর্শকে বিসর্জন দেয়া হয়েছে। বেচারা নরীম্যান এতে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন এবং যার ফলে তার জনসেবারও পরিসমাপ্তি ঘটেছে।" এইভাবে, বিহার প্রদেশের ডঃ সৈয়দ মাহমুদ ছিলেন প্রবীন, উচ্চশিক্ষিত, উচ্চ বংশোদ্ভূত জনপ্রিয় সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা। এককালে তিনি সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। কিন্তু বিহারের হিন্দু ও ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের মন খুশী করার জন্য দিল্লীর সেন্ট্রাল এসেম্বলীর নব নির্বাচিত শ্রী কৃষ্ণ সিংহাকে সেন্ট্রাল থেকে নামিয়ে এনে বিহার প্রাদেশিক সরকারের কংগ্রেস এসেম্বলী পার্টি লীডার ও প্রধানমন্ত্রী করা হলো। এখানে মাওলানা আবুল কালাম আজাদের লেখা ঐ বইয়ের ঐ পৃষ্ঠা থেকে পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য উদ্ধৃতি দেয়া হলঃ "Dr. Rajindra Prasad played the same role in Bihar as Sarder Patel did in Bambay. The only difference between Bihar and Bambay was that Sree Krishna Singha formed the Gov. Dr. Syed Mahmud was given a place in the Cabinet."

These two instances left a bad taste at that time. Looking back I can not help feeling that the Congrees did not line up to its professional ideals. One had to admit with regret the nationalism of the Congress had not then reached a stage where it could ignore Communal considerations and select leaders on the basis of merit without regard to majority or minority." অর্থঃ "সরদার প্যাটেল বম্বেতে যা করেছেন বিহারে একই কাজ করেছেন ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ। পার্থক্য শুধু শ্রী কৃষ্ণ সিংহা বিহারে সরকার গঠন করেছেন এবং ডঃ সৈয়দ মাহমুদকে কেবিনেটে স্থান দেয়া হয়েছে।

উপরোক্ত এই দুটো দৃষ্টান্তই ঐ সময় একটি খারাপ নজীর স্থাপন করলো। অতীতের দিকে তাকিয়ে এইভেবে আমার মর্মপীড়া হচ্ছে, যে কংগ্রেস তার ঘোষিত আদর্শে বহাল নেই। দুঃখের সাথে স্বীকার করতে হচ্ছে যে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদ ঐ সময় এমন পর্যায়ে ছিল যাতে সে সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত হয়ে

সংখ্যাগরিষ্ঠ বা লঘিষ্ট নির্বিশেষে মেধার ভিত্তিতে নেতা নির্বাচন করবে।"

সাম্প্রদায়িকতা যখন কংগ্রেস পার্টির ভিতরে তাদের উপরে বর্ণিত উচ্চ পর্যায়ের হিন্দু নেতাদের দ্বারা এরূপ বিষময় ফল ফলিত হলো। যেমন সারাজীবন কংগ্রেসের সেবা করেও যখন মুসলিম ও পারসিক কংগ্রেস সদস্য উপরের স্তরের নেতাদের হাতে যেমন ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এককালে ভারতের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন এবং সরদার প্যাটেল ভারতীয় জাতীয় সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদের সদস্য হয়েছিলেন এত উচ্চস্তরের নেতারা যখন এত সাম্প্রদায়িক তখন কংগ্রেস পার্টির অসাম্প্রদায়িকতার কথা বা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা যে কত হাস্যকর তা সম্মানিত পাঠকবর্গ নিজেরাই অনুমান করে নিবেন। বলা বাহুল্য ১৯৩৭ এর নির্বাচনের পর কোন কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে মুসলমান প্রধান মন্ত্রী কংগ্রেস দ্বারা নির্বাচিত হননি। ব্যতিক্রম শুধু উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ যেখানে শতকরা ৮০% জন নির্বাচিত সদস্য মুসলমান। এই হলো কংগ্রেস পার্টির মনের সাম্প্রদায়িকতার প্রতিচ্ছবি। তারপর তারা সরকার গঠন করার পর কিভাবে দেশ শাসন করেছেন নিম্নের আলোচনায় তা অতি সহজেই বুঝতে পারবেন।

কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে মুসলমানদের সর্বস্বান্ত করা হল

সারা বাংলায় উৎকণ্ঠা বহু শত বৎসর পরে বৃটিশ ভারতের বৃহদাংশের কিছুটা স্বায়ত্ত্ব শাসন পেয়ে ক্ষমতার মদমত্তে কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলি যে কতখানি সাম্প্রদায়িক জুলুম চালিয়েছিল সেই ভয়াবহ কাণ্ডের ইতিহাস মর্মান্তিক। মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলিতে কংগ্রেস শাসনের এহেন জুলুম ও অত্যাচার মুসলমানদের উপর নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারের মত নেমে আসাতে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ, কে, ফজলুল হক ১৯৩৯ সনের মার্চ মাসে গান্ধীজীর নিকট যে একখানা চিঠি লিখেছিলেন, তা তখনকার দিনে বহু খবরের কাগজে ও বইপত্রে ছাপা হয়েছিল। তার কিয়দংশ এখানে তুলে দিলাম; তাতে পাঠকদের তখনকার পরিস্থিতি বুঝতে সহজ ও সুবিধা হবে!

গান্ধীজীকে লেখা অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হকের চিঠি ঃ

মহাত্মাজী,

আদালতের রায়ের দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে আপনাকে লেখার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে আপনি একথা বুঝবেন যে, বিচারকের রায় কত

ভয়ানক গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ। দায়িত্বশীল হিন্দু, কংগ্রেসী, অকংগ্রেসী এবং এমন কি একজন লোক যিনি একটি প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী যার উপর গণতন্ত্র এবং সকলের জীবন রক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে–তিনিও সবাইকে সমানভাবে দাঙ্গাকারী মনে করেছেন। তারা মুসলমানদের এ অপরাধ করার অপরাধে অপরাধী এবং নির্মম হত্যাকারী বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন। তদন্তের নামে এক প্রহসন করা হয়। এবং বিচার আরম্ভ হলে নিজেদের বানানো সাক্ষী দিয়ে বিচারকের সামনে একটি কমিক অভিনয় করানো হয়। স্বাক্ষীর বাক্স থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা বের হতে থাকে। কিন্তু স্বাক্ষীরা কে কত মুসলমানকে হিন্দু হত্যার দায়ে দায়ী করতে পারে এ বিষয় পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা করতে থাকে। কল্পণা করুন আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবদের দুঃখ ও ঝামেলার কথা। উক্ত হতভাগ্যদের আন্দামান পাঠানো ও ফাঁসী থেকে বাঁচানোর জন্য আইনজীবী ও টাকা সংগ্রহ করতে বাধ্য হয়। যদি হাইকোর্টে আপীল করার কোন ব্যবস্থা না হত তাহলে ছয়জন নির্দোষ মুসলিম ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলত। ২৪ জনকে যাবজ্জীবন জেলে আবদ্ধ থাকতে হত। একথা একবার ভাবুন দেখি।

[একথা শেরে বাংলা লিখেছেন মধ্য প্রদেশের চান্দপুর বিশওয়ারা গ্রামের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্বন্ধে। তিনি আরও লিখেছেনঃ]

এজন্য কি বহুল প্রচারিত কংগ্রেসকে জনতা ক্ষমতায় বসিয়েছে? যে তারা গণতন্ত্রের নামে সংখ্যালঘু মুসলমানদের সাথে এরূপ ব্যবহার করবে, এভাবেই মুসলিম সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে ন্যায় বিচার উঠে গেছে। তবুও আপনি গণতন্ত্র ও ন্যায়ের কথা বলছেন। এবং আপনাদের এরূপ গণতন্ত্র ও ন্যায় বিচার প্রদর্শনের জন্য বৃটিশ আপনাদের ক্ষমতা দিচ্ছে না বলে তাদের (বৃটিশের) দোষারোপ করেন?

আপনি বলতে পারেন যে এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে তাদের একই মনোভাবের ফলে অন্যান্য কয়েকটি কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে মুসলিম সংখ্যালঘুদের ধন সম্পদের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়েছে। তারা অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টে পতিত হয়েছে।

দ্বিতীয় যারা নির্দোষ মুসলমানদের ফাঁসী কাঠে ঝুলানোর ষড়যন্ত্র করছে, তাদের নিন্দা করে সারা ভারতে কোনও একজন হিন্দুও একটা কথা বলেছে? যারা ন্যায় বিচারের ফলে মৃত্যুর দেয়াল থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে, তাদের সহানুভূতিতে একটা হিন্দু সংবাদ পত্রও কী কিছু লিখেছে? বা ঐ সমস্ত হিন্দুদের নিন্দা করেছে যারা নির্দোষ মুসলমানদের ফাঁসীকাঠে ঝুলানোর ষড়যন্ত্র করেছিল? এটা কি মনে হচ্ছে না যে মুসলমানদের হাইকোর্টে আপীলের ফলে সাধারণ

হিন্দুরা বলতে গেলে নিরাশ হয়েছে। অথবা হিন্দু মন্ত্রীরা বা অন্যান্যরা যেভাবে সাক্ষ্য সংগ্রহ করে নির্দোষ মুসলমানদের ফাঁসী দেবার ব্যবস্থা করেছে তাতে তারা কোন অন্যায় দেখছে না। বরং মহাত্মাজী আপনি নিজেও এ ব্যাপারে কী করছেন? আপনি নিশ্চয়ই এসব ঘটনা সম্বন্ধে অজ্ঞ নন? আপনার সত্য, আপনার অহিংসা, আপনার ন্যায়, আপনার সততার ধারণা কী ঐ সমস্ত কিছু লোকের মত যারা কংগ্রেসী, আপনার সম্প্রদায়ভুক্তদের ঘৃণ্য কাজ দেখে আপনি ক্রুদ্ধ হচ্ছেন না কেন? আপনি নোয়াখালির মত একটা জেলার একটি সামান্য ঘটনাকে এতই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন যার ফলে হিন্দুদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংসার পথ বেছে নেয়ায় আপনার হরিজন পত্রিকায় প্রবন্ধ ছাপতে পারল।

আসলে নোয়াখালীতে কোন অন্যায় করা হয়নি। শুধু একজন মুসলিম মাত্র একবার একটি অসংগত বক্তৃতা করেছিল। কিন্তু চান্দপুর বিশওয়ারের বেদনাদায়ক ঘটনা, সেখানকার নির্দোষ মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের সংকীর্ণ ষড়যন্ত্রের করুণ কাহিনী আপনাকে বিচলিত করতে পারেনি। অন্যদিকে মুসলমানের জীবন বিনষ্ট করার যে হিন্দুদের উল্লেখিত প্রতিযোগিতা এর বিরুদ্ধে আপনার মুখ থেকে একটি কথা, আপনার কলম থেকে একটি শব্দও বেরুল না।

আপনার এ নীরবতা আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করব? এ সকল ঘটনা কি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে না যে, হিন্দু ও মুসলমান দুটি ভিন্ন জাতি। কাজেই নিছক সংখ্যাগরীষ্ঠের শাসন এ অর্থে গণতন্ত্রকে মুসলমানরা মেনে নিতে পারে না বা ক্ষমতায় অধ্যুষিত হিন্দুদের কাছ থেকে কোন ন্যায় বিচারের আশাও করতে পারে না।

এ অবস্থায় মুসলমানেরা মনে করে যে, সংখ্যাগরীষ্ঠের শাসন এ অর্থে গণতন্ত্র ভারতে সম্পূর্ণরূপেই অকেজো। আপনি তাদের দোষ দিতে পারেন? এমতাবস্থায় মুসলমানেরা যদি বিশ্বাস করে যে, তাদের যে মানসিকতা চান্দপুর বিশওয়ারের ব্যাপারে প্রকাশ পেয়েছে সেক্ষেত্রে যদি হিন্দুরা ক্ষমতা দখল করে তাহলে তারা মুসলমানদের প্রতি সামান্যতম ন্যায় বিচার করতে পারবে না। আপনি কি সততার সাথে মনে করেন যে এ বিশ্বাস ন্যায় সঙ্গত নয়?

আপনি এবং অন্যান্য হিন্দুরা মাননীয় সরকারের এ ঘোষণাকে মানতে পারতেন না। সরকার বলেছে তারা ভারতের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য তাদের বর্তমান ক্ষমতা এমন কোন সরকারী কাঠামোর কাছে হস্তান্তর করার চিন্তা করছে না যারা ভারতের জাতীয় জীবনের একটি শক্তিশালী অংশ কর্তৃক গ্রাহ্য হবে না। অথবা কাউকে জোর করে কোন শাসন ব্যবস্থা মানতে বাধ্য করবে না।

এ সম্বন্ধে নাগপুর হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হলে রায় দান প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি এ ঘটনাকে অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার বলে মন্তব্য করেছেন। ব্যাপার হল যে, যখন ৪৩ জন লোক আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াল তখন একে একে

মিথ্যা সাক্ষী বানানো সাক্ষীগণ একের পর এক দাঁড়িয়ে আরও একজন নির্দোষ লোককে ফাঁসী দেবার ব্যবস্থা পাকা করেছে। ...

শেরে বাংলার উপরোক্ত পত্রে ভারতের বাপুজি গান্ধীজী থেকে আরম্ভ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের ও কংগ্রেস আমলের মন মানসিকতা প্রকাশ করেছে।

এভাবে শেরে বাংলা ফজলুল হকের সাথে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও পণ্ডিত নেহেরুর নিকট কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর সংখ্যাগরীষ্ঠ হিন্দুদের নির্যাতনের বিষয় নিয়ে বেশ কয়েকটি পত্র বিনিময় হয় — তাও তখনকার দিনের দৈনিক খবরের কাগজপত্র ও বই পুস্তকে প্রকাশ হয়। নিম্নে তার কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরা হলো ঃ

বিহার প্রদেশ, গয়া জেলা
২৫ শে জুলাই, ১৯৩৭ সন

মদনপুর গরুর মেলায় মুসলমানদের উপর হিন্দুদের অতর্কিত আক্রমণ হয় ও তাদের ধনসম্পদ লুটপাট করা হয়। হিন্দুরা বিপদজনক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত ছিল। এর আগের দিন স্থানীয় এক হিন্দু পণ্ডিত উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দেয় এবং দাঙ্গার জন্য স্থানীয় লোকদের উদ্বুদ্ধ করে। তা সত্ত্বেও পুলিশ কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেনি। বিহারের প্রধানমন্ত্রী দাঙ্গায় আহত মুসলমানদের সান্ত্বনা দেয়া দূরে থাকুক আরও অপমান করে মুসলমানদের এই দাঙ্গার জন্য দায়ী করা হয়।

৩০ শে মে আগষ্ট, ১৯৩৭ সন

বিহারের পাটনা জেলার এই অঞ্চলের হিন্দু গোয়ালরা ১৯৪৭ সনের সেপ্টেম্বরের দিকে নাগ্‌র নোঙ্কা গ্রামের একটি মুসলিম কবরস্থান জোর করে দখল করে এবং মুসলমানরা বাধা দিলে হিন্দুরা কয়েকজন মুসলমানকে আহত করে। এজন্য বিহারের এস-ডি-ও কয়েকজন হিন্দুকে সাজা দেন কিন্তু আপীলে আসামীরা বেকসুর খালাস পায়।

গয়া জেলা রাজপুর খাইল্লা,
৯ই নভেম্বর, ১৯৩৭ সন

ঐ গ্রামের হিন্দুরা স্থানীয় ইমাম বাড়া তছনছ করে এবং আজানের পর মুসলমানরা যখন এশার নামাজের জন্য মসজিদে আসে তখন মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ করে। বহু মুসলমানকে হতাহত করে। এরপর হিন্দুরা

মুসলমানদের বাড়ি ঘরে আগুন দিয়ে সম্পূর্ণ পুড়িয়ে দেয়। বিহার সরকার দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

সাহরান জেলার করণপুর,
২৭ শে অক্টোবর, ১৯৩৭ সন

শবেবরাত রাতে ২জন হিন্দু সিপাহী একজন মুসলমানের ঘরে ঢুকে বাড়ীওয়ালাকে খুঁজে না পেয়ে মহিলাদের উপর আক্রমণ ও অত্যাচার করে। যারা এ দুস্কর্ম করেছে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

সাহরান জেলা, খয়বাতিয়া,
৩০ শে নভেম্বর, ১৯৩৭ সন

একজন মহিলা সহ বহু মুসলমান হিন্দুদের দ্বারা মারাত্মকভাবে আক্রান্ত ও আহত হয়। ৩ জন মুসলমানের ঘর সম্পূর্ণ রূপে পুড়িয়ে দেয়া হয়। মুসলমানরা প্রাণ ভয়ে স্থানীয় মসজিদে আশ্রয় নিলে মসজিদের ভিতরেও তাদের আক্রমণ করা হয় এবং মসজিদটি বিনষ্ট করা হয়। একজন মুসলমানের দোকান লুট হয়। মুসলমান নারী শিশুরা ভয়ে সারারাত আখ ক্ষেতে পালিয়ে থাকে। সরকার এর কোন প্রতিকার করেনি।

পাটনা জেলার লালুপাড়া, মুজফ্ফরপুর জেলার করাইল, সওতল পরগনার মাজহিওয়ান, পাটনা জেলার রসুলপুর, ভাগলপুর জেলার মাজহাউল, পাটনা জেলার কারা, পাটনা জেলার ধামাপুর, চম্পাবন জেলার খাদবায়ন, সাহরান জেলার লুথু, হাজারিবাগ জেলার কিরোকারী, মুঙ্গের জেলার বাচরাইনগঞ্জ, হাজারিবাগ জেলার মাছুল মোহানা, গয়া জেলার কানোর ও রাবৈ, দ্বারভাঙ্গা জেলার মনিপুর, গয়া জেলার দাউদনগর, মুঙ্গের জেলার মাজহাউর, গয়া জেলার কারিওয়াস, দ্বারভাঙ্গা জেলার বারারা, ভাগলপুর জেলার কাইয়া, মজফ্ফরপুর জেলার নয়াগাঁও, পাটনা জেলার পাখাওয়ালী মোর হাট্টা ও মাহার ও টিউবি, গয়া জেলার পরানপুর পাবরুমা, ভাগলপুরের আরা, দ্বারভাঙ্গা জেলার কারো, পাটনা শহর, দ্বারভাঙ্গার সমাস্তিপুর, পাটনা জেলার কুলওয়ারা শরীফ, পাটনা জেলার বাড়া, পচতারন, মাহালি, পালিতা কামরিনা, মাজহার, পার সরাই, লাজপুর, কার্তিসরোই, গয়া জেলার গাউসপুর। আরা শহর, সাহরান জেলার সরবন ও বেথমনাউল, গরখার্চ, কারাত পর্বি, লুঠি, ভাদরপুর, চম্পাবন জেলার বাঘা,

দ্বারভাঙ্গা জেলার বানার। মুঙ্গের জেলার যোথপুর। সরাট, খাট্টা, পুর্নিয়া জেলার ইসলামপুর হাট, সওতল পরগনার সাহেবগঞ্জ ছাড়াও আরো বিহার প্রদেশের বহু স্থানে মুসলমানদের উপর ভয়াবহ অত্যাচার, উৎপীড়ন করা হয়, মসজিদ ধ্বংস ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। বিহার সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার তারা কোন উপযুক্ত প্রতিকার করেনি।

যুক্তপ্রদেশে ঐরূপ বহু মুসলমানদের উপর অত্যাচারের ঘটনা ঘটে। কিন্তু বইয়ের কলেবর বেড়ে যাওয়ার ভয়ে নিম্নলিখিত কয়েকটি মাত্র অত্যাচার, উৎপীড়নের কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হলো, যেমন বাল্লা জেলার জাদরী, গোরান জেলার মহিলাবাদ, খাজরান, গনেশপুর, বেনরোয়া জেলার সনদ, আগ্রা, এলাহাবাদ, আরাইন, রায়পুর, ফৈজাবাদ জেলার তীস্তা, আলীগড়, মুরাদবাদ, বাস্তী, মাদারপুর, জমাদ্দারপুর, মোগল সরাই, আরো বহু জায়গাতে মুসলমানেদের উপর হিন্দুদের সশস্ত্র আক্রমণ কখনো কখনো পুলিশ বাহিনী হিন্দু আক্রমণকারীদের সাথে সহযোগিতা কখনো কখনো নীরব দর্শক, আর সরকার ছিল নির্লিপ্ত।

মধ্যপ্রদেশেও উপরোক্ত ঘটনা সমূহের মত বহু ঘটনা ঘটেছে। হক সাহেব বহু ঘটনার অবতারণা করেছেন।

উপসংহারে শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হক লিখলেন, "আমরা যেসব খবর পেয়েছি তার বর্ণনা এখানে শেষ করেছি। এমনও হতে পারে যে কোন কোন জায়গায় দুষ্কৃতিকারীরা সাজা পেয়েছেন, অথচ সে সব খবর এখনও আমাদের কাছে পৌছায়নি। তাতেও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলমানদের মামলাগুলোর কোন তারতম্য হবে না। কেহ একথা অস্বীকার করতে পারবে না যে, অসহায় মুসলমানেরা মারাত্মক পরিবেশে আক্রান্ত হয়েছিল এবং মুসলমানরা হিন্দুদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক কম ছিল বলে তাদের দুর্ভোগ চরমে পৌছেছিল।

কংগ্রেসের শাসনামলে মুসলমানদের ত্রাসের মধ্যে বাস করতে হত এবং জঘন্য আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এ ব্যাপারে আইনের শাসন ছিল নিষ্ক্রীয় এমন কি আদৌ ছিল না বললেই চলে।

এই হল কংগ্রেস আমলের শুরুতে মুসলমানদের উপর হিন্দুদের অপরিসীম জুলুম ও অত্যাচারের অতি সংক্ষিপ্ত কাহিনী। সহৃদয় পাঠকবর্গ শেরে বাংলার গান্ধীজীকে চিঠি লেখার উপরোক্ত বর্ণনা হতে অতি সহজেই অনুমান করতে পারেন যে, কংগ্রেস শাসনের শুরুতেই ইংরেজ সরকারের চোখের সামনেই কত ভয়াবহ আকারের অত্যাচার শুরু হয়েছিল। স্বাধীনতা উত্তর ভারতীয় কংগ্রেস

সরকার ও হিন্দুদের, শিখদের জুলুম মুসলমানদের উপর আরও কত বেশি ভয়াবহ হয়েছিল তা পরবর্তিতে বর্ণনা করা হবে। এই প্রসঙ্গে বাবু শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তার লেখা "জিন্নাহ পাকিস্তান নতুন ভাবনা" (মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, শ্যামচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩, এপ্রিল ১৯৮৮ সন) বইয়ের ১১১ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন— যে কোন এক প্রাদেশিক মন্ত্রী যার নাম লেখক লেখেননি তিনি তাকে বলেছেন "নির্বাচনে কংগ্রেস প্রবল সংখ্যাগরীষ্ঠতা পেল। আর কংগ্রেসের স্বার্থ পরায়ণতা বৃদ্ধি পেল। জওহরলালও ঐ প্রবাহে ভেসে গেলেন। অথবা বলা যায় যে কংগ্রেসের "অহম" এর সর্বোচ্চ মাত্রা ছিল তার ভিতরেই। এই কারণে সেসময় মুসলমানদের উপেক্ষা করা হয়েছিল। আর তার দুষ্পরিণামও হল প্রবল। পাকিস্তানের জন্মের মূলে এই কারণ। দীর্ঘদিন যাবত আমার এই অভিমত পাকিস্তান সৃষ্টির মূল দায়িত্ব আমাদের হিন্দু সম্প্রদায়ের। অর্থাৎ কংগ্রেসেরও।"

বিলেতে গোল টেবিল বৈঠক

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বহুদিন বহুবার কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও শিখ নেতাগণ দিল্লীতে ভারতের গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয়ের দরবারে দরবার করেও তেমন কোন ফল লাভ করতে পারেনি।

কাল হরণের জন্যই হোক বা হিন্দু মুসলিম ও শিখ নেতাদের একটু আশ্বস্ত করার জন্যই হোক তিরিশ-এর দশকে একাধিকবার বিলেতে স্বয়ং বৃটিশ সম্রাটের দরবারে ভারতীয় নেতাদের সাথে বৃটিশ সরকারের সর্বোচ্চ নেতৃস্থানীয় লোক এমনকি স্বয়ং বৃটিশ সম্রাট ৫ম জর্জের সভাপতিত্বে গোল টেবিল বৈঠক হয়। কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন গান্ধীজী, পণ্ডিত নেহেরু প্রভৃতি এবং মুসলিম লীগের ছিলেন আগা খান, (বর্তমান আগা খানের দাদা), মাওলানা মোহম্মদ আলী, (আলী ভাইদের একজন), মিঃ জিন্নাহ্, বঙ্গদেশ থেকে শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হক প্রভৃতি।

ভারতের সম্রাট ৫ম জর্জ প্রধানমন্ত্রী প্রমুখের সাথে ভারতীয় নেতাদের কয়েক দফা বৈঠকের পর ভারতীয় নেতাগণ খালি হাতেই দেশে ফিরেছিলেন। যেহেতু গুরুত্বের দিক দিয়ে এইসব বৈঠক সর্বোচ্চ পর্যায়ের ছিল তাই এ-বিষয় উল্লেখ করে রাখা ভাল মনে করা হলো।

এই গোল টেবিল বৈঠকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ একটা ঘটনা হলো মরহুম মাওলানা মোঃ আলী সেই গোল টেবিল বৈঠকে আবেগ ভরে বলেছিলেন যে স্বাধীনতা না নিয়ে তিনি আর পরাধীন ভারতে ফিরবেন না। আল্লাহ্তায়ালা

মাওলানা মোঃ আলীর গভীর ও আন্তরিকতাপূর্ণ বক্তৃতার উপরোক্ত কথাগুলি কবুল করেছিলেন, তাই মাওলানা মোঃ আলীকে আর পরাধীন ভারতে ফিরতে হল না। স্বাধীন বিলেতেই তাকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে হল। আরব দুনিয়া মাওলানা মোঃ আলীর বক্তৃতায় এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, আল্লাহ্‌র অসীম রহমতে তার পবিত্র মৃতদেহ বিলেত থেকে এনে জেরুজালেমের পবিত্র বায়তুল মোকাদ্দাস প্রাঙ্গণে দাফন করলেন। অনারব লোকের বায়তুল মোকাদ্দাসে কবর দেয়ার একক গৌরব আর কেহ পায়নি। আল্লাহ্‌তায়ালা পরাধীন ভারতে দাফন না করে পবিত্র বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদুল আকসার অঙ্গনে যেখানে হজরত দাউদ (আঃ) ও হজরত সোলায়মান (আঃ) শায়িত আছেন তাদের পার্শ্বে ভারতের সিংহ পুরুষ স্বাধীনতা সংগ্রামী মাওলানাকেও শায়িত করালেন। ২য় মহাযুদ্ধের মধ্যে আমি যখন জেরুজালেমে চাকরী উপলক্ষে গিয়েছিলাম তখন পবিত্র বায়তুল মোকাদ্দেসে কবরের পাথরের ফলকে অবিভক্ত ভারতের মরহুম মাওলানা মোঃ আলীর নাম দেখে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় এত আপ্লুত হয়েছিলাম যে আবেগের তাড়নায় চোখের পানি সম্বরণ করতে পারিনি। আমি দু'হাত উঁচু করে সূরা ফাতেহা পড়ে মরহুমের রূহের মাগফেরাতের জন্য অর্পণ করলাম।

আর একটি কথা পাঠকবর্গের উপভোগের জন্য লিখলে বোধহয় ভালই হবে। ইংলণ্ডের রাজা ভারতের সম্রাট ৫ম জর্জ যার সবচেয়ে বড় ও প্রিয় উপনিবেশ ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সম্মানে বাকিংহামে রাজ প্রাসাদে তার মন্ত্রী পরিষদের সদস্য ও বিলেতের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে এক রাজকীয় ভোজের আয়োজন করেছিলেন।– খাওয়া দাওয়ার শেষে যখন অতিথিরা গল্প গুজবের জন্য বসেছিলেন তখন মহামান্য সম্রাট ৫ম জর্জ কৌতুক করে আগা খানকে জিজ্ঞেস করলেন "মাননীয় আগা খান সাহেব, আপনাকে নাকি ভারতে আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা ভগবানের মত পূজা করে?" তখন সেই কৌতুকের উত্তরে আগা খানও বলেছিলেন "মহামান্য সম্রাট–আপনার ভারত উপনিবেশের প্রজারা এত ভাল যে, তারা বিরাট বটবৃক্ষ, বিষধর কোবরা, গরু, মাটির তৈরী মূর্তি পূজা করে। আর আমি তো একজন সুশিক্ষিত, সুসভ্য মানুষ, আমাকে পূজা করলে কি অতিরিক্ত কিছু করা হলো?" এ কথা শুনে সম্রাট ৫ম জর্জ ও হলভরা রাজকীয় মেহমানরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। কয়েকদিন যাবত সম্রাট ৫ম জর্জের পেটের ভিতরে একটি ফোড়া কষ্ট দিচ্ছিল। অট্টহাসির চোটে তার সেই পেটের ফোড়া ফেটে গেল অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়নি। কৌতুকে এতবড় উপকার আর কারও হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

বিলেত থেকে এখন ভারতে ফেরা যাক। ১৯৩৭ সনের সাধারণ নির্বাচনের পরে পূর্বাল্লিখিত রাজনৈতিক দলগুলি প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা গঠন করে স্বাধীনতাপূর্ব

প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের স্বাদ ভোগ করছিল। এতে কারো হয়েছে পৌষ মাস কারো হয়েছে সর্বনাশ। তা পূর্বে বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে। এতদিন আমাদের দেশের নেতারা শিখেছিলেন আন্দোলন কেমন করে করা যায়, রাজপথে মিছিল ও বিক্ষোভ, মিল কলকারখানায় হরতাল, জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে লোককে কী করে উত্তেজিত করা যায়। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার কোন রকম প্রশিক্ষণ বা অভিজ্ঞতা তারা পায়নি। কাজেই হঠাৎ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ধরাকে সরা মনে করলে বা দেশ শাসনে অনুপযুক্ততা প্রমাণ করলে তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সেটা ক্ষমার চোখে দেখতে পারত। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় হচ্ছে–এই ক্ষমতার অপব্যবহার করে এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়কে চরম আঘাত হানছে। সেই আঘাতের ঘা কখনও শুকালো না আস্তে আস্তে ক্ষত আরো গভীর হল। শেষ কালে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হলো। বৃটিশের তৈরী অখণ্ড ভারত ভারতীয় কংগ্রেস দ্বারা দ্বি-খণ্ডিত হলো। পাকিস্তান ও ভারত দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হলো। কোটি কোটি মানুষ পিতৃপুরুষের ঘরবাড়ি ছেড়ে উভয় দেশে শরণার্থী হলো। মিঃ বিভালি নিকলসনের বই "Hate found an empire",-এর "ঘৃণা ও বিদ্বেষের মধ্য থেকে একটা দেশের জন্ম দিল।" তার এই ভবিষ্যৎ বাণীই সত্য হলো।

ইউরোপের যুদ্ধ : ১৯৩৯ সন

অবিভক্ত ভারতবাসীরা যখন প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের বাস্তবায়নে ব্যস্ত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামায় লিপ্ত তখন ইউরোপে একটি সত্যিকার যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছিল। তখনকার জার্মানীর নাৎসী পার্টি প্রধানদের হিটলার স্বৈরতান্ত্রিক (ফ্যাসিষ্ট) রাষ্ট্রপ্রধান জার্মানীকে যুদ্ধের জন্য তৈরী করছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ভার্সাই সন্ধিতে গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি বিজয়ী ক্ষমতাধর দেশ বিজিত জার্মানীর উপরে লজ্জাকর ও অপমানজনক শর্তসমূহ চাপিয়ে তা মানতে বাধ্য করল। হিটলার তার প্রতিকার করার জন্য নাৎসী পার্টির মাধ্যমে পুরো জার্মানী জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে। জার্মানীর এই অপমানিত ভার্সাই সন্ধি বাতিলের জন্য হিটলার বদ্ধ পরিকর হলো। তিনি পুরো জার্মানীকে নতুন করে গড়ে তুলেন। তখনকার দিনের শ্লথ যাতায়াতের পরিবহন পদ্ধতিকে খুব দ্রুতগামী করার জন্য সরকার বহু তলা রাস্তা (অটোবাভ) এমনভাবে তৈরী করলেন যাতে জার্মানীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে গাড়ীকে আর কোন ট্রাফিক সিগনালের জন্য বসে না থেকে তার গন্তব্য স্থানে দ্রুত চলে যেতে পারে। এইভাবে দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে যাতায়াতের জন্য জার্মানীর জনগণের বহু সময় বেঁচে গেল।

হিটলারের গোপন উদ্দেশ্য আপাততঃ ধামা চাপা রাখল। এইভাবে তিনি রেল যাতায়াত আধুনিক ও দ্রুতগামী করলেন। তিনি খুব সুক্ষ বুদ্ধি করে দেশকে শিল্পোন্নত করেছিলেন যাতে ভার্সাই সন্ধির বিজয়ী জাতিগুলি তাকে আর পিছনে ফেলতে না পারে। হিটলার জার্মানীতে লৌহ জমা করে গুদামজাত করে শত্রুদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে তিনি হুকুম দিলেন, জার্মান জাতি প্রত্যেক ঘরে যে যত পারে তাদের আসবাবপত্র লোহা দিয়ে যেন তৈরী করে। জার্মান জাতি করেছিলও তাই। দেখা গেল যুদ্ধের প্রারম্ভে যখন প্রয়োজন হলো তখন বহু লোহা লক্করের ফার্নিচার হিটলার সরকারের নির্দেশে জমা হয়ে গেল। তা দিয়ে যুদ্ধের বন্ধুক, কামান, ট্যাংক প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী হতে লাগল। ভার্সাই সন্ধি অনুসারে সামরিক বাহিনীকে বৃদ্ধি বা আধুনিক করা নিষিদ্ধ ছিলো। তাই তিনি তার নাৎসী দলের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে এমন সামরিক প্রশিক্ষণ দিলেন যে বৃটিশ ফ্রান্স প্রভৃতি আইনতঃ তাকে তেমন বাধা দিতে পারলো না। এই ভাবে তিনি অতি চতুরতার সাথে জার্মান জাতিকে তাদের হৃতভূমি ও গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করলেন।

১৯৩৯ সনের প্রারম্ভ থেকে হিটলার জার্মানীর হারানো রাজ্যাংশগুলি পুনরুদ্ধার করতে আরম্ভ করলেন। অষ্ট্রিয়া পুনর্দখল করলেন। তারপর চেকোশ্লাভাকিয়া ও পোলান্ড আক্রমণ করলেন।

এতদিন তদানীন্তন সুপার পাওয়ার গ্রেট বৃটেন শান্তির লক্ষ্যে যুদ্ধ এড়াবার জন্য হিটলারকে না চটিয়ে শান্ত রাখার পলিসি অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু হিটলারের পোল্যান্ড আক্রমণের পরে বৃটেন হিটলারকে না চটানোর পলিসি বদল করতে বাধ্য হল। তাই সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সনে জার্মানীর বিরুদ্ধে বৃটিশ যুদ্ধ ঘোষণা করল। এইভাবে জার্মানীর বিরুদ্ধে বৃটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউরোপের দেশগুলি যুদ্ধে তুমুলভাবে জড়িয়ে পড়ল ও জার্মানীর নিকট পরাজিত হল। ওদিকে ইতালীর একনায়ক মুসোলিনী হিটলারের সাথে যোগ দিয়ে ইউরোপে তাণ্ডব যুদ্ধ শুরু করে দিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

১৯৪১ সনের জুন মাসে হিটলার সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করে বসল। রাশিয়া যখন ইউরোপ ফ্রন্টে যুদ্ধে ব্যস্ত তখন সুযোগ বুঝে ১৯৪১ সনের শেষের দিকে জাপান আমেরিকার পার্ল হারবার আক্রমণ করে বসল। মিত্রশক্তির পক্ষে বৃটিশ, ফ্রান্স, রাশিয়া, আমেরিকা অন্যপক্ষে জার্মান, জাপান, ইতালী প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে নেমে পড়ল। তখন থেকেই এ যুদ্ধ প্রকৃতই ২য় বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হলো।

ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে বৃটিশ সরকার ভারতবাসীকে যুদ্ধে সহায়তা করার জন্য যে ভারতীয় কংগ্রেস বৃটিশ সরকারের সাহায্য করার জন্য বৃটিশ আই. সি. এস হিউমের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন প্রথমে সেই কংগ্রেসেরই দ্বারস্থ হলেন। কিন্তু বৃটিশ ভুলে গেছে যে এই অর্ধ শতাব্দীতে গঙ্গা-যমুনা ও সিন্ধু নদের বহু পানি গড়িয়ে গেছে। বৃটিশের সহযোগী কংগ্রেস এখন আর দালালী করতে রাজী নয়। ভারতীয় কংগ্রেস বললেন, হয় ভারতের স্বাধীনতা দাও, নতুবা প্রতিশ্রুতি দাও যে, যুদ্ধের পরে ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিবে। তবে বর্তমান ভাইসরয়ের (একজিকিউটিভ) কার্যনির্বাহী কমিটিকে ভারতীয় কাউন্সিল সদস্য দ্বারা পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি মন্ত্রী পরিষদ গঠন করতে হবে। এবং ভাইসরয়কে এই কেবিনেটের পরামর্শ অনুসারে সকল কাজ করতে হবে। এইভাবে প্রায় সকল ভারতীয় জাতীয় নেতৃবৃন্দ ভাইসরয় ও বৃটিশ গভর্নমেন্টের মধ্যে দরকষাকষি শুরু করল। ভারতীয় মুসলিম লীগও কায়েদে আজম মোঃ আলী জিন্নাহ্র নেতৃত্বে মোটামুটি একইভাবে ভারতের স্বাধীনতা চাইলেন।

ভারতের স্বাধীনতায় মার্কিন অবদান

ইউরোপের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে মিঃ রুজভেল্টের নেতৃত্বে আমেরিকান সরকার বৃটিশ সরকারকে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের নামে জনগণের এই যুদ্ধে সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি সমঝোতায় আসার জন্য অনুরোধ করছিলেন। জাপানরা যখন বার্মা দখল করে ভারতের দোর গোড়ায় আঘাত হানতে শুরু করল তখন মিত্র বাহিনীর বড় অংশীদার আমেরিকান সরকার বৃটিশ সরকারকে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে একটি সমঝোতায় আসার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চরিত্র ও চাপ সৃষ্টি করছিলেন। কিন্তু বৃটিশ গভর্নমেন্ট এত সকালে প্রায় দুই শতাব্দীর পুরানো তার সবচেয়ে বড় উপনিবেশের শাসন ক্ষমতা ভারতীয়দের কাছে হস্তান্তর করতে বেশ ইতস্ততঃ করছিলেন। অপরদিকে ভারতের বৃহত্তম দল কংগ্রেসের ক্ষমতার চাবিকাঠি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির হাতে নয়, অলিখিতভাবে সম্পূর্ণ ক্ষমতা সমর্পন করা হয়েছে কংগ্রেসের বাপুজি গান্ধীজীর হাতে। তিনি বিশ্বাস করেন অহিংস নীতিতে। ভারতের স্বাধীনতার চেয়ে অহিংস নীতির উপর অটল থাকা তার কাছে বেশী মূল্যবান। তিনি ভেবেছিলেন অহিংস নীতিতেই একদিন ভারত স্বাধীন হবে। এবং ভারতবাসীরা চিরদিন তার অহিংস নীতি আঁকড়ে থাকবেন। তখন কি তিনি মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পেরেছিলেন যে তার অহিংসনীতি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আইন ও শৃংখলা রক্ষার্থে একেবারে

(সমূলেই) অবাস্তব। তার দেশবাসী হিংসায় হানাহানি করবে, তার নিজের প্রাণ হারাতে হবে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত-আহত, সম্পদহীন, বাস্তহারা, শরণার্থী করবে। তার প্রিয় দিল্লীর কংগ্রেস গভর্নমেন্ট কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যুদ্ধ করার জন্য অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র বিদেশ থেকে আমদানী করবে। এবং ব্যয়বহুল এটম বোমা তৈরি করবে। যদিও ভারতে লক্ষ লক্ষ লোক বস্ত্রহীন, সম্বলহীন, রোগে শোকে অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। গান্ধীজীর এই অবাস্তব বিশ্বাস ও চিন্তাধারা সম্পর্কে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর লেখা বই 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রীডমে' (৩৫ পৃঃ) লিখেছেন :

"When Gandhiji Told Lord Lin Lithgo that the British people should give up arms and oppose Hitlar with spiritual force, Lord Lin Lithgo was taken aback by what he regarded an extraordinary suggession. It was normally his practice to ring the bell for A. D. C to come and take Gandhiji to car. On this occassion he was so surprised that he neither rang the bells nor said goodby. The result was that Gandhiji walked away from a silent and bewildered Vice Roy and had to find his way out to his Car all by himself. Gandhiji repeated this incident to me with his Characteristic humour".

ভাবার্থঃ যখন গান্ধীজী লিনলিথগোকে বললেন যে বৃটিশ জনতার অস্ত্র ত্যাগ করা উচিত এবং আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা হিটলারকে বাধা দেয়া উচিত। এই অস্বাভাবিক পরামর্শে লিনলিথগো এতই বিস্মিত হয়েছিলেন যে, তিনি স্বাভাবিক নিয়মে ঘন্টা বাজিয়ে একজন এ. ডি. সিকে আনিয়ে গান্ধীজীকে তার গাড়িতে পৌছে দিতে হত কিন্তু এই সময় তিনি এতই বিস্মিত হয়ে ছিলেন যে তিনি এ. ডি. সিকে বিরুক্ত করলেন না বা গান্ধীজীকে বিদায় সম্ভাষণও জানালেন না। ফলে গান্ধীজীকে একাই তার গাড়ি পর্যন্ত হেঁটে যেতে হল।

গান্ধীজী তার স্বাভাবিক রসিকতার সাথে আমার কাছে এ ঘটনাটির পুনরুল্লেখ করলেন।'

গান্ধীজীর এই রাজনৈতিক অহিংসা ভ্রান্ত দর্শন তার জীবদ্দশায় ও তার দেশবাসী গ্রহণ করেনি, এখনও করছে না আর ভবিষ্যতেও করবে না বলেই মনে হয়েছে। সারা ভারতে মারামারি, কাটাকাটি, খুনখারাবি ও যত হিংসার রাজনীতি দেখে ত তাই মনে হয়।

লাহোর প্রস্তাব ১৯৪০

১৯৩৭ সনের সাধারণ নির্বাচনের পর কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলোতে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়ের লাগাতার অত্যাচার, উৎপীড়ন-লুণ্ঠন, নারী-ধর্ষন, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি চলতেই থাকে। সরকারী কংগ্রেস দল, আইন শৃংখলা রক্ষক পুলিশ বাহিনী কখনও নির্বাক দর্শকের মত, কখনও বা সক্রিয় সহযোগিতায় এই সব জুলুম অত্যাচারের সংঘটিত হয়। মুসলমানেরা তার প্রতিবাদ করে সরকারের নিকট সাহায্য চাইলে কংগ্রেস সরকার উল্টো মুসলমানদেরই এইসব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য দায়ী করে শাস্তি দেয়। এমনও দেখা গেছে যদি কোন ন্যায় বিচারক হিন্দু মুসলমান দাঙ্গায় হিন্দুদের সাজা দিয়েছে তা হলে কংগ্রেস সরকার ঐ সকল ন্যায় বিচারকের হয় ট্রান্সফার করেছে, নয় অন্য কোন প্রকারে সাজা দিয়েছে। কংগ্রেস সরকারের নিকট মুসলমানেরা ন্যায় বিচার পাওয়ার জান-মাল-ইজ্জত নিয়ে কংগ্রেস শাসিত সংখ্যাগরীষ্ঠ হিন্দু প্রদেশে বাস করা দুরুহ হয়ে দাঁড়াল।

এই পটভূমি ও পরিস্থিতিতে ১৯৪০ সালে লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভা বসে। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ সভায় সভাপতিত্ব করেন। অবিভক্ত ভারতের বহু গণ্য মান্য মুসলিম নেতাসহ অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ. কে ফজুলল হক এই সভায় যোগদান করেন। ১৯৪০ সালের ২২ শে ও ২৩ শে মার্চ ভারতের রাজনীতি ও মুসলমানদের দুর্দশা পর্যালোচনা করে মুসলমানদের জন্য দুটি স্বতন্ত্র আবাস ভূমির দাবীর প্রস্তাব পাশ করে। মূল প্রস্তাবটি শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হক উপস্থাপনা করেন এবং ইউনাইটেড প্রভিন্সের নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামানের সমর্থনে সর্বসম্মতি ক্রমে প্রস্তাবটি পাশ হয়। প্রস্তাবটি নিম্নরূপ ....

That it is the Considered view of this session of the All India Muslim League that no constitutional plan would be workable to the Muslims unless it is designed on the following principles, viz, that Geographically Continuous units, are demarcated in the regions, which be so Constituted with such territorial readjustment as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the North-western and Eastern Zones of India, should be grouped to constitute independent states in which the constituent

units shall be autonomous and soverign:

That the adequate, effective, and mandatory safeguard should be specifically provided in the costitution for the minorities in the units and the regions for protection of their religious, cultural, economical, political, administrative and of the rights and interests in consultation with them and in other parts of India where Muslims are in minority, adequate effective and mandatory safeguards should be specifically provided in Consultation with them and other minorities for the protection of their religious, cultural, economical, political and administrative and other rights and interests in Consultation with them.

That the session further authorises the working Committee to frame a scheme of Constitution, in accordance with this basic principles provided for the assumption finally by the respective regions of all powers such as defence, external affairs and such other matters as may be necessary.

মোটামুটি বঙ্গানুবাদ –

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশনের সুবিবেচিত অভিমত এই যে, এই দেশে কোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাই কার্যকর হতে পারবে না কিংবা মুসলমানের নিকট তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না যদি না তা অতঃপর বর্ণিত মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে পরিকল্পিত হয়। যথা ভৌগোলিক নৈকট্য সম্বলিত ইউনিটগুলি প্রয়োজনবোধে স্থানীয় রদবদল পূর্বক সীমানা চিহ্নিত করে অঞ্চল গঠন করতে হবে। এবং মুসলমান সংখ্যাগরীষ্ঠ অঞ্চল, যেমন ভারতের উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল সমন্বয় অবশ্যই স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠন করতে হবে। যেখানে অন্তর্ভূক্ত ইউনিটগুলি স্বায়ত্ব শাসিত ও সার্বভৌম হবে।

ইউনিট ও অঞ্চলগুলিতে সংখ্যালঘুদের সাথে পরামর্শ করে তাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্ত সংবিধানে পর্যাপ্ত কার্যকর ও বাধ্যতামূলক নিরাপত্তার সুনিশ্চিত বিধান সংযোজন করতে হবে। এবং ভারতে যে সকল অঞ্চলে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রয়েছে তাদের সাথে পরামর্শ করে, তাদের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সংবিধানে পর্যাপ্ত কার্যকর ও বাধ্যতামূলক নিরাপত্তার সুনিশ্চিত

বিধান সংযোজন করতে হবে।

অত্র অধিবেশনে ওয়ার্কিং কমিটিকে অনুরূপ অঞ্চলগুলির যাবতীয় ক্ষমতা যেমন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, বৈদেশিক বিষয়, যোগাযোগ, শুল্ক এবং প্রয়োজন মত অন্যান্য বিষয়ের উপর চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রদানের উদ্দেশ্য উল্লিখিত মূলনীতিগুলির ভিত্তিতে সাংবিধানিক পরিকল্পনা মনোনয়নের আরো ক্ষমতা দিচ্ছে।

এই প্রস্তাবই ভবিষ্যতে পাকিস্তান প্রস্তাব নামে খ্যাত হয়েছিল। কায়েদে আজম বলতেন, 'নেতৃত্ব পাবার জন্য প্রথমে পুলিশের লাঠি বর্ষনের সম্মুখে ছাগলের মত বসে থাকা, তারপর জেলে যাওয়া, এবং তারপরে অভিযোগ করা যে, ওজন হ্রাস পাচ্ছে এবং সেই অজুহাতে কায়দা করে কারামুক্ত হওয়া–আমি এই জাতীয় সংগ্রামে বিশ্বাসী নই। তবে কষ্ট বরণ করার সময় যখন আসবে তখন সর্বাগ্রে আমিই বুলেটের আঘাতবরণ করে নেব। করলেনও তাই, তিনিও তার মুসলিম লীগ তার অগাধ রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় পরিচালিত হয়ে কখনও ছাগলের মত পুলিশের মার না খেয়ে, কখনও জেলে না গিয়ে, শুধু কূটবুদ্ধির বলে পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েম করে দুনিয়ার বুকে নজীর বিহীন দৃষ্টান্ত রাখলেন। যদিও এই পাকিস্তান তিনি যত বড় চেয়েছিলেন ততখানি পাননি তবে তার লাভ ইংরেজ জাতি মুসলমানের কাছ থেকে ভারতের মুসলিম সাম্রাজ্য যুদ্ধ করে ছিনিয়ে নিয়েছিল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ শুধু বাক যুদ্ধ করে একটি মুসলিম সাম্রাজ্য পাকিস্তান কায়েম করলেন। এই নজীর বিহীন কৃতিত্ব আর কোন দেশের কোন নেতার ভাগ্যে আছে কিনা জানা নেই।

যদিও ভারত বিভাজন হয়েছে তবুও হিন্দু কংগ্রেসের বিরাট লাভ হলো এই যে, এত বড় বিশাল ভারতবর্ষ উত্তর পূর্ব সীমানার আসাম, মনিপুর, মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, কখনও কোন হিন্দু বা মুসলিম আমলে ভারত ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে ছিল না যা ইংরেজের বদৌলতে তারা তৈরী দিল্লীর লাড্ডু বা মোয়ার মত সহজেই পেয়ে গেলো। তারপর দাক্ষিণাত্যের দেশগুলি সম্পূর্ণ কখনও উত্তর ভারতের সাথে একক রাষ্ট্র ছিল না। পাকিস্তান বাদেও যে বিশাল ভারতবর্ষ ইংরেজের নিকট থেকে কংগ্রেস উপহারের মত পেয়ে গেল সেই খুশীতেই বোধহয় গান্ধী-নেহরু-প্যাটেল প্রমুখ হিন্দু নেতৃবৃন্দ মহানন্দে ভারত ও বঙ্গ মাতাকে দ্বিখণ্ডিত করে মনের আনন্দে পাকিস্তান হিন্দুস্তান পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল বলে আমি মনে করি। বৃটিশের নিকট তারা যে বিশাল ভারতবর্ষ উপহার পেল। এত বড় ভারতবর্ষ কোনদিন কোন হিন্দু একক রাজা কখনও দখল করতে পারবে বলে কল্পনাও করতে পারেনি। হিন্দু মন মানসিকতার এই নিগূঢ় তত্ত্ব আমরা অনেকেই হয়ত জানিনা। বা বুঝতে পারি না। না বুঝেই ভারত বিভক্ত

করার দায়িত্ব অহেতুক মুসলিম লীগ ও জিন্নার ঘাড়ে অতীতে দিয়ে আস্‌ছি। কিন্তু অতীব সুখের বিষয় ভারতের ইতিহাস আজকে সত্য ঘটনা উৎঘাটিত করেছে। ভারতীয় বহু হিন্দু লেখক, গবেষক ও ইতিহাসবিদগণ ভারত বিভাজনের দায় দায়িত্ব সম্পূর্ণ গান্ধী, নেহেরু, প্যাটেল প্রমুখ কংগ্রেস নেতাদের উপরই অর্পণ করেছেন।

হিন্দু কংগ্রেস বলা হচ্ছে এ কারণে, যে কারণে বহু মুসলিম, শিখ ও খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী লোকের জন্ম ভারত ভূমিতে হওয়া সত্ত্বেও ভারতকে হিন্দুস্থান বলা হয়। ইসরাইলের বহু মুসলিম ও খ্রীষ্টান হাজার বছর ধরে বসবাস করলেও ১৯৪৮ সন থেকে ওটাকে ইহুদি রাষ্ট বলা হয়। সকল আরব দেশেই কম বেশী খ্রীষ্টান ও ইহুদী বাস করে তবুও আরব দেশকে মুসলিম রাষ্ট্র বলা হয়। সে অর্থেই ভারতীয় কংগ্রেস পার্টিকে হিন্দু কংগ্রেস পার্টি বলা যেতে পারে। যদিও কংগ্রেস পার্টিতে নগন্য সংখ্যক মুসলমান, শিখ ও খ্রীষ্টান সদস্য আছে।।

নেতাজী সুভাষ বসুর
উত্থান পতন

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর সুনাম, সুখ্যাতি, কর্মদক্ষতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দানের উপযুক্ততা অবিভক্ত বাংলার সীমা ছাড়িয়ে যায় ১৯৩৮ সনে। তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করলেন। সাংগঠনিক ব্যাপারই হোক, কি হিন্দু মুসলমান মিলনের চেষ্টাই হোক, বা বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করার ব্যাপারই হোক, তিনি সর্বক্ষেত্রে কংগ্রেসে এক নতুন জীবন দান করলেন। যার জন্য কংগ্রেসের ছাত্রই বলুন বা যুব সমাজই বলুন বা ভারতের সকল প্রদেশের কংগ্রেস কর্মীই হোক তিনি তাদের অধিকাংশের মন জয় করতে পারলেন। কিন্তু তিনি উষ্মার কারণ হয়ে দাড়ালেন গান্ধী ও কট্টর গান্ধী পন্থীদের। যেমন বিহারের রাজেন্দ্র প্রসাদ, বম্বের বল্লভ ভাই প্যাটেল সিতারামিয়া প্রভৃতি কয়েকজন নেতার। তারা মন্ত্রমুগ্ধের মত কংগ্রেসকে গান্ধীজীর অহিংস নীতির উপর ধরে রাখতেন। কখনো বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম মুখর করতে চাইতেন না। গান্ধীজীর অহিংস নীতি আজ ভারতবর্ষে যখন অবাস্তব প্রমাণ হলো তা তখনও অবাস্তব ছিল। গান্ধী ও গান্ধীপন্থীদের ঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পেরেছিলেন সুভাষ বসু ও তার অনুগামীরা। গান্ধী জিন্নাহ নেহেরু প্রমুখের মত বিলেতের পাশ করা ব্যারিষ্টার। গান্ধীজী ব্যারিষ্টারী পাশ করে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকাতে যখন ব্যারিষ্টারী ও রাজনীতি করেন তখন তিনি ব্যারিষ্টারের মত এবং

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস

ডান দিক থেকে গান্ধীজী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সরদার প্যাটেল খান আব্দুল গাফ্ফার খান (ফ্রন্টিয়ার গান্ধী) ও জহরলাল নেহেরু

তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী মরহুম লিয়াকত আলী খান, গ্রন্থাকার ও ঢাকা ইউ. ও. টি. সি'র অফিসার বৃন্দ (১৯৫০)

ভারতীয় সুসভ্য রাজনীতিবিদ বা ভদ্র জনসাধারণের মত স্যুটকোট ও ভারতীয় জাতীয় পোশাক পরিধান করতেন। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে যখন সরকার কর্তৃক বহিস্কৃত হলেন তখন ভারতে আসার পথে তার বোধ হয় একটা বুদ্ধির উদয় হলো যে হিন্দু সমাজে সাধু সন্ন্যাসির মত আচার ব্যবহার ও বেশ ভূষা ধারণ করলে বোধহয় তাড়াতাড়ি ভারতবাসির মন জয় করতে পারা যাবে। তাই তিনি আর সকল কংগ্রেস নেতাদের মত সামাজিক পোশাক আশাক বাদ দিয়ে হাটুর উপর অর্ধ উলঙ্গের মত করে নেংটি পরতেন, খালি গায়ে থাকতেন কখনও কখনও কপালে বুকে, পেটে, মাটি বা চন্দনের লেপ দিতেন। এহেন অর্ধ উলঙ্গ পোশাক ভারতের হিন্দু মুসলমান কোন নেতাই পরতেন না। কিন্তু তাতে কি আসে যায়! গান্ধী এই সাধু সন্ন্যাসির পোশাক পরে যেখানে সেখানে যেতেন, মিটিংয়ে মিছিলে যোগ দিতেন। এ ভাবে তিনি জন সাধারণের মন জয় করলেন। তাই হিন্দু জনগণের নিকট তিনি বাপুজি বা মহাত্মাজী উপাধি পেলেন।

এখানে একটি কথা মনে পড়ে ঃ একবার গান্ধীজী জিন্নার সাথে বম্বে মালাবার হিলে তার বাসায় কোন একসময় সাক্ষাতের সময়সূচী করলেন, জিন্নাহ সেই সময় মত তার বাড়ির দরজায় তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ দাঁড়াবার পরও যখন গান্ধীজীর আগমনের কোন সাড়াশব্দ পেলেন না তখন জিন্নাহ নিজের কামরায় গিয়ে কাজে মনোযোগ দিলেন। তার বেশ কতক্ষণ পর গান্ধীজী স্বশরীরে জিন্নাহর কক্ষে বাহির হলেন এবং অনুযোগের সুরে বললেন যে নিছক ভদ্রতার খাতিরেও আপনি আমাকে সদর দরজায় অভ্যর্থনা জানাতে ভুলে গেলেন? জিন্নাহ অভিজ্ঞ আইনজ্ঞের মত জবাব দিলেন যে, আপনি ঠিক সময় মত আসতে পারেননি। সময়সূচি রক্ষা করতে না পারার জন্য ভদ্রোচিত অভ্যর্থনাও আপনাআপনি বাতিল হয়ে গেছে। তারপর জিন্নাহ তার কপালে বুকে পিঠের দিকে আঙ্গুলে নির্দেশ করে বললেন যে এইসব মাটি ও চন্দনের লেপ গায়ে দিয়ে ঘরে থাকা যায়। বাইরে কোন ভদ্রলোকের সাথে এ অবস্থায় দেখা করা সমাচীন মনে হয়না। এটা যে একটি অভদ্রতা তা হয়ত আপনি ভুলে গেছেন। যা হোক দু'জনার এই হাসি ঠাট্টার কথা পাঠকরা একটু উপভোগ করবেন বলেই উল্লেখ করলাম।

এবার সুভাষ বসুর উথান পতনের কথায় ফেরা যাক। ভারতীয় কংগ্রেসের বাইরে ও ভিতরে তার অগনিত শুভানুধ্যায়ীর অনুরোধে এবং কংগ্রেসকে সত্যিকার অর্থে স্বাধীনতা আন্দোলনে সংগ্রামমুখী করতে নেতাজী সুভাষ বসু দ্বিতীয় বারের মত (১৯৩৯) কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে দাঁড়াবার মনস্থির করলেন। কিন্তু গান্ধীপন্থীরা সুভাষ বসুকে দ্বিতীয় বারের মত সভাপতি করতে মোটেই রাজী ছিলেন না। গান্ধীজী দাঁড় করলেন তার প্রতিনিধি হিসেবে পট্টভী সিতারামিয়াকে কিন্তু নেতাজী সুভাষ বসুর সমর্থকরাও নাছোড়বান্দা। তারা সুভাষ বসুকে দাঁড় করালেন এবং শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগরীষ্ঠ ভোটে তিনি কংগ্রেসের

সভাপতি নির্বাচিত হলেন। গান্ধীজী প্রকাশ্যে মন্তব্য করলেন– 'সিতারামিয়ার পরাজয় আমার পরাজয়।'

আগেই বলেছি যে যদিও গান্ধীজী কংগ্রেসের চার আনার সভ্য নন কিন্তু অলক্ষ্যে কংগ্রেস পরিচালনার সমস্ত কলকাঠি তারই হাতে। এই অবাস্তব পরিস্থিতিতে যা হবার তাই হল। গান্ধীজী ও তার কংগ্রেসের অবাঙ্গালী ভক্তদের অসহযোগিতার জন্য সুভাষ বসু কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করতে পারলেন না। অগত্যা তিনি বাধ্য হলেন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পদ থেকে পদত্যাগ করতে। তখন ইংরেজরা ব্যঙ্গ করে বলতেন যে কংগ্রেস তখন বৃটিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার লড়াই না করে কংগ্রেসের ভিতরেই অসহযোগ চালাচ্ছেন এবং অসহযোগের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করছেন।

সুভাষ বসু যখন বুঝতে পারলেন যে, এই সংগ্রাম বিমুখ এবং গান্ধী প্রভাবান্বিত কংগ্রেস নেতৃত্ব দ্বারা ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব নয় তখন তিনি অতি গোপনে যুদ্ধ রত জার্মানীতে চলে গেলেন। ১৯৪১ সনে আকবর শাহ নামক এক পাঠান বন্ধুর সাহায্যে তিনি কলিকাতা থেকে দিল্লী পেশোয়ার হয়ে পাঠান মুল্লুক দিয়ে পায়ে হেঁটে দুর্গম গিরি অতিক্রম করে কাবুলে পৌছুলেন। কাবুলে তিনি জার্মান রাষ্ট্রদূতের সাহায্যে বার্লিনে হিটলারের কাছে পৌছুলেন। সেখানে তিনি প্রবাসী ভারতীয়দের দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করলেন। তা ছাড়া বার্লিনে আজাদ হিন্দ ফৌজ রেডিও স্থাপন করে সকল প্রকার সন্দেহের অবসান করে তিনি ভারতবাসীর নিকট ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন।

তারপর জাপান যখন ভারতের দোর গোড়ায় উপস্থিত তখন নেতাজী হিটলারের পরামর্শে জাপানে এলেন। এখানে জাপান সরকারের সাথে সম্মানিত সন্ধি করে ভারতীয় যুদ্ধ বন্দীদের বিপুল সংখ্যক লোক নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ (আই-এন-এ) গঠন করলেন। এতে হিন্দু মুসলমান ছাড়া শিখ বন্দীরাও ছিলেন। তিনি নিজে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হলেন। তিনি এই আজাদ হিন্দ ফৌজকে দিয়ে জাপানী সামরিক বাহিনীকে সংগ্রাম বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করে ভারতের সীমান্তের অভ্যন্তরে আসামের কোহিমাও ইম্ফল পর্যন্ত আর এদিকে মধ্য বার্মা দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের সড়ক হয়ে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কের নিকটতম অঞ্চল ঈদ গাঁ প্রভৃতি এলাকায় হানা দিতে শুরু করলেন।

তিনি ইতিমধ্যে বার্মাতে ভারতীয় প্রবাসী সরকার গঠন করে তার রাষ্ট্র প্রধান হলেন। আর সামরিক বাহিনীর সর্বাধিকনায়ক হিসেবে নেতাজী উপাধি গ্রহণ করলেন। জাপানী সরকারের সাথে পূর্ব স্বীকৃত মতে ভারতে অধিকৃত অঞ্চল এই প্রবাসী সরকারের মাধ্যমে নেতাজী শাসন করতেন। তিনি চিঠি লিখে অতিগোপনে

কংগ্রেস নেতা মিঃ গান্ধী, নেহেরু, আবুল কালাম আজাদ প্রমুখকে অনুরোধ জানিয়ে দিলেন যে ভারতের উত্তর পূর্ব ও পুর্বাঞ্চলে যখন স্বাধীন প্রবাসী সরকার কায়েম হয়েই গেছে তখন ভারতীয় নেতারা যেন যথাশীঘ্র বৃটিশের হাত থেকে ভারতের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে, বিদ্রোহ করে। এ ঘটনা ঘটে ১৯৪৩ সনে। তখন কেউ বলতে পারত না যে, ভবিষ্যতে ১৯৪৭ সনে ভারত স্বাধীন হবে। কিন্তু এই যে ১৯৪৩ সনে সুভাষ বসু ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের সুযোগ ভারতের অভ্যন্তরে এনে দিলেন কিন্তু সেই সুযোগ গান্ধী ও গান্ধী পন্থী অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত পণ্ডিত নেহেরু, রাজেন্দ্র প্রসাদ বল্লভ ভাই প্যাটেল প্রমুখ গ্রহণ না করে যাও আন্দোলন ছিল তাও স্তিমিত করে ফেললেন।

এটা কি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা নয়? তারা কি সেই ১৯৪৩ সনে জানতেন বা জ্যোতিষীর মত বলতে পারতেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্র শক্তি জিতবে জাপান হারবে? ভারতে আজাদ হীন্দ ফৌজের অফিসারদের বিচার হবে তা নিয়ে আর্মি, নেভী ও এয়ার ফোর্সে বিদ্রোহ হবে? বন্দী আজাদ হিন্দ ফৌজের সকলের মুক্তি চাইতে ভারতের সুবিশাল সামরিক বাহিনীও ভারতের স্বাধীনতা চেয়ে বসবে বিদ্রোহ করবে? এবং সে কারণেই ভারত স্বাধীন হবে? তা যদি কংগ্রেস নেতা গান্ধী নেহেরু প্যাটেল প্রমুখ না জানতেন তবে নেতাজী যথা সময় ভারতের মাটিতে আসাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বাধীন ভারতীয় সরকার কায়েম করছিলেন তখন তাদের সকলের কর্তব্য ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়া। বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ করা। কেন তা করা হলো না? সুভাষের না বাংগালী নেতৃত্বের প্রতি অবাঙ্গালীর ভয় বা হিংসা– না বৃটিশের দালালী?

আগেই বলেছি যে গান্ধীপন্থীরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে আসুক এটা তারা চায়না। কারণ কল্পনা বিলাসী, অযোক্তিক গান্ধীপন্থীরা ভারতের স্বাধীনতার চেয়েও বেশি মূল্যবান মনে করেন অহিংসা নীতিকে। অবশ্য আজকে ভারতীয়রা মোটেই গান্ধীর অহিংসা নীতিতে বিশ্বাস করেনা। সারা ভারতে ও কাশ্মীরে মুসলমানের প্রতি, নিচু জাতের হিন্দুদের প্রতি পাঞ্জাবী শিখদের প্রতি সহিংস হানাহানি চলছে। এই প্রসঙ্গে ডঃ সতীশচন্দ্র মাইকার লিখিত বহ্নিমান নেতাজী সুভাষ বইয়ের (মুদ্রণ প্রকাশক ধীরেন রায় গঙ্গানগর উত্তর ২৪ পরগনা পশ্চিম বঙ্গ) পৃঃ ৮৪তে লিখেছেন মহাযুদ্ধকে উপলক্ষ করিয়া মহাত্মাজী বলিয়াছেন, ভারতের স্বাধীনতার কথা আমি এই মুহূর্তে ভাবিতেছিনা। স্বাধীনতা তো একদিন আসবেই কিন্তু ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের পতনের পথে যদি ভারতের স্বাধীনতা আসে তবে সেই স্বাধীনতার মূল্য কি?–– এই হল গান্ধীর মনের কথা। আর অগ্নি পুরুষ সুভাষের কাছে ভারতের স্বাধীনতা সর্বাগ্রে। আপনারা এখানে বিবেচনা করে দেখুন ভারতের স্বাধীনতার বহ্নি শিখা কি ভাবে সুভাষের অন্তরে জ্বলেছিল। গান্ধীজীর

মনেও কি তদ্রুপ জ্বলেছিল না বৃটিশ ও ফ্রান্স সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের কথাই বেশি প্রকট ছিল। এই বইয়ের ৯০ পৃষ্ঠায় লেখক লিখেছেন কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল তার তিনদিন পরে। অর্থাৎ ৬ই সেপ্টেম্বর গান্ধীজী বড়লাট লর্ড লিন-লিথ-গোর সঙ্গে সাক্ষাত করে এক ষ্টেটমেন্ট বার করলেন যাতে বলা হলো বৃটেনের সঙ্গে ভারতের স্বরাজ লাভের বিষয়ে মত পার্থক্য হলেও বৃটেনের এ বিপদের সময় ভারতের সাহায্য সহযোগিতা করা উচিত।

১৯২৭ সাল থেকে কংগ্রেসের নেতৃবর্গ দেশবাসীর কানে কানে মনে মনে এই বুঝিয়ে এসেছেন যে, পরের যে কোন যুদ্ধই হবে ভারতের পক্ষে তার স্বাধীনতা লাভের একমাত্র সুযোগ– আর কি না সেই কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসভার সর্বোচ্চ নেতা গান্ধীজী বড় লাটের সঙ্গে দেখা করে সংবাদ পত্রে ঘোষণা করলেন– ইংরেজের বিপদের দিনে ভারতবাসীর সাহায্য করা উচিত। এ ঘোষণা সমগ্র দেশের বুকে বজ্রশেলের আঘাতের মতো বাজল। যদিও এ যুগের ভাষায় গান্ধীজীর এসব বিবৃতি ও কর্মকাণ্ড দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পলাশী যুদ্ধে মীর জাফরের চেয়েও অধিক বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তবুও বলতে হবে ১৮৮৫ সনের ইংরেজ আই-সি-এস মিঃ হিউমের দ্বারা এবং আরও কয়েকজন ইংরেজ রাজপুরুষের সহযোগিতায় ভারতে ইংরেজ শাসন পাকা পোক্ত ও দীর্ঘায়িত করার জন্য যেই ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই কংগ্রেস ইংরেজ জাতির দুর্দিনে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতবাসীর সাহায্য সহানুভূতি ও সহযোগিতা করে থাকেন তবে তা কংগ্রেসের বা গান্ধীজীর দোষ দেয়া যায় কি করে? কংগ্রেসের জন্মই তো হয়েছিল ঐ উদ্দেশ্যে বৃটিশের দালালী করার জন্য। কিন্তু এশিয়ার অগ্নিপুরুষ ভারতের সর্বকালের সর্ব শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু চেয়েছিলেন ভারতের স্বাধীনতা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা যুদ্ধ করে হোক বা যে ভাবেই হোক। তাঁর নিকট ভারতের স্বাধীনতার সূর্যোদয় একান্ত কাম্য ছিল। যার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজের বহু সৈন্য সামন্ত ও সমর নায়ক এবং মহারাণী ঝাসি ব্রিগেডের বহু নারী সৈনিক নেতাজী সুভাষ বসুর নেতৃত্বে অকাতরে প্রাণ দিয়ে এক সাগর রক্ত দিয়ে গেছেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের ঐ সব শহীদ বীর সেনানী যুগ যুগ ধরে অবিভক্ত ভারতবাসীর অন্তরাকাশে অসংখ্য নক্ষত্রের মতো চিরদিন জ্বলতে থাকবে। তাঁদেরকে আমার সংগ্রামী সালাম।

মহাচীন ও ভারতের স্বাধীনতা

মহাচীনের মহান নায়ক জেনারেল চিয়াং কাইশেক সব সময়ই ভারতের স্বাধীনতার জন্য শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করতেন, এবং ইউরোপ যুদ্ধের সময়ও তিনি বৃটিশ গভর্নমেন্টকে এই যুদ্ধে ভারতীয় জনগণের পূর্ণ সহযোগিতার বিনিময়ে

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের লক্ষ্যে কিছু কিছু ছাড় দেয়ার জন্য উপদেশ দিতেন। কিন্তু জাপানীরা যখন পার্ল হারবার ও মহাচীন আক্রমণ করে বসল এবং ইন্দোচীন, মালয়া, ও বার্মা দখল করে ভারতের সীমান্তে আঘাত হানল তখন ভারতীয় সহযোগিতার জন্য জেনারেল চিয়াং কাইশেক ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে একটি সমঝোতায় পৌছার জন্য বৃটিশ সরকারের উপর জোর চাপ সৃষ্টি করলেন তখন বাধ্য হয়ে বৃটিশ গভর্নমেন্ট জেনারেল চিয়াং কাইশেককে ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে একটু নমনীয় করার লক্ষ্যে ভারতবর্ষে সৌজন্য সফরের জন্য অনুরোধ ও আমন্ত্রণ করলেন। চিয়াং কাইশেক এই আমন্ত্রণ রক্ষা কল্পে ১৯৪২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লী আগমন করেন। তিনি কলিকাতা শহরসহ ভারতের আরো কয়েকটি বিশিষ্ট শহর ভ্রমণ করেন। তিনি ভারতীয় নেতাদের বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, এই যুদ্ধ জয়ের দায় দায়িত্ব অন্যান্য মিত্রপক্ষের মত বৃটিশেরও। তখন এই যুদ্ধ চলাকালীন সময় বৃটিশের পক্ষে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দেয়া সম্ভব নয়। তারা এখন ঘোষণা দিতে পারে যে, যুদ্ধ জয়ের পরে ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হবে। এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় নেতাদের উচিত হবে অক্ষশক্তিকে রোখবার জন্য বৃটিশ সরকারের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করা।

জেনারেল চিয়াং কাইশেকের এই উপদেশ ভারতের নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করতে পারলেন না। যদিও চিয়াং কাইশেক ও ম্যাডাম চিয়াং কাইশেককে ভারতবাসীরা বিশেষ করে কলিকাতার বাঙ্গালীরা প্রাণ ঢালা সাদর সম্ভাষণ দিয়েছিলেন। খবরের কাগজের বুকে, মিছিলে, অসংখ্য প্লাকার্ড ও ফেষ্টুনে লেখা হয়েছিল "চীন ও ভারতবাসী ভাই ভাই। মহাচীনের এই মহান নেতা ও নেত্রীর ভারত আগমন যুদ্ধের কোন উপকার আসুক বা না আসুক, মহাচীনের সাথে ভারতবর্ষ বিশেষ করে অবিভক্ত বাংলাদেশের সাথে মহাচীনের গভীর বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো।'

কিন্তু ১৯৬২ সনে যখন মহাচীনের সামরিক বাহিনী দ্বিখণ্ডিত স্বাধীন ভারতবর্ষের উত্তর পূর্ব সীমান্ত দিয়ে প্রায় ৪০ মাইলের মত ভারতের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে, বহু ভারতীয় সৈন্য ও সেনা নায়ককে অস্ত্রপাতি, এমুনেশন যানবাহন ও খাদ্যদ্রব্যসহ চীনে বন্দী করে নিয়ে যায়, তখন থেকে ভারতের সাথে মহাচীনের বন্ধত্ব সম্পূর্ণ ভেঙ্গে যায়। মহাচীনের সাথে ভারতের যে, "ভাই ভাই" সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা তখন থেকে ('বাই বাই") bye-bye-তে পরিণত হয়। চীনা বাদামকে গোস্বায় ভারতীয়রা মেটো বা বড় বাদাম বলতে শুরু করে।

ক্রিপ্স মিশন

নেতাজী সুভাষ বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের সহযোগিতায় জাপানী আর্মি যখন ভারতের পূর্ব সীমান্তে আঘাত হানছে তখন আমেরিকা ও চায়না মিত্র

বাহিনীর দুই বিরাট অংশীদার বৃটিশ সরকারের উপর ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে ভারতীয় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা পাওয়ার লক্ষ্যে এক সমঝোতায় আসার জন্য বৃটিশ সরকারের উপর দারুণ চাপ সৃষ্টি করলেন। চীন ও আমেরিকা ভেবেছিল ভারতবাসীর সহযোগিতা ছাড়া অক্ষ শক্তির সাথে বিশেষ করে জাপানের সাথে যুদ্ধে পেরে উঠা খুবই দুরূহ হবে। তাই মুখ্য স্বার্থ হলো ভারতের সহযোগিতা যে প্রকারেই হোক আদায় করা। তাতে যদি বৃটিশ সরকারের ক্ষমতা কিছুটা ভারতবাসীর উপর অর্পন করা হয় তাও করা হোক। বৃটিশ সাম্রাজ্য তখন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়। তখনকার দিনে বৃটিশকেও একটি পরাশক্তি গণ্য করা হতো। তাই হয়ত আমেরিকার গৌন স্বার্থ ছিল ভারত স্বাধীন হলে পুরো বৃটিশ সাম্রাজ্যটাই এশিয়ায় দুর্বল হয়ে যাবে। এবং সেই স্থান সম্প্রসারণবাদী আমেরিকা দখল করে পরাশক্তি হওয়ার স্বপ্ন সফল করবে। মহাচীনের সাথে হিমালয়াঞ্চলে ভাগ বাটোয়ারা ও সীমান্ত রেখা নিয়ে বৃটিশের সাথে মহাচীনের ঝগড়া ছিল। উত্তরাধিকার সূত্রে সেই ঝগড়া আজও ভারত সরকারের উপর বর্তাল। তাছাড়া মহাচীন কেন কোন শক্তিধর রাষ্ট্র আর একটি শক্তিধর রাষ্টকে তার রাজ্যের সীমান্ত রেখার অপর পাড়ে থাকা তার পক্ষে নিরাপদ মনে করে না। তাই হয়ত মহাচীনেরও গৌন স্বার্থ ছিল যে, ভারতের স্বাধীনতা দিয়ে ভারত উপমহাদেশ থেকে বৃটিশ সরকার তার শক্তিধর সামরিক বাহিনী নিয়ে এই এলাকা থেকে চলে গেলে মহাচীনও একদিন পরাশক্তি হতে পারবে। তাই আমরা দেখতে পেলাম বৃটিশ সরকার খুবই উঁচু মানের বুদ্ধি সম্পন্ন। স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপ্সের নেতৃত্বে একটি ক্ষমতাধর মিশন যা ক্রিপ্স মিশন নামে পরিচিত তা ১৯৪২ সনে ভারতে পাঠালেন।

ক্রীপ্স মিশন ভারতে এলে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, জাতীয়তাবাদী মুসলিম লীগ কনভেনশন, আকালী দল, প্রকৃত পক্ষে ভারতের সকল উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের সাথে বেশ কয়েকবার বৈঠক করলেন। ভারতবাসীদিগের নিকট ক্রীপ্স মিশনের নিম্নলিখিত প্রস্তাব ছিল।

(ক) যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে পরেই (ক) ভারতের গঠনতন্ত্র তৈরী করাবার লক্ষ্যে একটি নির্বাচিত সংস্থা গঠন করা হবে।

(খ) ভারতীয় রাজ্যগুলিতেও যাতে গঠনতন্ত্র তৈরী সংস্থার মধ্যে শামিল করা যায় তার ব্যবস্থা থাকবে।

(গ) বৃটিশ গভর্নমেন্ট এই গঠনতন্ত্রকে মঞ্জুরী দিতে প্রস্তুত থাকবে। কিন্তু যদি বৃটিশ শাসিত প্রদেশগুলির কেহ এই গঠনতন্ত্র না চায় তাহলে আলাদা গঠনতন্ত্র তৈরী করে বৃটিশ শাসনাধীনে থাকবে।

(ঘ) উল্লেখিত ব্যবস্থায় ধর্মীয় ও সম্প্রদায়গত সংখ্যালঘুদের রক্ষাকরণের

ব্যবস্থা থাকবে।

(ঙ) এই গঠনতন্ত্র তৈরীর সংস্থা ভারতীয় প্রদেশগুলির ও রাজ্যগুলির আনুপাতিক হারে নেতৃদের সমন্বয়ে গঠিত হবে।

(চ) যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় ভারতের দেশ রক্ষা বিভাগের সমস্ত দায় দায়িত্ব বৃটিশ সরকারের হাতে থাকবে। কিন্তু দেশ রক্ষা সংগঠন মানুষের নৈতিক সহযোগিতা সামরিক বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় সকল মাল ও মানুষের সরবরাহ করার দায়িত্ব ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উপরে বর্তাবে।

ক্রীপ্স মিশনের এই প্রস্তাব নিয়ে দিল্লী ও সিমলাতে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে কয়েকবার বৈঠক হলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ক্রিপ্স মিশনের প্রস্তাব মেনে নিতে পারলেন না।

ভারত ছাড় আন্দোলন
'ভারত ছাড় ও ভাগ কর'

বৃটিশ ও ভারতীয় নেতৃবৃন্দের একে অন্যের প্রতি আস্থার অভাবে ক্রিপ্স মিশন অকৃতকার্য হলো বলে আমার মনে হয়। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ চেয়েছিলেন যে পূর্ণ স্বাধীনতা হয়তো যুদ্ধের পরে হবে কিন্তু দেশ রক্ষা বিভাগ সহ, ভাইসরয়ের কাউন্সিলের সকল ক্ষমতা এখনই ভারতীয়দের হাতে দিতে হবে।

আমার ধারণা, অপরদিকে বৃটিশ সরকার ভেবেছিলো যে ভারতীয় নেতারা এতদিন স্বাধীনতা আন্দোলন বিক্ষোভ ও গণ সমাবেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন দেশ শাসনের অভিজ্ঞতা তাদের মোটেই নাই। এর পরে দেশ রক্ষা বিভাগের মন্ত্রীসহ সিনিয়র আর্মি, নেভী ও এয়ার ফোর্স অফিসার প্রায় সবই তো বৃটিশ। এই বিশ্ব যুদ্ধ পরিচালনার সম্পূর্ণ দায় দায়িত্ব বৃটিশের তাই বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশ রক্ষা বিভাগ অনভিজ্ঞ ভারতবাসীদের হাতে ছেড়ে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। যদি ভারতবাসী যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী হতো তাহলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মত ছোট একটি প্রাইভেট কোম্পানীর গুটি কয়েক ইংরেজের নিকট যুদ্ধে এভাবে তারা পরাজিত ও পরাভূত হতো না। আর এখন তো বিশ্ব যুদ্ধ বহু বহু সৈন্য পরিচালনার দক্ষতা অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র ব্যবহারের ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভিজ্ঞতার প্রশ্ন রয়েছে।

তারপর ভারতীয় নেতৃবৃন্দ যেই কাজে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন সেই বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনেই নেমে পড়লেন। কংগ্রেসের শ্লোগান হল 'ভারত ছাড়, আমাদের স্বাধীনতা দাও তোমরা ভারত থেকে বিলেতে যাও' আন্দোলনকে

লোক মুখে উপাদেয় করার জন্য সাগর পাড়ে চলে যেতেন তার দলবলসহ নুন বানাতে বৃটিশ আইন অমান্য করতে। যেই শক্তিধর বৃটিশ সরকার অক্ষ শক্তির দুধর্ষ জার্মানী, ইতালী ও জাপানের সাথে যুদ্ধ করে চলেছে সে নাকি ভয় পাবে অহিংসা মতে দীক্ষিত শান্তি প্রিয় সুদূর সাগর পাড়ে নূন বানিয়ে বৃটিশ আইন অমান্যকারীদের।

অপরদিকে ভারতীয় মুসলিম লীগও পিছিয়ে নেই। তারাও তুখোর আন্দোলন তুলেছেন যে বৃটিশ সরকার মুসলিম মোঘল সরকারের কাছ হতে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে–তাই বৃটিশ ভারত থেকে চিরতরে চলে যাওয়ার আগে শাসন ভার মুসলমানদের প্রতিনিধি মুসলিম লীগের হাতে দেয়া তার নৈতিক দায়িত্ব। গণতন্ত্রের মতে যদি তা না পারা যায় তো অন্ততঃ মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশগুলি নিয়ে আর একটি রাষ্ট্র গঠন করে যার নাম হবে পাকিস্তান এভাবে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান গঠন করে ভারতকে দু'ভাগে ভাগ করে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের হাতে যথাক্রমে দু দেশের শাসন ক্ষমতা দিয়ে বৃটিশ সরকার ভারত থেকে চির বিদায় হোক। তাই মুসলিম লীগের শ্লোগান হলো "ভাগ কর ও ভারত ছাড়'।

জাপানের আত্মসমর্পণ

২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ সন সকাল সাড়ে দশ ঘটিকায় মার্কিন জাহাজ মিশরীতে মার্কিন সেনাপতি জেনারেল ম্যাক আর্থারের নিকট জাপানের বৈদেশিক মন্ত্রী সিগিমিৎস এবং সম্রাটের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি পিও ইয়েশিহিরো ওমেজু আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করেন। ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ সন সিঙ্গাপুর বৃটিশ বাহিনীর কাছে জাপানী ও ইণ্ডিয়ানরা আত্মসমর্পণ করল। তখন বহু জাপানী অফিসার ও সৈন্য আত্মসমর্পণ করে গ্লানিকর জীবন যাপন করার চেয়ে (হারিকিরি) আত্মহত্যা করা সমীচীন মনে করেছিল। এক গণ হারিকিরি অনুষ্ঠিত হল জাপানী সামরিক বাহিনীতে।

আবার সুভাষ বসুর অনির্দিষ্ট যাত্রা

জাপানীরা আত্ম সমর্পণের পূর্বে বৃটিশ ও আমেরিকান গোয়েন্দা পুলিশকে ধোকা দেয়ার জন্য সুভাষ বসুকে দূর প্রাচ্য থেকে অনির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যায়। কোথায় নিয়ে যায় তা আজও কেহ সঠিক বলতে পারে না। সুভাষ বসু এখনও বেঁচে আছেন কিনা তাহাও কেহ বলতে পারে না। ভারত স্বাধীনতার পরে ভারতীয় কংগ্রেস

সরকার তথাকথিত জাপানী এয়ারোপ্লেন এক্সিডেন্ট ও সুভাষ বসুর মৃত্যু প্রমাণ করতেই ব্যস্ত। তখনকার কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট জওহরলাল নেহেরু এবং তার মত আরও অনেক কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ চেয়েছিলেন আই-এন-এর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গসহ নেতাজী সুভাষ বসুর যুদ্ধাপরাধীর ন্যায় বিচার করতে। এই প্রসঙ্গে কলিকাতার বিখ্যাত আনন্দ বাজার পত্রিকার ২৯/৮/৪৫ এর একটি উদ্ধৃতি দেয়া গেল ঃ

'একজন মার্কিন সাংবাদিক পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রতি তার মনোভাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তিনি বলেন, বসুর প্রতি যুদ্ধাপরাধীর ন্যায় ব্যবহার করা উচিত। কারণ তার লোকজন বহু আমেরিকানকে নিহত করেছে–এবং তিনি ব্রহ্মদেশ ও মালয়ের বহু দরিদ্র ব্যক্তিদের নিকট হতে জবরদস্তি করে অর্থ আদায় করেছেন। উক্ত সাংবাদিক আরো বলেন, সুভাষ বসু সম্ভবতঃ মারা যান নাই। জীবিত অবস্থায় জাপানে আছেন। বৃটিশ ও আমেরিকান গোয়েন্দা পুলিশ এতদিন হন্যে হয়ে খুঁজছেন নেতাজী সুভাষ বসু কোথায় আছেন তাকে ধরে সর্বশ্রেষ্ঠ যুদ্ধাপরাধীর মত বিচার করতেই হবে সাজা দিতেই হবে। অপর দিকে জওহরলালের নেতৃত্বে ভারতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ চাইলেন যে, তাদের পথের কাঁটা চোখের বালি চিরতরে সরাবার জন্য নেতাজী সুভাষ বসু ও তার আই-এন-এ নেতৃবৃন্দের বিচার করতেই হবে উপযুক্ত সাজা দিতেই হবে। ভারতীয় কংগ্রেসের এই মনমানসিকতায় ইতিমধ্যে প্রায় ১০ হাজারের মত আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধবন্দী মহারাণী ঝাসি ব্রিগেডের তিনশত মহিলা যুদ্ধ বন্দীসহ দিল্লীর লালকেল্লা ও বিভিন্ন বন্দী শিবিরে বার্মা ও মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর থেকে আনয়ন করে বিচারের উদ্দেশে জড়ো করা হয়েছে।

আই-এন-এর বিচার

ফিল্ড মার্শাল অকিনলেক তখন ভারতের প্রধান সেনাপতি ও জঙ্গীলাট (দেশরক্ষা মন্ত্রী)। তার পরামর্শে একজন মুসলমান মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান একজন হিন্দু মেজর জেনারেল সায়গল আর একজন শিখ মেজর জেনারেল ধীলন এই তিনজনের বিচার সর্ব প্রথম হবে। তারপরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অবস্থা ভাল দেখলে বাকি সকলের দলে দলে বিচার হবে; কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর আল্লাহ করে আরেক। আই-এন-এর এই গোপন বিচারের কথা যে কোন প্রকারেই হোক ফাঁস হয়ে যায়। দেখতে দেখতে ভারতীয় আকাশে ভীষণ ঝড় ঝঞ্ঝা উঠল হাটে-ঘাটে-মাঠে সকলে বলাবলি করতে লাগল যে আই-এন-এর

বা আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রত্যেকটি সৈনিক আমাদের জাতীয় বীর, তাদের কোন অপরাধ নাই–তারা যদি যুদ্ধ বন্দীও থাকত তবুও তাদের জাপানী সেনাবাহিনীর হুকুম মতো রাস্তা ঘাট তৈরী করতে হতো। মিল কল ফ্যাক্টরীতে কাজ করতে হতো, শ্রমিকের মত জাপানী খাদ্য, এমুনেশন ইত্যাদি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বহন করে জাপানীদের যুদ্ধ জয় করতে সহায়তা করতে বাধ্য হত। আর যদি এই যুদ্ধে জাপানী জয় লাভ করত তা হলে জাপানী সামরিক বাহিনীই ভারতবর্ষ অধিকার করে শাসন করতো। তা না করে আজাদ হিন্দ ফৌজের সিদ্ধান্ত অনেক বেশী সঠিক ছিলো। তারা নিজেরাই ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে, যেটুকু ভারত ভূমি জয় করতে পেরেছে তারাই জয় করেছে এবং তারাই শাসন করেছে। জাপানীদের সেখানে নাক গলাতে দেয়া হয়নি। যদি আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতবর্ষ জয় করতে পারত তবে আমাদের ভারতবাসীই আমাদের শাসন করতো। প্রকৃত পক্ষে ভারত বহু আগেই স্বাধীন হতো। শহরে বন্দরে, গ্রামে–গঞ্জে, শিক্ষিত মহলে একই গুঞ্জন। হিন্দু মুসলমান, শিখ ও খৃষ্টান সবার কণ্ঠে এক দাবী আজাদী সৈনিকদের বিচার করা চলবে না। এটা আমরা সইব না। এ অন্যায় বিচার আমরা হতে দিব না। প্রয়োজন হয় আজাদ হিন্দ ফৌজকে বাঁচাতে গিয়ে আরেকটি যুদ্ধ করব।

ভারতবর্ষে এই আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারকে কেন্দ্র করে এক গণদাবী মাথা তুলে দাঁড়াল। যে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর লোকজন হয় মহাযুদ্ধে বৃটিশের পক্ষে জাপান ও আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে সেই সামরিক বাহিনীর লোকজনও বলে উঠল, 'আজাদ হিন্দ ফৌজ (আই-এন-এ) আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রপথিক তাদের কিছুতেই আমরা বিচার হতে দিব না। যে অস্ত্র দিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি সেই অস্ত্র ঘুরিয়ে ধরে বৃটিশ সৈন্য ও শাসকদের খতম করব। শুরু হলো এখানে সেখানে সেনা বিদ্রোহ। বৈমানিক ও নাবিক বিদ্রোহ আর ধর্মঘট। কলিকাতা, ভিসাগাপট্টম মাদ্রাজ, বম্বে করাচীতে নাবিক ধর্মঘট, জব্বলপুর, লাহোর, ও বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে সৈন্য বিদ্রোহ, চিরদিনের রাজভক্ত বলে পরিচিত গুর্খা রেজিমেন্ট পর্যন্ত বিদ্রোহীদের সাথে হাত মিলালো। খতম করল বহু বৃটিশ সৈন্য ও সেনা নায়ক বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলী, বড়লাট লর্ড ওয়াভেল, প্রধান সেনাপতি অকিনলেক, ভারতবর্ষের এই অনিবার্য বিষ্ফোরণ দেখে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর উপর আর নির্ভর করা সমীচীন হবে না বলে স্থির করলেন। যুগ যুগ ধরে প্রত্যেক দেশেরই নিয়ম বেসামরিক সরকার যখন কোন আন্দোলন বা কোন ধর্মঘট, মিছিল ইত্যাদি বন্ধ করতে চায় তখন তারা প্রথম চেষ্টা করেন স্থানীয় বে সামরিক অফিসার ও পুলিশ দ্বারা পরিস্থিতি আয়ত্বে আনতে। যদি তা না পারেন

সর্বশেষ উপায় হলো সামরিক বাহিনীর হাতে পরিস্থিতি আয়ত্বে আনবার ক্ষমতা অর্পণ করা। কিন্তু আই-এন-এর বিচার নিয়ে বেসামরিক অফিসার শান্তি রক্ষা বাহিনী, পুলিশ ও শেষ রক্ষক সামরিক বাহিনী যারা এই দুইশত বছর বৃটিশ সরকার কায়েম রাখবার জন্য চিরদিন বিশ্বস্ততার সাথে কর্তব্য পালন করেছেন তারা সবাই আজ এক বাক্যে ভারতের স্বাধীনতা চায়। ইংরেজ এখন ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালনার জন্য সেই চির বিশ্বস্ত সামরিক বাহিনীকে আজ এক মুহূর্তও বিশ্বাস করতে পারছে না।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিস্থিতি উল্টিয়ে দিল আজাদ হিন্দ ফৌজ। ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করে দিল আজাদ হিন্দ ফৌজ ও তার নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস। কী অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল ভারতীয় রাজনীতির অঙ্গনে। মৃত সুভাষ বোস (?) অধিক শক্তিশালী বলে প্রতিয়মান হলো জীবিত সুভাষ বোস থেকে।

কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, আকালী দল, হিন্দ ফৌজ, মহাসভা প্রভৃতির কণ্ঠে একই কথা সোচ্চার হয়ে উঠছে, একই দাবী ঘোষণা করছে 'আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার হতে দিব না। ভারতের স্বাধীনতা দাও–ইংরেজ এদেশ থেকে চলে যাও।' পরিস্থিতি লক্ষ্য করে নিজের প্রয়োজনেই কংগ্রেস ভোল পালটিয়ে নিজের দলের সংগতি রক্ষা করার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে লাগল। যে সব রাজনৈতিক আইনজীবী যেমন নেহেরু প্রভৃতি গত বিশ বছরেও আইনজীবীর কাল পোষাক পরিধান করে কোর্টে যাননি তারাও আজকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের প্রতীক আজাদ হিন্দ ফৌজের আত্মরক্ষার জন্য কালো গাউন পরে লাল কিল্লার কোর্টে হাজির হতে লাগলেন।

'Within a few weeks all these were change. In a wave of nationalist emotion the I, N, A, were acclaimed heroes who had fought for the freedom of India; no political leader who valued his future could stay aloof that all must offer to defend the martyre" (The springing tiger)

সেদিনকার সেই নবজাগ্রত ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা "আই-এন-এর বন্দীরা আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দকেও মেঘাবৃত করে ফেলেছে এবং মনে হচ্ছে গোটা কংগ্রেসকেই যেন তারা সূর্য গ্রহণের মত ঢেকে দিয়েছে। The History of Indian National Congrers Vol 2 P. 784 by Pattavi Shitarania.

তাই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ভারতীয় কংগ্রেস যতই দাবী বা গর্ব

করুক, আসলে ভারতের স্বাধীনতা আনয়ন করেছেন ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মি– আজাদ হিন্দ ফৌজ। ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস। একথা সত্য বলে প্রমাণিত হল সন্দেহাতীত ভাবে।

বৃটিশ প্রেষ্টিজের খাতিরে আই-এন-এ নেতৃবৃন্দকে সাজা দেয়া হল যাবজ্জীবন কারাদন্ড। কিন্তু সে আদেশ কার্যকরী হলো না। তদানীন্তন ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি ও জঙ্গীলাট ফিল্ড মার্শাল স্যার অকিনলেকের বিশেষ আদেশে সকল আই-এন-এ মুক্তি পেল।

এ বিষয়ে আরও কিছু তথ্য দিলে পাঠকের তখনকার পরিস্থিতি বুঝবার পথ সুগম হবে। আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি বাবু শৈলেনদের লিখিত বই 'আমি সুভাষ বলছি। বিশ্ববানী প্রকাশনী কলিকাতায় তৃতীয় খণ্ড একত্রে। (পৃঃ ২৮৩, ২৮৪)। প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল অকিনলেক প্রেরিত রিপোর্টটি আরও মারাত্মক।

যুদ্ধের আগে সেনাবাহিনীতে ভারতীয় অফিসারের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৯৬ জন। যুদ্ধের প্রয়োজনে সে সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬৭০৪ জনে। সৈন্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে বহু গুণ। অফিসার ও সৈন্য মিলিয়ে ২২ লক্ষ ৫০ হাজার।

তাছাড়া ৫০০২জন রয়েছে বিমান বাহিনীতে, নৌবাহিনীতে ৩৩ হাজারের চাইতেও বেশি। গোপন সমীক্ষায় জানা গেছে যে, তাদের মধ্যে প্রতি ৮০ জনের ৭৬ জনই নাকি আজাদ হিন্দ সৈন্যদের বিচারের বিরোধী। আরও জানা গেছে যে, সেনাবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে প্রায় সবাই নাকি মত প্রকাশ করেছেন স্বাধীনতার পক্ষে সৈন্যদের মধ্যেও শতকরা ৭৫ জন।

এই বিরাট সংখ্যা নিয়ে আজ যদি তারা সবাই রুখে দাঁড়ায়, তা হলে তাকে প্রতিহত করবার মত শক্তি বিধ্বস্ত প্রায় বৃটিশ বাহিনীর এখন কোথায়? ঝড়ের মুখে খড় কুটার মত উড়ে যেতে হবে না?

সেই অনিবার্য দুর্যোগকে এড়াতে হলে আজ হোক বা কাল হোক, শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত করতেই হবে।

১৯৪১ সনে উপরোক্ত আশা নিয়েই এই বইয়ের নগন্য লেখক বৃটিশ ভারতীয় সৈন্য বাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট হওয়ার জন্য দরখাস্ত করেছিল। আমার সেই অপরিপক্ব বয়সের সিদ্ধান্ত সঠিক হয়েছে দেখে আমি আজ গর্বিত।

আই-এন-এ প্রসঙ্গে ২৮৭ পৃ. বর্নিত আই-এন-এর লোকজনকে সশস্ত্র বাহিনীতে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে পণ্ডিতজী জেনারেল চৌধুরী সমেত তিন জনের পরামর্শ চান। আমরা বলেছিলাম ওদের সশস্ত্র বাহিনীতে নিলে ফল ভাল

হবে না। পণ্ডিতজী বলেন, আমি আপনাদের যুক্তির সঙ্গে একমত নই। তবে সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত। উল্লেখ্য যে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বঙ্গ সন্তান মেজর জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরী সহ তিন জন জেনারেলের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হয়ে আই-এন-এর লোক জনকে আর ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীতে ফিরিয়ে নেয়া হলো না। অথচ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর আমাদের মুক্তিযোদ্ধা সামরিক বাহিনীর লোকদের পুনরায় ফিরিয়ে নেয়া তো হয়েছিলই উপরন্ত দুই বৎসরের সিনিয়রিটিও অ-মুক্তি যোদ্ধাদের উপর দেয়া হয়েছিল। ঐ বইয়ের ২৮৮ পৃষ্ঠাতে দেখা যায় 'রেখে ঢেকে কথা বলার মানুষ সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল নন।' পরবর্তী কালে তিনি স্বীকার করেছেন যে, হ্যাঁ, সুভাষ বসুর আই-এন-এর কোন লোক যাতে সরকারী চাকুরীতে ঢুকতে না পারে সে সম্বন্ধে আমি খুবই সতর্ক ছিলাম। আমার আরও লক্ষ্য ছিল ওরা যেন কোন মতেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মাথা তুলতে না পারে। রিপেটিং ইন্ডিয়া; টায়া জিনকিন।

এই বইয়ের ২৮৭ পৃষ্ঠায় দেখা যায় উল্লেখযোগ্য যে, গান্ধীজীও সেদিন আজাদী সৈনিকদের গাঁয়ে ফিরে গিয়ে চাষাবাদ করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন।

যে আই-এন-এর বদৌলতে ভারতের স্বাধীনতা সূর্যের উদয় হলো তদানীন্তন ভারত সরকার ও কংগ্রেস নেতাদের এই দুর্ব্যবহার কত মর্মান্তিক তা ভেবে দেখার ভার পাঠকদের উপর ছেড়ে দেয়া হলো।

১৯৪৬ সনের ভারতব্যাপী সাধারণ নির্বাচন

১৯৪৫ সনের ৯ই মে জার্মানী ও ইতালী মিত্রশক্তির নিকট আত্মসমর্পনের মাধ্যমে ইয়োরোপ ও উত্তর আফ্রিকার রণভূমিতে যুদ্ধ বন্ধ হয়। বৃটিশ জাতি কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার সুযোগ পায় তা ছাড়া বিলেতের সাধারণ নির্বাচনের সময় হয়েছিল বলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং রিচার্ড ক্লিমেন্ট এটলীর নেতৃত্বে শ্রমিকদল নির্বাচনে জয়লাভ করার পর সরকার গঠন করেন। বিলেতে শ্রমিক (লেবার) সরকার ভারতীয় বৃটিশ সাম্রাজ্যে জনমত যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ভারতে নিযুক্ত তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলকে হুকুম দেন। সিমলা কনফারেন্স ব্যর্থ হওয়ার পর ভাইসরয় ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভারতীয় উপমহাদেশে স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েমের জন্য ভারতীয় সকল মুসলমানকে এই সুযোগে মুসলিম লীগে ভোট দিয়ে বৃটিশ

সরকারকে দেখিয়ে দিতে যে ভারতীয় মুসলমানেরা মুসলিম লীগের পতাকা তলে সমবেত আছে–ভারতীয় কংগ্রেসের মুসলিম প্রতিনিধিত্ব করার কোন অধিকার নাই দেখিয়ে দিতে উদাত্ত আহবান জানান।

ভারতের ১০ কোটি মুসলমান নির্বাচনের মাধ্যমে দ্ব্যর্থহীনভাবে দেখিয়ে দিলেন যে তারা সকলে ভারতীয় মুসলিম লীগকে সমর্থন করেন। কংগ্রেসের মুসলিম সমর্থন ভাওতাবাজি ও অসত্য। এই নির্বাচনের ফল ছিল নিম্নরূপঃ যা পরিস্কার ভাবে দেখিয়ে দেয় যে, ভারতীয় মুসলমানের রায় মুসলিম লীগের স্বপক্ষে ঃ

কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে ৩০টি মুসলিম আসনেই সব কয়টি পেয়েছে মুসলিম লীগ।

প্রাদেশিক আইন পরিষদ নির্বাচনে বঙ্গদেশের ১১৯টি মুসলিম আসনের মধ্যে ১১৩টি আসামে ৩৪টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৩১টি বিহারে ৪০টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৩৪টি উড়িষ্যায় ৪টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৪টি যুক্ত প্রদেশের ৬৬টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৫৫টি, পাঞ্জাবে ৮৬টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৭৯টি, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৩৮টি আসনের মধ্যে ১৭টি, সিন্ধু প্রদেশে ৩৫টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২৮টি, বম্বে ৩০টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৩০টিই। মধ্য প্রদেশে ১৪টি আসনের মধ্যে ১৪টিই। মাদ্রাজ প্রদেশে ২৯টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২৯টিই। সারা ভারতে সর্বমোট ৫২৯টি মুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ জয় করল ৪৬৫টি আসন।

স্বভাবতঃ প্রমাণ হল যে, মিঃ জিন্নার দাবী যে সারা ভারতের মুসলমানেরা মুসলীম লীগের অনুগামী। কংগ্রেসের মুসলিম প্রতিনিধিত্বের দাবী ভাওতা ছাড়া আর কিছু নয়। তাই মিঃ জিন্নাহর ভারতে সংখ্যালঘু মুসলীম সম্প্রদায়ের কথা বলার অধিকার একমাত্র মুসলিম লীগেরই আছে এ তথ্য যেমন ভারতে বৃটিশ সরকার তেমন ইংল্যাণ্ডে বৃটিশ সরকারের নিকটও প্রমাণিত হয়ে গেল। উল্লেখ্য যে, এই ইলেকশন ১৯৩৫ সনের ঐক্য অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক কোটা ভিত্তিতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

বৃটিশ কেবিনেট মিশন

ভারতবর্ষ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল দেখার পর মুসলীম ও আই-এন-এর বিচার উপলক্ষে ভারতের সকল রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে ভারতের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন তুঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য

এবং সর্বোপরি ভারতীয় সামরিক বাহিনী বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করার পরিপ্রেক্ষিতে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী ১৯৪৬ সনের ১৫ই মার্চ হাউস অব কমন্সে ঘোষনা করলেন যে, ভারতের স্বায়ত্ত্ব শাসন দানে সহায়তা করার জন্য ভারত সার্বিক নিম্ন ব্যক্তি বর্গকে নিয়ে একটি কেবিনেট মিশন নিযুক্ত করে শীঘ্রই ভারতে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

১। লর্ড প্যাথিক লরেন্স।
২। স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপস
৩। মিঃ এ বি আলেকজাণ্ডার।

তদনুযায়ী কেবিনেট মিশন ১৯৪৬ সনের ২০শে মার্চ ভারতে আগমন করেন।

বৃটিশ কেবিনেট মিশন প্রায় ২ মাস থেকে নিখিল ভারত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনার পর ১৯৪৬ সনের ১৬ই মে ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক জটিলতা অপসারনের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি সর্ব সাধারণে প্রকাশ করেন যার বঙ্গানুবাদ প্রায় নিম্নরূপ ঃ

১। বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমুহ একত্রে ভারতীয় ইউনিয়নে সংগঠিত হবে, যার বিষয়াবলী থাকবে পররাষ্ট্র, দেশ রক্ষা ও যোগাযোগ মাত্র। উপরোক্ত বিষয়গুলোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগানোর আবশ্যকীয় ক্ষমতা থাকবে ইউনিয়ন সরকারের হাতে।

২। ইউনিয়ন অর্থাৎ কেন্দ্রীয় বিষয় গুলো ব্যতীত সকল বিষয় ও সর্ব ক্ষমতা প্রদেশগুলোর উপর অর্পিত হবে।

৩। কেন্দ্রীয় বিষয়গুলি ব্যতীত সকল বিষয় ও ক্ষমতা দেশীয় রাজ্যসমূহের (প্রদেশগুলির মত) আওতাধীন থাকবে।

৪। প্রশাসন ও আইন পরিষদসহ গ্রুপ গঠন প্রদেশগুলির আওতাধীনে থাকবে। যখন কোন প্রাদেশিক বিষয় সাধারণ ভাবে গ্রহণ করা হবে তা গ্রুপই সিদ্ধান্ত নেবে।

৫। কেন্দ্রীয় গ্রুপগুলোর বিধান থাকা উচিত যে, প্রথম দশ বৎসর এবং তার পরবর্তী ১০ বছর অন্তর অন্তর যে কোন প্রদেশ স্বীয় আইন পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংবিধানের ধারাগুলি পুনর্বিবেচনার দাবী করতে পারবে।

ভারতবর্ষকে নিম্ন লিখিত তিন ভাগে বিভক্ত করা হবেঃ

গ্রুপ এ-মাদ্রাজ, বম্বে, সংযুক্ত প্রদেশ বিহার, মধ্য প্রদেশ ও উড়িষ্যা ১৬৭টি সাধারণ আসন ও ২০টি মুসলিম আসন।

গ্রুপ বি, পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, ও সিন্ধু প্রদেশ ৯টি সাধারণ আসন ২২টি মুসলিম আসন ও ৪টি শিখ আসন।

গ্রন্থাগার
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

গ্রুপ সি, বঙ্গদেশ ও আসাম ৩৪টি সাধারণ আসন, ৩৬টি মুসলিম আসন।

দুই মাস যাবত বৃটিশ কেবিনেট মিশনের সাথে বহু দেন দরবার করার পর ভারতীয় কংগ্রেস মুসলিম লীগ ও তৎকালীন দলের পক্ষে নেতাগণ উপরোক্ত বৃটিশ কেবিনেট মিশনের প্লান মেনে নিয়ে স্ব-স্ব দলের পক্ষে সই করেন। এর কপি ভারতবর্ষের ভাইসরয় ও সকল রাজনৈতিকদলকে দিয়ে মূল কপি নিয়ে কেবিনেট মিশন লন্ডনে ফিরে যান। এবং বিলেতের পার্লামেন্টে ঘোষনা করা হয় যে ভারত বর্ষের নেতৃবৃন্দ উপরোক্ত কেবিনেট মিশনের প্লান মেনে নিয়ে তারা সকলে তাতে দস্তখত করে দিয়েছেন।

ভারতের কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পণ্ডিত জওহরলালের বম্বশেল ও কেবিনেট মিশন প্লান বানচাল

২০শে মে ১৯৪৬ সন নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি স্বাধীন, অখণ্ড ও গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের সংবিধান প্রণয়নের জন্য প্রস্তাবিত গণ পরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১০ই জুলাই ১৯৪৬ সন বম্বে শহরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে নিখিল ভারত কংগ্রেসের নব নির্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ঘোষণা করেন যে, কংগ্রেস গণ পরিষদে কেবল মাত্র এই শর্তে অংশ গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে যে, যা সর্বোৎকৃষ্ট বলে মনে করবে সেই মোতাবেক কেবিনেট মিশন প্লানকে পরিবর্তন বা সংশোধন করার ব্যাপারটিতে নিজেকে স্বাধীন মনে করে। এ বিষয়ে আমি মাওলানা আবুল কালাম আজাদের রায়ের কিয়দংশ যা মিঃ শৈলেন কুমার বন্দোপাধ্যায়ের 'জিন্না পাকিস্তান ও নতুন ভাবনা' তার লেখা বইয়ের ২৩০ পৃষ্টায় ছাপিয়েছেন, পাঠকের সুবিধার জন্য আমি তা হুবহু উদ্ধৃত করলাম। 'এরপরে এমন অতীব শোচনীয় ঘটনা ঘটে গেল যা ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তীত করে দিল। ১০ই জুলাই ১৯৪৬ সন জওহরলাল বোম্বাইয়ে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠান করলেন এবং তাতে এমন বিবৃতি দিলেন যা সাধারণ অবস্থায় হয়ত সে গ্রাহ্য করতনা কিন্তু তখনকার সন্দেহ ও বিদ্বেষের পরিস্থিতিতে তা এক অত্যন্ত দুর্ভাগ্য পূর্ণ পরিণতির সূত্রপাত করল। কোন এক সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করছিলেন যে, অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক এই প্রস্তাব গৃহীত হবার পর কি কংগ্রেস প্রস্তাবিত সরকারের গঠন প্রণালী সহ (মিশনের) পরিকল্পনা সম্পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করেছে?

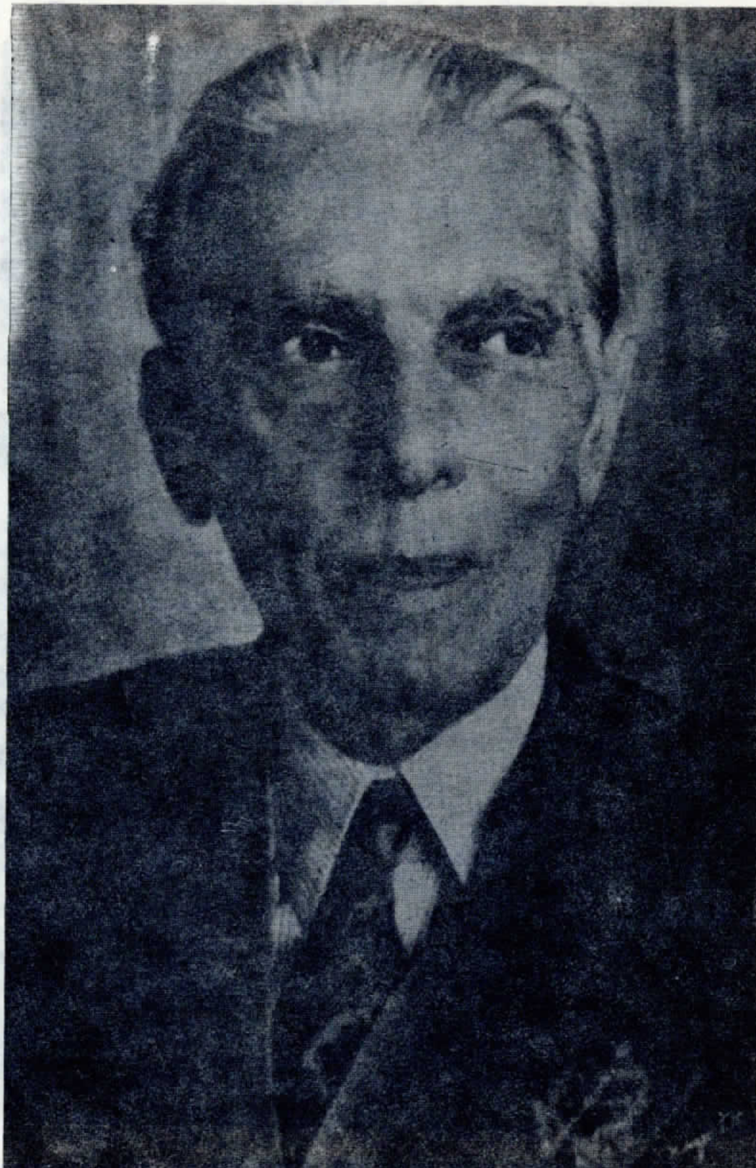

পাকিস্তানের রাষ্ট্র নায়ক কায়েদ-ই-আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্।

শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হক।

উত্তরে জওহরলাল বলেছিলেন যে, কংগ্রেস কোন রকমের চুক্তির বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে যখন যে রকম অবস্থার সৃষ্টি হয় তার মোকাবিলা করার স্বাধীনতা নিয়ে গণপরিষদে যোগদান করবে।

সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন যে, এর অর্থ কী এই দাঁড়ায় যে কেবিনেট মিশনের পরিকল্পনার রদবদল হতে পারে?

"জওহরলাল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উত্তর দিলেন যে, কংগ্রেস কেবল গণপরিষদে যোগ দিতে রাজী হয়েছে এবং নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী কেবিনেট মিশনের প্রস্তাবের পরিবর্তন ও রদবদল করার স্বাধীনতা তার আছে।"

"আমাকে একথা লিপিবদ্ধ করতে হবে যে, জওহরলালের বক্তব্য ভ্রান্ত ছিল। একথা সত্য নয় যে কংগ্রেস নিজ ইচ্ছানুসারে পরিকল্পনা পরিবর্তন করার স্বাতন্ত্র্য ছিল। আমরা প্রত্যেকেঃ একথা স্বীকার করে নিয়েছিলাম যে, কেন্দ্রীয় সরকার ফেডারেল ধরনের হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে বাধ্যতামূলকভাবে ৩টি বিষয় থাকবে এবং অন্যান্য বিষয় প্রাদেশিক সরকারের অন্তর্ভূক্ত হবে। আমরা এ বিষয়েও সম্মত হয়েছিলাম যে, ক, খ, গ নামে তিনটি প্রদেশ গোষ্ঠী থাকবে। চুক্তির অপরাপর পক্ষের সম্মতি ব্যতিরেকে কংগ্রেসের পক্ষে একতরফাভাবে এ সব ব্যাপারে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।"

মুসলিম লীগ এ জন্য কেবিনেট মিশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল যে, বৃটিশ সরকারের পক্ষে এর বেশি দেওয়া সম্ভব ছিল না। লীগ কাউন্সিলের সভায় শ্রীযুক্ত জিন্নাহ্ ইতিপূর্বেই বলেছিলেন যে, এর চেয়ে ভাল আর কিছু পাওয়া সম্ভব নয় বলে তিনি এ প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষে সুপারিশ করেছেন।"

"সুতরাং আলোচনার পরিণাম সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জিন্নাহ্ খুব খুশী ছিলেন না। তবে এর অপর কোন বিকল্প ছিল না বলে তিনি পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন। জওহরলালের বিবৃতি তার কাছে বোমা বিস্ফোরণের মত প্রতিয়মান হল।"

নেহেরুর বম্বশেলে কেবিনেট মিশনের প্লান বানচালে মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়া

নব নির্বাচিত কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর বম্বে শহরে আহুত সাংবাদিক সম্মেলনের মন্তব্যে কেবিনেট মিশন প্লানের উপর বম্বশেলের মত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। উদ্ভুত এই নতুন পটভূমিকায় সমগ্র রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ২৭, ২৮ ও ২৯ শে

জুলাই ১৯৪৬ সন, বম্বে শহরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন ডাকলেন। কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম কাউন্সিল কেবিনেট মিশন প্ল্যান গ্রহণ সম্পর্কিত পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করে নিম্নোক্ত নতুন প্রস্তাব গ্রহণ করে। 'where as the council of all India Muslim League resolved to reject the proposals embodied in the statement of the Cabinet deligation and the Viceroy dated 16th May 1946, to the intransigent of the Congress on the one hand and the breach of faith with the Muslims by the British Govt. On the other and where as the Muslims of India have exhausted without success all efforts to find a peaceful solution of the Indian problems by Compromise and Constitutional means and whereas the Cogress is bent upon setting up Cast Hindu Raj in India with Convinenc of the British and whereas recent events have shown that power politics, not Justice and fair play are the deciding factors in India affairs and whereas it has abundantly clear that Muslims would rest Contemped with any thing less than immediate establishment of an independent and fully soverign state of Pakistan and would resist at any attempt to impose any constitution making machinery, any constitution long term and short term or of setting up an Interim Government at the Centre without the approval and consent of the Muslim League. The Council of All India Muslim Legue is Convinced that now the time has come for the Muslim nation to resort to Direct Action to achieve Pakistan to assert their just rights to get rid of the present British slavery and the contemplated future Cast-Hindu domination.

This Council calls upon the Muslim nation to stand as one man behind their sole representative authoritative organisation. The All India Muslim League and to be ready for every sacrifice.

This council directs that the working Committee to prepare forthwith a programme of Direct Action to Carry out the policy announced above and to aggressive Muslims for the coming struggle to be Launched at and

when necessary.

As a protest against in taken of their brief statement of the attitude of the British, this Council Calls upon the Muslims to renounce forhwith the titles conferred upon by the Govt.'

মোটামুটি এর অর্থ দাঁড়ায় ঃ

যেহেতু কংগ্রেসের অনমনীয়তা বৃটিশ সরকারের বিশ্বাস ভঙ্গের কারণে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিল কেবিনেট ডেলিগেশন ও ভাইসরয় কর্তৃক ১৬ই মে ১৯৪৬ সন প্রদত্ত বিবৃতিতে সন্নিবেশিত প্রস্তাবাবলী প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেহেতু সমঝোতা ও নিয়মতান্ত্রিক পথে ভারতীয় সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে মুসলিম ভারত সর্বচেষ্টা নিঃশেষ করেছে, যেহেতু বৃটিশের পক্ষ সমর্থনে বলীয়ান হয়ে কংগ্রেস বর্ণ হিন্দুরাজ কায়েম করতে বদ্ধ পরিকর, যেহেতু সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহ প্রমাণ করেছে যে, ভারতীয় ব্যাপারে ন্যয় বিচার ও নিরপেক্ষতা নয় বরং ক্ষমতার রাজনীতিই নির্ধারণের বিষয়বস্তু' যেহেতু ইহা সর্বশেষ স্পষ্ট হয়েছে যে, স্বাধীন ও সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের তাৎক্ষণিক প্রতিষ্ঠা ব্যতীত ভারতীয় মুসলমান শান্ত থাকবে না, এবং মুসলিম লীগের অনুমোদন ও সম্মতি ব্যতিরেকে কোন সংবিধান রচনাকারী সংস্থা, দীর্ঘ মেয়াদী বা স্বল্প মেয়াদী হোক না কেন অথবা কেন্দ্রে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের যে কোন প্রচেষ্টাকে বাধা দেবে। নিখিল ভারত মুসলিম কাউন্সিলের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, পাকিস্তান অর্জনের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আশ্রয় গ্রহণ করায় তাদের ন্যায্য অধিকার রক্ষা করার, তাদের সম্মান রক্ষা করার এবং বর্তমানের বৃটিশ দাসত্ব ও ভবিষ্যতে বর্ণ হিন্দুর আধিপত্য ঝেড়ে ফেলার সময় মুসলিম জাতির জন্য অত্যাসন্ন হয়ে পড়েছে। এই কাউন্সিল (মুসলিম) জাতিকে তাদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক ও কর্তৃত্ব ব্যঞ্জক সংগঠন নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পেছনে দাঁড়াবার ও যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুতি নিবার আহবান জানাচ্ছে।

উপরে ঘোষিত নীতিকে কার্যকরী করতে ও প্রয়োজন বোধে আশু সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য মুসলমানদিগকে সংগঠিত করতে অবিলম্বে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য ওয়ার্কিং কমিটিকে কাউন্সিল নির্দেশ দিয়েছে।

ইংরেজ মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও তাদের গভীর ক্ষোভের প্রতীক হিসেবে সরকার প্রদত্ত সর্ব প্রকার খেতাব বর্জনের জন্য মুসলমানদের প্রতি এই কাউন্সিল আহবান জানাচ্ছে। উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যে ২৪শে মে ১৯৪৬ সন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি 'স্বাধীন' 'অখণ্ড' ও 'গণতান্ত্রিক' ভারত বর্ষের সংবর্ধনা

প্রণয়নের জন্য প্রস্তাবিত গণপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মুসলিম লীগ উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয় বলে প্রতিয়মান হয়।

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ১৬ই আগষ্ট ১৯৪৬ সন

উপরোক্ত প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ১৬ই আগষ্টকে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষণা করে। অবিভক্ত বঙ্গের খাজা নাজিমুদ্দিন, যুক্ত প্রদেশের নওয়াব ইসমাইল খান ও চৌধুরী খালেকুজ্জামানকে নিয়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। ভারতীয় মুসলিমদিগকে ১৬ই আগষ্ট ১৯৪৬ সন সকল কাজ কর্ম বন্ধ রেখে পূর্ণ হরতাল পালন করতে আহবান জানায়।

১০ই জুলাই কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পণ্ডিত নেহেরু কেবিনেট মিশন প্লান বানচাল করে দেয়ায় মুসলিমলীগ কংগ্রেসের সাথে অন্তবর্তীকালীন কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের দায়িত্ব নিতে অস্বিকৃতি জানালে ভাইসরয় একগুয়েমী করে পন্ডিত নেহেরুকেই অন্তবর্তীকালীন কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের দায়িত্ব দিলেন। ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ সন পণ্ডিত নেহেরু ১২ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রে অন্তবর্তীকালীন এক দলীয় কংগ্রেস সরকার গঠনে হিন্দুদিগকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামায় উৎসাহিত করেছিল বলে আমার মনে হয়। এই ঘটনা মুসলমান দিগকে খুবই উত্তেজিত করেছিল।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তার লেখা বই 'India Wins Freedom'-এর ১৭০ পৃষ্ঠায় লিখলেন ঃ 16th August 1946 was a black Day not only for Calcutta but for the whole of India. The turn that event had made it impossible to expect a peaceful solution by agreement between the Congress and the Muslim League. This was one of the greatest tragedies of Indian history and I have to say with the deepest regret that the large part of the development rests with Jawaharlal. His unfortunate statement that the Congrers would be free to modify the Cabinet mission plan, re-opened the whole questions of political and communal settlement Mr. Zinnah took full advantage of this mistake and withdrew from the League's early acceptance of the Cabinet Mission plan.'

এর অর্থ দাঁড়ায়

১৬ই আগষ্ট ১৯৪৬ সন শুধু কলিকাতার জন্য নয় বরং সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য একটি কালোদিবস। ঐ সময় এই ঘটনাটি ঘটার জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে কোনরূপ চুক্তির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাধান অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। ভারতের ইতিহাসে এটাকে একটি সর্ববৃহৎ ট্রাজেডি বলতে হবে। এবং আমি বলতে পারি যে এই পরিস্থিতির অগ্রগতির অধিকাংশের জন্যই দায়ী জওহরলাল। কংগ্রেস কেবিনেট মিশন প্লান সংশোধনের অবাধ কর্তৃত্ব রাখে এই দুর্ভাগ্য জনক বিবৃতিই দেশের রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রশ্নটি আবার নতুন করে দেখা দেয়। মিঃ জিন্নাহ এই ভুলের সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন এবং তাদের কেবিনেট মিশন প্লান গ্রহণ করার পূর্ব সিদ্ধান্তকে নাকচ করে দেন।

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস

তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী খুবই কর্মদক্ষ ও সুচতুর লোক ছিলেন। ১৬ই আগষ্ট উপরোক্ত সংগ্রাম দিবস যাতে কৃতকার্য হতে পারে তার চেষ্টার তিনি ক্রটি রাখেননি। ও দিকে সাম্প্রদায়িক হিন্দু গুণ্ডা বাহিনী এই সংগ্রাম দিবস বানচাল করে দিবার জন্য গোপনে গোপনে খুবই তৎপর ছিল। তাই ১৬ই আগষ্ট কলিকাতায় মহানগরীতে সংগ্রাম দিবস উপলক্ষে এক অভূত পূর্ব দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টি হল। উভয় পক্ষে যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হলো কিন্তু সংখ্যা লঘিষ্ট মুসলমানদের ধন সম্পদ লুণ্ঠিত ও অগ্নিদাহ এবং ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে হিন্দুর তুলনায় অনেক বেশি। আমাদের ঢাকা শহর প্রত্যক্ষ সংগ্রাম পালন কালে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক ও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই। কলিকাতার দাঙ্গা হাঙ্গামা দেখে তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পার্শ্ববর্তী বিহার প্রদেশে এক নারকীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। প্রতিনিয়ত সংখ্যা লঘু শান্তি প্রিয় মুসলিম সম্প্রদায় ধনে মানে ইজ্জতে তার খেসারত দিতে লাগলো প্রচুর। কলিকাতা ও বিহারের দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নোয়াখালিতে তুলনামূলক ভাবে খুব ছোট খাটো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। কিন্তু বিহারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তুলনায় তা সামান্যই বলা যায়। কিন্তু গান্ধীজী বিহারের মুসলিম নিধন যজ্ঞের প্রতি চোখ বুঁজে রইলেন আর ধেয়ে আসলেন নোয়াখালিতে দাঙ্গা বিধবস্ত এলাকা পরিদর্শনের জন্য। অবিভক্ত বাংলার তখনকার প্রধান মন্ত্রী গান্ধীজীর নোয়াখালির অবস্থানের সকল সুবিধার ব্যবস্থা করলেন। তিনি স্থানীয় কর্মচারী ও মুসলিম নেতৃবৃন্দকে এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর নোয়াখালি অবস্থানের সুযোগ নিয়ে বহু স্থানীয়

মুসলিম নেতৃবৃন্দকে নানা ভাবে শান্তি রক্ষাবাহিনীর হাতে হয়রানির শিকার হতে হয়েছিল। তাই প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সাহরওয়ার্দী লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন ঃ যার অর্থ দাড়ায় বাংলার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা আমি অতি মূল্যবান মনে করি। তবে মুসলমানেরা মনে করে আপনি যদি পারস্পরিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার নীতি বাস্তবিকই চালিয়ে নিতে চান তা হলে বিহারই প্রকৃত ক্ষেত্র হওয়া উচিত। আপনার অবস্থান অনেককেই বানোয়াট প্রমাণাদি উদ্‌ঘাটন করতে এবং স্থানীয় মুসলমান ও মুসলিম লীগ নেতৃবন্দকে হয়রানি করার উদ্দেশ্যে আপনার নিকট তা পেশ করতে উৎসাহিত করেছে। যা অদূর ভবিষ্যতে পারস্পরিক আস্থা স্থাপনে সম্ভবতঃ সহায়ক হবে না।

দাঙ্গা বিধবস্ত কলিকাতা মহানগর সরজমিনে দেখার জন্য লর্ড ওয়াভেল ২৫শে আগষ্ট ১৯৪৬ কলিকাতা আসলেন। তখন প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ও লর্ড ওয়াভেল বৈঠক হয়। এই বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে অচিরেই কয়েক দফা সোহরাওয়ার্দী কায়েদে আজম ও কায়েদে আজম ওয়াভেল এবং গান্ধী জিন্নাহ প্রভৃতির মধ্যে আলাপ আলোচনা হয়। আলোচনার পরে গান্ধী ও জিন্নাহ শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার জন্য দেশবাসীকে যুগ্ম আহবান জানান। অক্টোবরের প্রথম দিকে জিন্নাহ নেহেরু ও জিন্নাহ ওয়াভেল বৈঠকে ফলপ্রসু আলোচনা হয়। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৩ই অক্টোবর ১৯৪৬ সন নিখিল ভারত মুসলিমলীগ ওয়ার্কিং কমিটি অন্তবর্তীকালীন কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদানের প্রস্তাব গ্রহণ করে। তদানুযায়ী ২০শে নভেম্বর ১৯৪৬ সন জনাব লিয়াকত আলী খান অর্থ, জনাব আই আই চন্দ্রী গড়ু বাণিজ্য, জনাব সরদার আব্দুর রব নিস্তার যোগাযোগ, রাজা গজনফর আলী খান স্বাস্থ্য ও বরিশালের যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল আইন বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন।

ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভ

২২শে মার্চ ১৯৪৭ লর্ড লুই মাউন্ট ব্যটেন বৃটিশ রাজকীয় পরিবারের আত্মীয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন সাউথ ইষ্ট এশিয়া কমান্ডের সর্বাধিনায়ক লর্ড লুই মাউন্ট ব্যাটেন ভারতের গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয়ের স্থলাভিষিক্ত হন। তিনিই ভারতের সকল উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিকদলের নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে কয়েক দফা বৈঠক করেন। লর্ড ওয়াভেল ভারতীয় জন সাধারণের মনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার পরিপ্রেক্ষিতে যাতে শান্তিপূর্ণ ভাবে শাসন ক্ষমতা ভারতীয় নেতাদের হাতে অর্পণ করা যায়– সেজন্য স্বাধীনতা অর্পণ একটু পিছিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু নতুন ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন জনসাধারণের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা– ভারতীয় সামরিক বাহিনীর স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ভারতীয় নেতাদের ক্ষমতা লাভের ব্যগ্রতা দেখে ভাইসরয় বৃটিশ গভর্ণমেন্টের অনুমোদন স্বাপেক্ষে কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দের সবিশেষ অনুমোদনের পর ৩রা জুন ১৯৪৭ সন ভারত বিভাগের পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন। এটাই বিখ্যাত ৩রা জুন পরিকল্পনা বা ভারত পাকিস্তানের স্বাধীনতা নামে অভিহিত।

বঙ্গভঙ্গ রদের দাবিদার হিন্দুদের এবার বঙ্গভঙ্গের দাবী

ভারতীয় হিন্দু মহাসভা নেতা কলিকাতার ব্রাহ্মণ প্রখ্যাত আশুতোষ মুখার্জির ছেলে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আন্দোলন শুরু করে দিলেন যে, ভারত যখন বিভাজন হয়ে স্বাধীন হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েম হতে যাচ্ছে তখন বাংলা দেশের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির সমন্বয়ে একটি প্রদেশ গঠন করে ভারতের সাথে সংযুক্ত করা হোক। নিখিল ভারত কংগ্রেস সভাপতি আচার্য্য কৃপালিনী বঙ্গভঙ্গের এই দাবীর সমর্থনে বিবৃতি দেন।

লর্ড ওয়াভেলের প্রস্থান ও মাউন্ট ব্যাটেনের আগমন

ভারতের নব নিযুক্ত ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল লর্ড লুই মাউন্ট ব্যাটেন বিলেত থেকে ভারতে আসার সময় বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী তাকে বিশেষ ভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, জুন ১৯৪৮ এর মধ্যে ভারতের শাসন ভার ভারতীয়দের উপরে অর্পন করতেই হবে। এই বিঘোষিত নির্দেশ নিয়ে নতুন ভাইসরয় ভারতের শাসন ভার গ্রহণ করলেন। এখানে বলে রাখা ভাল যে, ভারতের বিদায়ী ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কেবিনেট প্লান প্রত্যাখ্যান করাতে এবং সাম্প্রদায়িকদাঙ্গা-হাঙ্গামা তুঙ্গে উঠাতে তিনি বৃটিশ কেবিনেটকে আপ্রাণ বুঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, তড়িঘড়ি করে ভারতের স্বাধীনতা দিলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বহু হিন্দু, মুসলমান, শিখ মারা যাবে, বহু লক্ষ মানুষ ছিন্নমূল হয়ে পড়বে। প্রায় দুশো বছর ভারতে রাজত্ব করেছেন, এখন বৃটিশ কিছু দিন পরে হলেও শান্তিপূর্ণ অবস্থায় ভারতবাসীদের নিকট স্বাধীনতা অর্পণ করে যাওয়া উচিত নতুবা বিরাটাকারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামাতে যে লোক ক্ষয় হবে, ধন সম্পদ নষ্ট হবে এর নৈতিক দায়দায়িত্ব বৃটিশের উপরই বর্তাবে। এই কলংকজনক পরিস্থিতির জন্য ভবিষ্যতের ইতিহাস বৃটিশ জাতি এবং সরকারকেই দায়ী করবে।

কিন্তু যুদ্ধ বিধ্বস্ত ও আর্থিক দিক দিয়ে পঙ্গু বৃটিশ সরকার ভারত শাসনের মতো ব্যয়বহুল কাজের দায়িত্ব নিতে বাস্তব পক্ষে অপারগ হওয়াতে ভারতের স্বাধীনতা দিয়ে নিজদের দেশ পুনর্গঠনের কাজকেই শ্রেয় মনে করলেন। তাই তারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেয়ার জন্য ভাইসরয়কে চাপ দিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগ দেয়ার পূর্বে আমি তো– মনে মনে এই ভেবেছিলাম যে বৃটিশ জাতি যুদ্ধে জিতলেও জনশক্তি ও আর্থিক দিক দিয়ে এমন পঙ্গু হয়ে যাবে যে, বিশ পঁচিশ লক্ষ ভারতীয় সামরিক বাহিনী যারা প্রত্যেকে আজ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত তাদের দাবিয়ে রাখার শক্তি বৃটিশের আর থাকবে না। এবং ভারতের স্বাধীনতা না দিয়ে পারবে না। ঘটলও তাই। যুদ্ধের পরিণতি সম্বন্ধে আমার হিসেব-নিকেশ সঠিক হয়েছে দেখে আমি গর্বিত।

যা হোক লর্ড ওয়াভেল যখন বৃটিশ কেবিনেটকে বা এটলী সরকারকে তার স্বমতে আনতে পারলেন না তখন বাধ্য হয়ে তিনি ইস্তফা দিলেন।

নতুন ভাইসরয় মাউন্ট ব্যাটেনের সামনে তখন মহা সমস্যা। বৃটিশ সরকার তাকে ১৯৪৮ সনের জুনের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা দিয়ে দেয়ার জন্য আদেশ (ম্যাণ্ডেট) দিয়ে দিয়েছেন। তিনি ভারতে এসে দেখেন এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার আগুন জ্বলছে। প্রায় ২৫ লক্ষের মত ভারতীয় সামরিক বাহিনী স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, অপর দিকে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পণ্ডিত নেহেরু বৃটিশ কেবিনেট মিশন প্লান বানচাল করে দিয়েছেন যদিও তিনি এতে স্বাক্ষর করেছিলেন। তাই এরই প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম লীগও বৃটিশ কেবিনেট মিশন প্লান প্রত্যাখ্যান করলেন। ফলে ভাইসরয়ের চতুর্দিকে শুধু সমস্যা আর সমস্যার বেড়াজাল সৃষ্টি হয়েছে।

এহেন সমস্যা সংকুল পরিস্থিতিতে ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একাগ্র ভাবে কাজ করতে তিনি আগে হতেই অভ্যস্ত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে বৃটিশ বাহিনী যখন মার খেতে খেতে এবং দূর প্রাচ্য হতে হটতে হটতে ভারত ভূমি পর্যন্ত পশ্চাদাপসরণ করল সেই অবস্থাতে তাকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সর্বাধিনায়ক করা হলো। যখন বৃটিশ সামরিক বাহিনী প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর নিকট পরাজিত হয়ে শুধু পশ্চাদাপসরণ করতেই বাধ্য হয়েছিল সেই অবস্থা থেকে যুদ্ধ শুরু করে আবার তিনি বার্মা, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি জয় করলেন এবং যুদ্ধ শেষে বিজয়ীর বেশে বৃটেনে ফেরত গেলেন।

তাই নির্ভিক ও জ্ঞানী সাবেক সামরিক সুপ্রীম কমাণ্ডার বর্তমানে ভাইসরয় ধীর স্থির ভাবে বসে গেলেন বেসামরিক সমস্যা অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতার

সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায় তার চিন্তা ভাবনা ও পরিকল্পনা নিয়ে। উপরন্তু তার কিছু বাড়তি বৈশিষ্ট্যও ছিল। যেমন তিনি বৃটিশ রাজ পরিবারের সম্পর্কে আত্মীয়। যুদ্ধ কালীন অবস্থায় তখনকার প্রধান মন্ত্রী ও বর্তমান বিরোধী দলীয় নেতা মিঃ উইনষ্টন চার্চিলের বিশেষ স্নেহের পাত্র এবং তার পরমা সুন্দরী স্ত্রী যার সৌন্দর্য ও মার্জিত আচার ব্যবহার তার সান্নিধ্যে আনাগোনাকারী সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাছাড়া মাউন্ট ব্যাটেনের নিজের ব্যক্তিত্ব (পার্সোনালিটি) জ্ঞান, গরীমা তো আছেই। এই সকল গুণে গুনান্বিত হয়ে মোটামুটি বৃটিশ কেবিনেট মিশন প্লানের মতো ভারত বিভাজন করার জন্য খুব সাবধানে উঠে পড়ে লাগলেন।

কিছু দিনের মধ্যেই তিনি ভারত বিভাজনের জন্য কংগ্রেস নেতা বল্লভ ভাই প্যাটেলকে রাজী করালেন। তার পরে মাউন্ট ব্যাটেন ও তার স্ত্রী দু'জনে মিলে পণ্ডিত নেহেরুকে ভারত বিভাজনের স্বপক্ষে আনলেন। এভাবে মাউন্ট ব্যাটেন গান্ধীজী সহ কংগ্রেসের গন্যমান্য নেতাদের ভারত বিভাজনের জন্য রাজী করালেন। বাকী রইল শুধু মাওলানা আবুল কালাম আজাদসহ মুষ্টিমেয় কয়েকজন নেতা। কিন্তু তা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত নিতে কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারল না।

অপর দিকে মুসলিম লীগের দাবী ভারত বিভাজন ও পাকিস্তান কায়েমের পক্ষেই মাউন্ট ব্যাটেন কাজ করেছেন— এটা প্রকাশ্যে দেখাতে লাগলেন। কাজেই মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় মুসলিম লীগের কর্মকর্তারা পাকিস্তান কায়েমের ভিত্তিতে ভারত বিভাজনে রাজী হলেন। তাই মাউন্ট ব্যাটেন আশার আলো দেখে খুশীই হলেন।

পখতুনিস্থান

ভারত বিভাজনে ভারতীয় কংগ্রেস রাজী হলেও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেস নেতা আব্দুল গাফফার খান (সীমান্ত গান্ধী) কংগ্রেসের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলেন এবং আরও প্রকাশ করলেন যে, ভারত যদি বিভাজন হয়েই যায় তা হলে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠান জাতি আলাদা স্বাধীন ও সার্বভৌম পখতুন রাষ্ট্র করতে চায়। কারণ পাঠানদের ভাষা ও সংস্কৃতি আলাদা, এবং ভারতের এক কোণে সীমান্তের বাসিন্দা তারা। কাজেই তারা পাকিস্তানেও থাকবে না– আর ভারতের সাথে এর কোন সান্নিধ্য (কন্‌টিগুইটি) না থাকাতে ভারতেও যোগ দিবেনা। তারা আলাদা রাষ্ট্র চায়। কিন্তু মাউন্ট ব্যাটেন সিদ্ধান্ত নিলেন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে হয় পাকিস্তানের সাথে থাকতে হবে, নতুবা ভারতের অন্তর্ভূক্ত

হতে হবে, এ জন্য শুধু প্রাদেশিক পরিষদে কংগ্রেসের মেজরিটি থাকলে চলবেনা সেখানকার জনগণের গণভোট (রেফারেন্ডাম) নিয়ে জানতে হবে বর্তমান পরিস্থিতিতে জনগণের রায় কি? তার পরে সেখানে গণভোট নেয়া হয়। সীমান্ত পাঠানেরা বিপুল ভোটে পাকিস্তানে যোগ দেয়ার জন্য রায় দেয়।

এই রেফারেন্ডামের ফলশ্রুতিতে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের পাঠান প্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হয়। পূর্বের নির্বাচিত কংগ্রেস সরকার ভেঙ্গে দেয়া হয়। সরকার আব্দুল কাইউমের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়। সীমান্ত গান্ধী আব্দুল গাফফার খান তার ছোট ভাই সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডঃ খান সাহেব ও কংগ্রেস সমর্থিত ও খোদাই খেদমতগারের নেতৃবৃন্দদের জেলে পুরে দেয়া হয় সেখানে তারা বিনা বিচারে ৬ বছর কারাবাস করেন। এ হল সংক্ষেপে পাঠান মুল্লকের পাকিস্তানে যোগ দেয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। অবশ্য সেখানে এখন কংগ্রেস সমর্থিত খোদাই খেদমতগাঁর পার্টির প্রভাব নাই বললেই চলে। তারা এখন পাকিস্তানের শক্তিশালী সমর্থক।

এদিকে ভারতীয় সমস্যা সমাহিত হয়ে যাবার কারণ সংখ্যালঘুদের সাম্প্রদায়িকতা নয়, বরং সংখ্যাগুরু হিন্দুদের সাম্প্রদায়িকতা। ১৯৩৭ সনে হিন্দু মহাসভার সভাপতি সাভারকার ঘোষণা করেছিলেন ভারতবর্ষকে আজ এক অবিভাজ্য ও সুসংহত জাতি মনে করা যায়না। পক্ষান্তরে এ দেশে প্রধানতঃ দুটি জাতি। হিন্দু ও মুসলমান। ১৯৩৯ সনে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভার সম্মেলনে তিনি এই দ্বিজাতি তত্ত্বের কথা আরও জোর দিয়ে বললেন। সেই সাম্প্রদায়িক হিন্দু সভার কথা আজ কংগ্রেসই বাস্তবায়ন করতে লাগল। এ বিষয়ে এক কালের কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মাওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন—I was surprised that Patel was now an even greater supporter of the two Nation theory than Zinnah. Zinnah may have raised the flag but now the real flag bearer was Patel : India wins freedom p. 201. by Moulana Abul Kalam Azad.

প্যাটেলকে জিন্নার চেয়েও অধিকতর দ্বিজাতি তত্ত্বের সমর্থক দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। জিন্নাহ এই তত্ত্বের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন বটে কিন্তু এর প্রকৃত বাহক ছিলেন প্যাটেলই।

ক্ষমতার লোভ কত ভয়ংকর জিনিষ তার রঙ্গীন স্বপ্নে বিভোর আজ ভারতীয় কংগ্রেস। যদি কংগ্রেস আর একটু ধৈর্য ধরতে পারত তা হলে ভারতবর্ষের দুর্ভাগা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ছিন্ন মূল নরনারীর এ করুণ দুর্ভাগ্য হতো না। কিন্তু ক্ষমতার মোহে নেহেরু প্যাটেল এবং তাদের বন্ধুগণ নাকের ডগায় ঝুলতে থাকা মাউন্ট ব্যাটেন প্রদত্ত গাজর খণ্ডের লোভ সংবরণ করতে পারলেন না। ওটা তারা

গোগ্রাসে গিলে ফেললেন। পরবর্তীকালে বৃটিশ ভাষ্যকারের এক প্রশ্নের উত্তরে বেশ খোলাখুলি ভাবেই বলেছিলেন নেহেরু। আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। বয়সও হয়েছিল। আমাদের মধ্যে খুব কম লোকেরই আবার বন্দী জীবন সহ্য হতো। অথচ অবিভক্ত ভারত চাইতে গেলে ওটা ছিল অপরিহার্য।

পাঞ্জাবে দাঙ্গা হাঙ্গামা লেগেই ছিল। রোজই শুনছিলাম মানুষ হত্যার কাহিনী। এ অবস্থায় ভারত বিভাগ পরিকল্পনা মুক্তির পথ দেখাল, আমরা তাই মেনে নিলাম। দি লাস্ট ডেজ অব বৃটিশ রাজ পৃঃ ২৮৪ ও ৮৫ এর কিছু উদ্ধৃতি।

পাছে ভারতবাসীরা দুঃখ পায় সেই কারণে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সরকারী দলিলপত্র প্রকাশ হবে ভারতের স্বাধীনতার ৫২ বছর পর– ১৯৯৯ সালে। সেদিন সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেউই বেঁচে থাকবে না। 'offical documents dealing with the transfer of powers in India will not be officially released until 1999' (Leonard-Mosley)

জাতিগত বিরূপতা থেকে জন্ম হয় জাতিগত ঘৃণা। জাতিগত ঘৃণা থেকে জন্ম নেয় অন্ধ জাতিগত বিরোধ ও শত্রুতা– শুধু মুখের মিষ্টি কথা দিয়ে তাকে দূর করা যায় না। সেই পুঞ্জীভূত অসন্তোষের মধ্যে সম্প্রীতির সেতু বন্ধন গড়ে তোলার মত অন্তরের ঐশ্বর্যবান এমন কোন নেতাকে ভারতবর্ষে দেখা গেলনা। এক মাত্র বোধহয় নেতাজী সুভাষ বসুই তা পারতেন কিন্তু কালের নির্মম আঘাতে তিনি যেন কোথায় হারিয়ে গেলেন। দুর্ভাগ্য শুধু বাঙ্গালীরই নয় সারা ভারত উপমহাদেশের।

১৮ই জুলাই বৃটিশ সরকারের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হলো বিলেতের পার্লামেন্ট ভবন থেকে। আগামী ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ সন ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হবে। As from the 15th day of August Ninteen hundred and forty seven, Two independent dominions aus shall be set up in India, to be known respectively as India and Pakistan.

ভারতে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

বিলেতের পার্লামেন্টে এই ঘোষণার পরে যখন নিশ্চিত হয়ে গেল যে ভারত ও পাকিস্তান দুটি দেশ ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্টের পরে স্বাধীন হবে, তখন হিন্দু মুসলিম ও শিখের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা পাঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ দিল্লী ও বিহারে এরূপ দুঃসহ হয়েছিল যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

সরকারী হিসেবে নিহত হয়েছিল ৬ লক্ষ। গৃহহারা হয়েছিল ১ কোটি ৪০

লক্ষ। নারী ধর্ষিত হয়েছিল ১ লক্ষ। যদিও বাস্তব ঘটনা এর চেয়ে অনেক বেশী ছিল। ধর্মান্তরিত হয়েছিল যে কত বা নীলামে যে কত মেয়েকে বিক্রী করা হয়েছিল তার কোন সঠিক হিসেব পাওয়া যায়নি। পাঠকগণ উপরোক্ত সংখ্যা থেকে বুঝতে পারবেন যে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কত বিস্তারিত ও ভয়াবহ হয়েছিল।

সামরিক বাহিনী যদিও ক্যান্টনমেন্টে থাকে এবং ক্যান্টনমেন্ট শহর বন্দর থেকে একটু দূরে থাকে এবং যদিও তারা মিলিটারি ট্রেনিং দ্বারা আইন ও শৃংখলা রক্ষা করার জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ, তবুও মনে রাখতে হবে সামরিক বাহিনীর লোকদের তাদের পরিবার পরিজন ও সমাজের সাথে তাদের নাড়ির টান আছে। দেশের বৃহত্তম মানবগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্খা, আবেগ ও বিবেক যাহাই করতে চায় সামরিক বাহিনীর মধ্যেও তা বহুলাংশে প্রতিফলিত হয়।

ভাইসরয় লর্ড লুই মাউন্ট ব্যাটেন ভেবেছিলেন যে, তিনি সামরিক বাহিনী, কামান বন্দুক ট্যাংক ও এয়ারোপ্লেন দ্বারা এই আসমুদ্র হিমাচল দাঙ্গা হাঙ্গামা সামরিক ভাবে স্তব্ধ করতে পারবেন এবং তিনি সে ভাবে চেষ্টাও করেছিলেন। মাউন্ট ব্যাটেন রিফিউজি পরিবাহিত রেলগাড়িতে (গার্ড) পাহারা দেয়ার জন্য কামান, বন্দুক, ছাড়াও আর্মার্ডকার ও ট্যাংকবাহী সামরিক বাহিনীর লোক নিয়োজিত করেছিলেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগ্রস্থ এলাকার উপর দিয়ে হেলিকপ্টার বিমান বাহিনীর প্রেটোলের ব্যবস্থা করেছিলেন– কিন্তু তাতে কোন ফলোদয় হলো না। মুসলমান সামরিক বাহিনী তাদের এলাকাতে হিন্দু ও শিখ হত্যা করতে লাগল। আবার হিন্দু ও শিখ সামরিক বাহিনী সুযোগ পেলেই মুসলমানদের উপর নারকীয় অত্যাচার চালাত। এই নিষ্ঠুর হত্যা ও অমানবিক ক্রিয়াকাণ্ডে শিখ সম্প্রদায় ছিল দাঙ্গাকারী হিশেবে অগ্রগামী।

যা হোক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সিদ্ধান্ত নিল হিন্দু মুসলমান ও শিখেরা অপশন (option) দিয়ে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান যার যার মনঃপুত দেশে চলে যাবে। এতে দেখা গেল যে অবিভক্ত ভারতের প্রায় চার ভাগের এক ভাগ সামরিক বাহিনী পাকিস্তান চলে গেল আর তিনভাগ ভারতে রয়ে গেল। তারা যার যার দেশে ফিরে গিয়ে সামরিক বাহিনী পুনর্গঠিত করতে লাগল। মাউন্ট ব্যাটেনের প্রাথমিক পরিকল্পনা সামরিক বাহিনীকে অবিভক্ত রাখা সম্পূর্ণ অকেজো প্রমাণিত হলো। পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান সরকারের অনুমতি ক্রমে একটি সম্মিলিত ত্রাণ কমিটি আমি বলব যে সব ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নারীকে জোর পূর্বক পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানে রেখে দেওয়া হয়েছিল তাদের আইন প্রয়োগে উদ্ধার করে যার যার

দেশে আপন লোকদের নিকট সরকারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয়া তাদের কাজ ছিল। এই সংস্থার মধ্যে হিন্দু-শিখ ও মুসলিম অফিসার ও জোয়ানরা একত্রে কাজ করতেন। দেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পরেও বেশ কয়েক মাস যাবত এই নারী উদ্ধার কার্য চলতে ছিল।

ভাগ্য বিড়ম্বনায় পড়ে কিছু কিছু নারী হয়ত অন্য সম্প্রদায়ের লোকের হাতে বন্দী জীবন না কাটিয়ে শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে দেহ উপভোগ করতে না দিয়ে হয়ত বিবাহিত জীবন এবং ধর্মান্তর করাই শ্রেয় মনে করেছিল।

এরূপ একটি পরিবারের করুণ কাহিনী উদ্ধৃত করা হলো ঃ

দিল্লীতে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাস খবর পেল যে পাঞ্জাবে কোন একটি গ্রামে একজন মুসলমান মহিলাকে শিখেরা জোর করে রেখে দিয়েছে। পাকিস্তান দূতাবাসের অনুরোধে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান সরকারের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী কাজ করার লক্ষ্যে হঠাৎ একদিন ভারতীয় ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ ও ঐ ত্রাণ সংস্থার সামরিক বাহিনী নিয়ে ঐ গ্রামের বাড়িতে হাজির হলো। স্বাভাবিক ভাবেই ঐ বাড়ির শিখ পুরুষেরা ঐ মহিলাকে হস্তান্তর করতে রাজী হলো না– মহিলাটিও উভয় সরকারের লোকদের বুঝাতে গেল যে সে এতদিনে এই উদ্ভুত নতুন পরিবেশে শিখ পরিবারের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে এবং ঐ শিখ পরিবারের এক যুবকের সাথে তার বিবাহ সুসম্পন্ন হয়েছে। সে কিছুতেই পাকিস্তানে যেতে রাজী হলো না। হয়ত তার মনের কোনো সন্দেহ ছিল যে এতদিন শিখ পরিবারের সাথে বসবাস করার পর তার মত একটি যুবতী মেয়েকে আর মুসলিম সমাজে তার ভাই ব্রাদারেরা গ্রহণ করবেনা। কিন্তু উভয় সরকারের লোক কোন বাধা বিঘ্ন মানল না তাদের আবেগের দিকে ভ্রুক্ষেপও করলনা। জোর করে মহিলাকে মিলিটারী ট্রাকে তুলে পাকিস্তান বর্ডারের দিকে রওনা দিল। এ মহিলার শিখ স্বামী কাঁদতে কাঁদতে ট্রাকের পাশে পাশে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার পর ট্রাকের পিছে পড়তে পড়তে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর ও দিকে ঐ মহিলা তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কাঁদছিল আর স্বামীকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল যে যেভাবেই হোক সে স্বামীর বাড়িতে ফিরে আসবেই।

কয়েকদিন অপেক্ষা করেও যখন ঐ শিখ যুবক তার স্ত্রীর কোন সন্ধান পেলনা তখন একদিন সীমান্ত অতিক্রম করে লাহোর শহরে তার স্ত্রীর মুসলমান বাপের নূতন বাড়িতে এসে হাজির। স্বামী স্ত্রী উভয়ই ভারতে স্বামীর বাড়িতে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব দেওয়ায় ঐ মহিলার কর্তৃপক্ষ ভাই ব্রাদারেরা এই প্রস্তাবে কিছুতেই রাজী হলো না। শিখ যুবক কয়েকদিন চেষ্টা করে ঐ পরিবারের

কাউকেও তার প্রস্তাবে রাজী করাতে পারল না। এমনকি শেষের দিকে ঐ মহিলার সাথে একটু দেখা করা ও কথা বলারও সুযোগ ঐ শিখ যুবককে দেওয়া হতো না।

একদিন খবরের কাগজে দেখা গেল যে লাহোর রেলষ্টেশনের নিকট একটি শিখ যুবক রেলগাড়ীতে কাটা পড়ে মারা গেছে। মৃত ব্যক্তির ফটোও খবরের কাগজে ছাপা হলো। ক্রমে ক্রমে ঐ মুসলিম মহিলার সাথে ঐ মৃত শিখ যুবকের বিচ্ছিন্ন প্রেমের কাহিনী রাষ্ট্র হয়ে পড়ল। দলে দলে লাহোরের মুসলিম মহিলা ও যুবতীরা ঐ শিখের সমাধিস্থলে গিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে লাগল। ইতিহাস বিখ্যাত আনারকলির মত প্রেমের দিক দিয়ে এই ছোট সত্য কাহিনীটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশ ভাঙ্গা গড়ার মধ্যে বহু মানুষের হৃদয়ও যে ভেঙ্গেছে তার খবর ক'জনে রাখি।

বিভাজিত ভারত

ভারতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, আকালি দল প্রভৃতি হিন্দু-মুসলিম দ্বি-জাতি ভিত্তিক পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্র কায়েম করতে তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড লুই মাউন্ট ব্যাটেনের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। এই মূল নীতিকে যখন হিন্দু মুসলিম, শিখ নেতৃবৃন্দ স্বীকৃতি দিলেন তখন ভারতীয় কংগ্রেস হিন্দু মুসলিম সংখ্যা গরীষ্ঠতা অনুপাতে পাঞ্জাব বিভাজনের (বর্তমান ভারতীয় হরিয়ানা ও পুর্ব পাঞ্জাব প্রদেশ) প্রস্তাব দিলেন। এবং শেষ পর্যন্ত সকল পক্ষই সাবেক পাঞ্জাব বিভাজনে রাজী হলেন। তখন বৃহত্তর পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, নর হত্যা, লুণ্ঠন অগ্নি সংযোগ চরম তুঙ্গে। যার বর্ণনা দিতে এতো বছর পরেও শরীর শিউরে উঠে। যার ফলশ্রুতিতে আজ প্রায় উভয় পাঞ্জাবে সংখ্যা লঘু সম্প্রদায় নাই বললেই চলে।

এইভাবে কংগ্রেস হিন্দু-মুসলিম সংখ্যাগরীষ্ঠতার দিক দিয়ে বিবেচনা করে সাবেক বঙ্গদেশকেও বিভাজনের প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু এখানে বিভাজনের জন্য উৎসাহ পাঞ্জাবের মত অতো প্রকট ছিল না। কারণ মাত্র ৩৬/৩৭ বছর পূর্বে ১৯১১ সনে বহু আন্দোলন, ত্যাগ ও তিতিক্ষার ফলে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়েছিল। দ্বিতীয় কারণ হলো কলিকাতাবাসী বহু হিন্দু জমিদারদের বেশীর ভাগ জমিদারিই পূর্ব বঙ্গের ভাগে পড়েছিল। তাই আবার বঙ্গভঙ্গ হলে হিন্দু জমিদারদের লোকসানের সম্ভাবনাই অনেক বেশি ছিল। তৃতীয়ত ঃ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে (১৯০৫–১১) একভাষা, এক জাতি ও এক দেশ বঙ্গদেশ এর আন্দোলনের ঢেউ

তখনও বেশ শক্তিশালী ছিল। দেশের ভূগোল ও মানচিত্রে বঙ্গদেশই লেখা হতো। শুধু বঙ্গ বা বাংলা লেখা হতো না। 'দেশ' শব্দটি অপরিহার্য ভাবে, সাহিত্য ও ভাষায় সকল স্তরে বঙ্গদেশই ব্যবহার করা হতো। যার জন্য তখনকার জনগণের মনে সকল বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য অবিভক্ত বঙ্গদেশই 'দেশ' (Country) বলে চিহ্নিত হতো। হিন্দুরা বঙ্গমাতা বলে জয়ধ্বনি দিত। তখনকার দিনে ভারতকে একটি মহাদেশ বা উপমহাদেশ বলে গণ্য করা হতো। জনগণ বহু জাতিতে বিভক্ত ছিল। অবিভক্ত ভারতে আজকের মত এত শক্তিশালী জাতীয়তাবাদ ছিল না বললে তা অত্যুক্তি হবে না। শুধু বৃটিশ শাসনামলেই কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী (মাদ্রাজ) উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে ভারতের উত্তর অঞ্চলের আসাম, মনিপুর, নাগরল্যান্ড ও মিজোরাম কেন, সুদূর বৃহত্তর বার্মা দেশ বর্তমান মায়ানমার ও ভারত শাসনের অন্তর্ভূক্ত করে দিল্লী সরকারের অধীনে আনয়ন করেন। তাই বলে তারা কখনও এক জাতি হয়ে যাননি। মাত্র ১৯৩৭ সনে বার্মা ভারত থেকে পৃথক হয়ে গেল। তাই অবিভক্ত বাংলায় সকল মুসলমানরা চেয়েছিল বঙ্গ বা বাংলাদেশকে অবিভক্ত রাখতে– আর হিন্দুদের মধ্যে শ্যাম রাখি না কুল রাখি অর্থাৎ কেহ কেহ অবিভক্ত বাংলাদেশের পক্ষে ছিল আর উগ্র সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা চেয়েছিল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ বর্তমান পশ্চিমবাংলাকে আবার আলাদা করে স্বাধীন ভারতের সাথে যুক্ত করতে। মরহুম শেরেবাংলা, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাসেম, শরৎচন্দ্র বসু, নলিনাক্ষ সান্ন্যাল প্রভৃতি হিন্দু মুসলিম নেতৃবৃন্দ বসে স্থির করলেন যে বঙ্গদেশ অবিভক্ত ও স্বাধীন থাকবে। না ভারতে না পাকিস্তানে যোগ দিবে। এই প্রস্তাব নিয়ে মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মুসলিম লীগ নেতা মুহম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে দেখা করলেন। মিঃ জিন্নাহ তাদের প্রস্তাব অনুমোদন করতে রাজী হলেন। কিন্তু এও ভবিষ্যৎবাণী করলেন যে মিঃ গান্ধী ও কংগ্রেস এতে রাজী হবে না। শরৎ বসুর নেতৃত্বে একটি দল এই অবিভক্ত স্বাধীন বঙ্গের প্রস্তাব নিয়ে গান্ধীজী ও কংগ্রেসের সঙ্গে দেখা করে তাদের অনুমোদন না পেয়ে বিফল মনোরথ হয়ে চলে আসলেন।

অবিভক্ত স্বাধীন বঙ্গদেশের খসড়া প্রস্তাব সম্মন্ধে গান্ধীজীকে শরৎচন্দ্র বসু ২৩ শে মে ১৯৪৭ সনে লিখিত পত্রের জবাবে গান্ধীজী ৮ই জুনের লিখিত প্রতি উত্তরের কিয়দংশ নিম্নরূপ ঃ

I have gone through your draft. I have now discussed the scheme roughly with Pandit Nehru and Sarder Patel. Both of them are dead against the proposal.---- you should give up the struggle for unity of Bengal and cease

to disturb the atmosphere that has been created for the partition of Bengal.

এর অর্থ দাড়ায় ঃ

আপনার খসড়া প্রস্তাব আমি সম্পূর্ণ পাঠ করেছি। পণ্ডিত নেহেরু ও সর্দার প্যাটেলের সাথে প্রস্তাবটি সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করেছি– তারা উভয়ই প্রস্তাবটির ঘোর বিরোধী।

অখণ্ড বঙ্গদেশের চেষ্টা আপনার ত্যাগ করা উচিত। এবং বঙ্গভঙ্গের পক্ষে সৃষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বিনষ্ট করা হতে আপনি বিরত থাকুন।

শরৎচন্দ্র বসু এবং কিরণশংকর রায় এবং আরো অনেক স্বাধীন বঙ্গদেশ প্রিয় বাংলা ভাষাভাষী হিন্দু–মুসলমান সমবেতভাবে যুক্ত বাংলার স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করলেও দুর্ভাগ্য বাঙ্গালীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হলো গান্ধী নেহেরু প্যাটেলের মত অবাঙ্গালীর হাতে। বাঙ্গালী হিন্দুরা যতদিন মেড়ো বা অবাঙ্গালীদের খপ্পর থেকে বেরুতে না পারবেন ও আসামীদের মত, অবাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে না পারবেন ততদিন সকল বাংলা ভাষাভাষীদের এক স্বাধীন যুক্ত বাংলাদেশ শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে। ভারতীয় পশ্চিম বাংলা, মেঘালয় ও ত্রিপুরা রাজ্যের বাঙ্গালীরা কবে হিন্দী ছেড়ে মাতৃভাষা বাংলাকে ভালোবাসবে, কবে অবাঙ্গালীদের সেবা দাসত্ব ছেড়ে সকল বাংলা ভাষাভাষীদের এক মহাজাতির আসনে পৃথিবীর মানব জাতির মজলিসে এক স্বাধীন-সার্বভৌম মহা বাংলাদেশ কায়েম করতে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সাথে একত্রিত হয়ে পৃথিবীর জাতিপুঞ্জের আসনে (ইউ–এন ও) সুপ্রতিষ্ঠিত হতে কবে ভারতীয় বাংগালীরা এই চেষ্টা করবে এবং কে ভারতীয় বাঙ্গালীদের মধ্যে এই মহান ঐক্যের সংগ্রামে নেতৃত্বের ঝাণ্ডা তুলে ধরবে তার উপর সব কিছু নির্ভর করছে। আমরা সেই শুভ দিন ও মহান নেতার আগমনের জন্য ভারতীয় বাঙ্গালীদের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত হলো অবিভক্ত বঙ্গদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ হিন্দু মুসলিম আলাদা আলাদা বসে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন। কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের চাপে বঙ্গীয় আইন পরিষদের হিন্দু সদস্যবৃন্দ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, অবিভক্ত বঙ্গ ভঙ্গ হবে এবং হিন্দু মেজরিটি এলাকা ভারতের সাথে একটি প্রদেশ হিসেবে যোগ দিবে। অপর দিকে মুসলমান সদস্যরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যখন স্বাধীন বঙ্গদেশ গঠন করতে পারলেনইনা তখন তারা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বঙ্গদেশের অংশ (বর্তমান বাংলাদেশ) পাকিস্তানে যোগ দিবে। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বঙ্গদেশও পাঞ্জাবের মত দু'ভাগ হয়ে যথাক্রমে ভারত ও পাকিস্তানে সামিল হয়ে

গেল।

তারপরে আসাম প্রদেশের মুসলিম অধ্যুষিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সিলেট জেলার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের কথা। সেখানে এই ইস্যুতে গণভোট (রেফারেন্ডাম) হলো। তাতে দেখা গেল সিলেট ডিষ্ট্রীক পূর্ব পাকিস্তানের সাথে পাকিস্তানে সামিল হতে চায়, হলোও তাই, কিন্তু হলে কী হবে রেডক্লিফ নামক একটি বাউণ্ডারী কমিশন যা ভাইসরয় সীমান্ত নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন সেই রেডক্লিফ বাউণ্ডারী কমিশন সিলেট ডিষ্ট্রীকের পুরো করিমগঞ্জ সাবডিভিশনকে আসামের অর্থাৎ ভারতের সাথে যুক্ত করে দিলেন।

অপর দিকে হিন্দু মুসলমান সংখ্যানুপাতে খুলনা জেলা ভারতে ও মুর্শিদাবাদ জেলা পূর্ব পাকিস্তানে পড়ে গিয়ছিলো। কিন্তু দিল্লীতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সিদ্ধান্ত নেয় যে, মুর্শিদাবাদ জেলা ভারতে যাবে, এবং তার বিনিময়ে খুলনা জেলা পূর্ব পাকিস্তানে সামিল হবে। এবং হলোও তাই। ভারত বিভাজন ও বাংলাদেশ বিভাজনের মধ্য দিয়ে হিন্দু সম্প্রদায় প্রমাণ করল যে, অখণ্ড ভারত মাতা ও বঙ্গ মাতা একতার বুলি শুধু একটা ভাওতাই ছিল। তা না হলে কি করে নিজ হাতে কংগ্রেস ভারত জাতি ও বঙ্গ জাতিকে দ্বিখণ্ডিত করে! দ্বিতীয়তঃ প্রমাণ করল যে কংগ্রেসের মুখ্য উদ্দেশ্য আলাদা হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও আলাদা হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। অখণ্ড ভারত নয়। তৃতীয়তঃ হয়ত তারা মনে করেছে, যে অর্থনৈতিক কারণে পাকিস্তান রাষ্ট্র পরিকল্পনা বাস্তবে সম্ভব হবে না এবং অতি সত্বরই এটা ভারতের সাথে আবার যুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু হিন্দুদের এই ধারণা একান্তই ভুল প্রতিপন্ন হয়েছে। তার প্রমাণ যে পাকিস্তান আজ প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে শুধু কোন রকমে বেঁচে নাই– ভারতের মতো একটা বড় দেশের সাথে তিন তিনটা যুদ্ধ করেও তাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব অটুট রেখেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ভারতের সাথে পাল্লা দিয়ে টিকে আছে– ভারতের মুখেই শোনা যায় যে, পাকিস্তান নাকি এটম বোমাও তৈরি করেছে। তারা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে বিদেশেও রপ্তানী করছে। অন্যান্য উন্নতিমূলক কাজেও ভারতের পিছে নেই। খেলা ধূলায় কয়েকবার ভারতীয়দের হারিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। যেমন ক্রিকেট হকি স্কোয়াস। তা ছাড়া তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে ১৯৭২ থেকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে দুই দশকের উপর শুধু বেঁচেই নাই জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্প সাহিত্যে সকল দিক দিয়ে বহু উন্নতি করেছে। এবং বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকে বিশ্ব সমাজে (ইউনাইটেড নেশন) সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

'He (Mr patel) was also Convinced that the new state of Pakistan was not viable and could not last. He thought

that the acceptance of Pakistan also teach them (Muslim League) a bitter lesson. Paistan would collapse in a short time and the provinces which had seceded from India would have to face untold difficulty and hardship. Perhaps Sarder Patel hoped that they would be forced to return to India (page 225) India wins freedom by Moulana Abul Kalam Azad. এর অর্থ ঃ

'সে (মিঃ প্যাটেল) এ বিষয় নিশ্চিন্ত ছিলেন যে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান টিকে থাকবেনা এবং স্থায়ীও হবেনা, তিনি মনে করলেন যে পাকিস্তান সমর্থন করে মুসলিম লীগকে একটি অত্যন্ত তিক্ত শিক্ষা দিবে। পাকিস্তান অল্পকালের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যাবে। এবং যে সমস্ত প্রদেশ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাকিস্তানে এসেছে তাদের অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হবে। সম্ভবতঃ সরদার প্যাটেল ভেবেছিলেন যে তারা ভারতে ফিরে আসতে বাধ্য হবে' পৃঃ (২২৫) ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রিডম ঃ লেখক মাওলানা আবুল কালাম আজাদ।

এই চিন্তা শুধু প্যাটেলের একার ছিল না নেহেরু সহ ভারতের অন্যান্য বহু নেতাদেরও ছিল। আজ পাকিস্তান ও বাংলাদেশ প্রমাণ করে দিল ওদের ধারণা ভুল ছিল। এ দুটি দেশ ইন্‌শাআল্লাহ চির দিন বেঁচে থাকবে।

পাকিস্তানের জন্ম

১৪ই আগষ্ট ১৯৪৭ সন। তদানীন্তন পাক ভারত উপমহাদেশের জন্য এক মহা স্মরণীয় দিন। ঐ দিন অবিভক্ত বৃটিশ ভারতের শেষ ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল লর্ড লুই মাউন্ট ব্যাটেন পাকিস্তানের নব নির্বাচিত রাজধানী করাচিতে গিয়ে স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নিকট স্বাধীন পাকিস্তানের ক্ষমতা অর্পণ করেন। আস্তে আস্তে বৃটিশ রাজদণ্ডের প্রতীক বৃটিশ ইউনিয়নের পতাকা চিরতরে স্বাধীন পাকিস্তানের ভূমি হতে চিরনমিত ও চির বিদায় নিল। আর সেখানে উদিত হলো স্বাধীন পাকিস্তানের নব দিগন্তে নবোদিত চাঁদতারা খচিত পাকিস্তান ঝাণ্ডা। পূর্ব পাকিস্তানের টেকনাফ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের তুরখাম পর্যন্ত এক মহা উৎসাহ উদ্দীপনার ঢেউ বয়ে গেল। সকল গৃহহারা, বাস্তহারা সেদিনের জন্য স্বাধীনতার আনন্দে তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা ভুলে গেল। ১৯৪৩ সনে যদি ভারতীয় কংগ্রেস ও হিন্দু নেতৃত্ব রাজা গোপালাচারের প্রস্তাব মেনে শান্তি পূর্ণভাবে এই পাকিস্তান প্রস্তাব মেনে নিতেন তা হলে হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের

এই চরম অবনতি, অভূত পূর্ব হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নরহত্যা, লুঠ, অগ্নি সংযোগ ও মহিলাদের উপর নিগ্রহ হতোনা। ভারতও দু'টুকরা হত না।

স্বাধীন ভারতের জন্ম

পঞ্জিকা অনুসারে পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার একদিন পরে ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ সনে প্রায় দুই শত বৎসর ইংরেজের নিকট পরাধীনতার পরে ভারত স্বাধীন হলো। সেদিন মহাধূমধামে রাজকীয় পরিবেশে অবিভক্ত ভারতের শেষ ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল লর্ড লুই মাউন্ট ব্যাটেন ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ সন সরকারী ভাবে বৃদ্ধ দূর্বল বৃটিশ রাজ সিংহের পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে ভারতীয় স্বাধীনতার প্রতীক অশোক চক্র খচিত ত্রি বর্ণের পতাকা উত্তোলন করে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও গৃহহারা বাস্তুহারা জনগণসহ আপামর বৃদ্ধ বনিতা জনসাধারণ শত শত বছর মোঘল-পাঠান ও বৃটিশের গোলামীর পরে স্বাধীনতা পেয়ে আসুমদ্র হিমাচল পর্যন্ত স্বাধীনতার আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছিল। কংগ্রেস ও এই বিরাট ভারতীয় জনসাধারণের আনন্দের মধ্যে একটি বড় কারণ হলো যে পাকিস্তান রাষ্ট্র বাদ দিয়ে যে ভারত ভূমি আজ স্বাধীন হলো, এতবড় রাষ্ট্র কোন ভারতীয় হিন্দু আমলে ছিল না। তাই বৃটিশ আমলে তারা ভারত মাতা বলে যতই জোরে শোরে চিৎকার দিকনা কেন সময় ও সুযোগ মত নিজ হাতে ছুরি দিয়ে ভারত মাতাকে দ্বিখণ্ডিত করতে একটুও ইতস্তত করল না। এত শত বৎসর মুসলমান ও ইংরেজদের গোলামী করার পর সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত হিন্দু গণমনে রাজ্যহারা মুসলমানের চেয়ে হিন্দুরা একটু বেশী আনন্দ উপভোগ করেছিল। আর একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্যনীয় বলে আমার প্রতীয়মান হয় যে, বিশেষ করে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর ও বর্ণ হিন্দুদের সাহায্য ও সহায়তায় যে ইংরেজ রাজত্ব ১৭৫৭ সনে ভারতের বুকে কায়েম হয়েছিল তাদেরই সাহায্য ও সক্রিয় সহযোগিতায় ইংরেজ জাতি শুধু ভারত বর্ষে নয়, এশিয়া মহাদেশের চারদিকে বিস্তার লাভ করেছিল, সেই ইংরেজ রাজ্যের সাহায্য ও সহযোগিতায় আই সি, এস মিঃ হিউমের দ্বারা ইংরেজ রাজ্য ১৮৮৫ সনে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেছিল সেই ইংরেজ শেষ ভাইসরয় লর্ড লুই মাউন্ট ব্যাটেন দ্বারা রেফারেণ্ডামে সিলেট ডিষ্ট্রীক্ট পাকিস্তান পেলেও ভারতের যাতায়াতের সুবিধার জন্য, ভারতীয় সরকারকে খুশী করার লক্ষ্যে সেই ইংরেজ ভাইসরয় করিমগঞ্জ সাবডিভিশনকে রেডক্লিফ বাউণ্ডারী কমিশন দ্বারা ভারত বর্ষের সামিল করেছিল। ভারত উপমহাদেশের উত্তরাঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরের সাথে যোগাযোগ সাধনের

সুবিধার জন্য, ভারত সরকারকে খুশী করতে সেই মাউন্ট ব্যাটেন যুক্ত পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলাকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কেটে রেডক্লিফ বাউণ্ডারী কমিশন দ্বারা ভারতের অন্তর্ভূক্ত করা হলো। সেই শেষ ইংরেজ ভাইসরয়কে কি এত সহজে ভোলা যায়? তাকে ও বৃটিশ রাজকে খুশী করার জন্য একজন স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নাগরিককে প্রথম গভর্ণর জেনারেল না করে বরং আরো কিছুদিন বৃটিশের গোলামী করবার খুশীতে ভারতে বৃটিশ রাজের শেষ প্রতিনিধি বৃটিশ সন্তান লর্ড লুই মাউন্ট ব্যাটেনকে স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল করে আরও কিছুদিন বৃটিশের সেবা দাস প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ করা হলো। আরও কিছু কারণ থাকতে পারে যে, প্রায় হাজার বছর মুসলমান ও খৃষ্টানের নিকট পরাধীন থেকে রাজ্য শাসনে ভারত তাদের আরও কিছু প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিল। তাই তারা মাউন্ট ব্যাটেনকে রাষ্ট্র শাসন বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ে ট্রেনিংয়ের জন্য প্রায় ১ বছর রেখে দিলেন– তারপর ভারতের কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ও প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুর সাথে লেডি মাউন্ট ব্যাটেনের একান্ত ঘনিষ্টতার কারণে হয়ত মাউন্ট ব্যাটেনকে আরও কিছুদিনের জন্য দিল্লীতে রাখা পণ্ডিত নেহেরু প্রয়োজন মনে করেছিলেন তাই স্বাধীন ভারতের ইংরেজ নাগরিক প্রায় ১ বছর ভারতের রাষ্ট্র প্রধানের কার্য পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলেন।

স্বাধীন ভারতের রাজধানী
দিল্লীর মুসলিম নিধন যজ্ঞ

প্রায় পাঁচ শত বছরের উপরে দিল্লী মোঘল ও পাঠানদের রাজধানী থাকাতে সেখানে বহু সম্ভ্রান্ত মুসলিম পল্লী গড়ে উঠেছিল। বহু পীর আওলিয়া যেমন হজরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া, খাজা কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী, এবং নাসিরউদ্দিন চিরাগ দেহলবী প্রমুখের পবিত্র দরগা শরীফ ও তার আশেপাশে মুসলিম জনপদ স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে উঠেছিল। তা ছাড়াও লোধী কলোনি, সব্জি মন্ডি, এবং সদর বাজার প্রভৃতি মুসলিম জনপদ প্রখ্যাত ছিল। গান্ধীজী ও দিল্লী সরকারের নাকের ডগায় ও চোখের সামনে এই সব মুসলিম জনপদ ও পবিত্র দরগা শরীফ এলাকায় স্বাধীনোত্তর মুসলিম নিধন যজ্ঞ চরম আকার ধারন করে। হিন্দু ও শিখ মিলিত গণবাহিনী দিল্লীর কংগ্রেস সরকারের নীরব দর্শকের ভূমিকা পালনে উৎসাহিত হয়ে জিলার পুলিশ ও সামরিক বাহিনী সদস্যরাও হিন্দু ও শিখ মিলিত গুণ্ডাবাহিনী মুসলিম নিধন যজ্ঞে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে লাগল। গান্ধীজীর নিজের হাতের তৈরী সরদার প্যাটেল, বম্বে শহরের এক অখ্যাত আইনজীবী আজ

দিল্লী সহ সারাভারতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কংগ্রেস নেতা সরদার প্যাটেল প্রমুখ দিল্লী থেকে মুসলমানদের বিশেষ করে গণ্যমান্য মুসলমানদের হয় নিধন নতুবা উৎখাৎ চেয়েছিলেন। তার প্রমাণ স্বরূপ নিম্ন লিখিত কোটেশনটি দেয়া গেলঃ "Gandhiji said (to Patel) that he saw Muslim of Delhi being killed before his own eyes. This was being done when his own Bollove Bhai was the Home Minister of the govt. of India and the responsible for mantaining law & order in the capital. Patel had not only failed to give protection of Muslims but he dismissed light heartedly any complaint made on this account. Gandhiji said that he had now no option but to use his last weapon, namely to fast until the situation changed. Accordingly he began his fast on 12th January 1948. In a sense the fast was directed against the attitude of Sarder Patel, and Patel knew that this was so, page 235 (India wins freedom by Moulana Abul Kalam Azad.)

গান্ধীজী (প্যাটেলকে) বলেছিলেন যে তিনি স্বচক্ষে দিল্লীর মুসলমানদের নিহত হতে দেখেছেন। এটা করা হয়েছিল যখন তার নিজস্ব–মানুষ বল্লভ ভাই প্যাটেল ভারতীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন। এবং রাজধানীর শান্তি শৃংখলা রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন। প্যাটেল শুধু মুসলমানদের রক্ষা করতেই ব্যর্থ হননি বরং এ বিষয়ে কোন অভিযোগ আসলে তিনি তা হালকা ভাবে দেখতেন। গান্ধীজী বললেন যে এখন তার একমাত্র শেষ অস্ত্র অনশন-এর আশ্রয় নিতে হবে– যে পর্যন্ত পরিস্থিতির পরিবর্তন না হয়। তদনুযায়ী তিনি ১৯৪৮ এর ১২ই জানুয়ারী অনশন শুরু করেন, এক কথায় অনশন ছিল সরদার প্যাটেলের মনোভাবের বিরুদ্ধে। এবং প্যাটেল এটা জানতেনও (পৃ: ২৩৫, ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম : মাওলানা আবুল কালাম আজাদ)

Sarder Patel এবং তার পরিবার বর্গ যে সরদার শব্দটি বহন করে গর্বিত সেই সর্দার উপাধিটি মুসলমান শাসকদের দেয়া সেই মুসলমানদের দেয়া। সরদার উপাধিটি বহন করেই প্যাটেলজি পর্দার আড়াল থেকে মুসলিম নিধন যজ্ঞে নেতৃত্ব বা সর্দারি করেছিলেন। এর চেয়ে বড় নিমকহারামী বা বিশ্বাসঘাতকতা কী হতে পারে?

গান্ধীজী যে শুধু মুসলমানদের মহব্বতে দিল্লীতে এই মুসলিম নিধন যজ্ঞে বাধা দিয়েছিলেন বা উপবাস ব্রত গ্রহণ করেছিলেন তা নয়, দিল্লী ভারতের রাজধানী

বিধায় পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দূতগণ দিল্লী শহরে অবস্থিত– তাদের সকলের চোখের সামনে এবং বি, বি, সি ও ভয়েস অব আমেরিকার মতন সকল সংবাদ প্রেরণের মাধ্যমগুলোর চোখের সামনে ভারতের সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত কংগ্রেস সরকারের চোখের সামনে এই বৃহৎ আকারে মুসলিম নিধন যজ্ঞ নিশ্চয়ই কংগ্রেস সরকারের অপারগতার বদনাম বয়ে আনবে। এই সম্ভাব্য বদনামের আশঙ্কাও গান্ধীজীর মনে বেশ আঘাত এনেছিল। তা ছাড়া গান্ধীজীর অহিংসা মন্ত্রের ডাক যে তার জীবদ্দশায় চোখের সামনেই এভাবে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার মাধ্যমে প্রত্যাখ্যাত হবে তার আঘাতও গান্ধীজীর মনে কম লাগেনি। তা হয়ত প্যাটেলের পাষাণ মনে মোটেই বোধগম্য ছিল না। তাই এইসব কিছু মিলিয়ে এই মুসলিম গণহত্যা, লুন্ঠন, অগ্নি সংযোগ, নারী অপহরণ ইত্যাদি তাড়াতাড়ি বন্ধ করার জন্য গান্ধী শেষ অস্ত্র উপবাস শুরু করেছিলেন।

সরদার প্যাটেল সমর্থিত ভারতীয় কংগ্রেস সদস্য হিন্দু মহাসভা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকসংঘ খোলাখুলি ভাবে উপরোক্ত কারণে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে বলাবলি করতে হ্যাণ্ডবিল ও প্যাম্পলেট বিলি করতে লাগল। এই উপবাস ভঙ্গের পর দিল্লীর বিড়লা ভবনে দেয়ালঘেরা মাঠের মধ্যে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় একটি বোমা ফাটিয়ে গান্ধীজীকে তার তথাকথিত মুসলিম প্রীতি বন্ধ করার জন্য প্যাটেল সমর্থিত মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দুগণ হুঁশিয়ার করে দিল কিন্তু আশ্চর্য গান্ধীজীর নিজ হাতে সৃষ্ট ভারতীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এককালে অপাংক্তেয় সর্দার প্যাটেল এই বোমা হামলার বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য, পুলিশ এনকোয়ারি ত করলেনই না, গান্ধীজীর জীবন রক্ষার জন্য, ভবিষ্যৎ সাবধানতা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে প্যাটেল কোন পদক্ষেপই নিলেন না। এই সুযোগে ১৯৪৮ সন ৩০শে জানুয়ারি গান্ধীর বৈকালিক প্রার্থনা সভায় নাথুরাম গডসে নামক প্যাটেলের বম্বে প্রদেশের এক মারাঠী যুবক অতি নিকট থেকে গুলি করে গান্ধীজীকে হত্যা করেন। এইভাবে অহিংসা মন্ত্রের প্রবক্তা তার স্বদেশের স্বজাতির স্ব-ধর্মের হিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত লোকের হাতে মৃত্যুবরণ করলেন। আমরা গান্ধীজীর পথ ও মতে দীক্ষিত না হলেও এই নিষ্ঠুর অপমৃত্যুর জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করছি।

সারা ভারতবাসী যখন গান্ধীজীর এই অপমৃত্যুতে গভীর দুঃখে নিমজ্জিত তখন ভারতীয় কোন কোন শহরের জনগণ গান্ধীজীর মৃত্যুতে আনন্দ উৎসবে মিষ্টি বিতরন করেছিল। তা কংগ্রেসের এককালের প্রেসিডেন্ট পণ্ডিত নেহেরুর মন্ত্রী সভার সদস্য মাওলানা আবুল কালাম আজাদের মুখেই শুনুন ঃ But in a few towns people distributed sweets and held celebrations as mark of joy. This was said especially of the towns of Goalior and Joypur.... Some women from respectable families sent him a swetter. They had knitted for him

(Nathuram Godsy) There was also a movement for his (Nathuram's) release. কিন্তু কিছু সংখ্যক শহরে জনগণ মিষ্টি বিতরণ ও উৎসব পালন করেছিলেন। এটা বিশেষভাবে গোয়ালিয়র ও জয়পুর শহরের জন্য বলা যেতে পারে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের কিছু কিছু মহিলা তার জন্য (নাথুরাম গডসের) তাদের নিজের হাতের বোনা সোয়েটার তাকে পাঠিয়েছিলেন। তা ছাড়া তার (নাথুরামের) মুক্তির জন্যও আন্দোলন হয়েছিল। (পৃঃ ২৩৫, ইণ্ডিয়া উইনম ফ্রিডম-মাওলানা আবুল কালাম আজাদ)

মাউন্ট ব্যাটেনের অবদান

ইংরেজ সন্তান মাউন্ট ব্যাটেনকে স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল বা ভারতের রাষ্ট্রপতির পদে রাখাতে মাউন্ট ব্যাটেন ভারত সরকারের যে খেদমত করে গেলেন তা কোন ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব হতো না বলে আমার ধারণা। তার রাষ্ট্রপতি থাকা কালে সিলেটের করিমগঞ্জ সাবডিভিশন ও পাকিস্তানের গুরুদাসপুর জেলা রেডক্লিফ বাউণ্ডারী কমিশনের মারফত ভারতে সামিল করার চেয়েও তিনি যে বড়ো কাজ করেছেন তা হলো ত্রিপুরা রাজ্য ভারতের সামিল করা। যেহেতু ত্রিপুরা রাজ পরিবার ও জনগণ বাংগালী এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সাবেক বৃহৎ কুমিল্লা জেলার মধ্য দিয়েই জনগণের গমনাগমনের ও ব্যবসা বাণিজ্যের একমাত্র পথ, তাই এই সব বিষয়ে বিবেচনা করে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ পরিবার পাকিস্তানে সামিল হবার মানসে ত্রিপুরা রাজ্যের দেওয়ান সাহেবকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকাতে তদানীন্তন প্রাদেশিক সরকারের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের নিকট প্রেরণ করেন। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী নাজিমুদ্দিন না পারলেন ত্রিপুরা রাজ্যকে পূর্ব পাকিস্তানে সামিল করার দলিল দস্তাবেজে সই করাতে, না পারলেন দেওয়ান সাহেবকে পাকিস্তানের রাজধানী করাচীতে গভর্ণর জেনারেল কায়েদে আজমের নিকট প্রেরণ করতে। কিছুদিন ঢাকাতে অবস্থানের পর ত্রিপুরা রাজ্যের দেওয়ান সাহেব বিফল মনোরথ ও বিরক্ত হয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলাতে চলে যান। তখন আগরতলার পাকিস্তানে সামিল হওয়ার এই গোপন প্রচেষ্টা দিল্লী সরকারের নিকট ফাঁস হয়ে যাওয়াতে অনতি বিলম্বে মাউন্ট ব্যাটেনের নির্দেশে আসাম থেকে কিছু সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনী জোর করে ত্রিপুরা রাজ্য জবর দখল করে নেয়। এবং ভারতের অন্তর্ভূক্ত করে প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজে সই করানো হয়।

পশ্চিম ভারতের জুনাগর ও মানভাদর রাজ্য মুসলিম নবাব শাসিত ছিল।

যেহেতু সাগর পথে করাচীর সাথে এই রাজ্যের যাতায়াতের সুবিধা সে জন্য মুসলিম নবাব শাসিত হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এই রাজ্যের সরকার পাকিস্তানে যোগ দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সর্বাধিনায়ক বর্তমান ভারতের গভর্ণর জেনারেল বিদ্যুৎগতিতে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা এই রাজ্যটি জবর দখল করে নেয়। নবাব পরিবার কোন রকমে পালিয়ে করাচী গিয়ে জান বাঁচান।

এর পরে আসে হায়দারাবাদের নিযাম রাজ্যের পালা। যদিও ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার দলিলে সকল দেশীয় করদ ও মিত্ররাজ্যের ভারত ও পাকিস্তানের যে কোন একটা রাষ্ট্রে যোগ দেয়ার স্বাধীনতা রয়েছে, কিন্তু আগরতলা জুনাগর ও হায়দারাবাদ রাজ্যের কোনটিকেই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহারের সুযোগ দেয়া হয়নি। মাউন্ট ব্যাটেনের কূট বুদ্ধি ও সামরিক কৌশল একত্র করে এই ক্ষুদ্র দুর্বল রাজ্য গুলিকে জোর করে ভারতের সামিল করা হয়। কিন্তু বাধ সাধে ভারতের সর্ববৃহৎ সর্বাধুনিক শক্তিশালী নিযামের হায়দারাবাদ রাজ্য নিয়ে। হায়দারাবাদ রাজ্যের অধিপতিকে নিযাম বলা হতো। নিযাম চেয়েছিলেন হয় হায়দারাবাদ স্বাধীন থাকবে নতুবা পাকিস্তানে যোগ দিবে। এই দুটো প্রস্তাবই ভারত সরকার ও গভর্ণর জেনারেল মাউন্ট ব্যাটেনের মনঃপুত হয়নি। তাই মাউন্ট ব্যাটেন পূর্ণ মাত্রায় সামরিক আগ্রাসন করে হায়দারাবাদ রাজ্য দখল করার হুকুম দিলেন। সে মতে কয়েকদিন ধরে স্থলে ও আকাশে নিযামের সামরিক বাহিনী তাদের স্বাধীনতা রক্ষার শেষ চেষ্টা করেছিল। তারা অদম্য সাহস ও নিপুণতার সাথে যুদ্ধ করলে কী হবে। বহু গুণ বড় ও শক্তিশালী ভারতীয় সামরিক বাহিনী ও তার চেয়েও অধিক বড়ো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এককালীন দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সর্বাধিনায়ক ও গভর্ণর জেনারেল লর্ড লুই মাউন্ট ব্যাটেন। তার সাথে যোগ দিল নিযামের কিছু কিছু বিশ্বাস ঘাতক মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা। যদিও নিযাম ও তার সামরিক বাহিনী কিছু দিনের জন্য বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃটিশ রাজ্যের সৃষ্ট দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞ ও সুবিশাল ভারত বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হলেন। ভারত সরকার হায়দারাবাদ জবর দখল করেন। নিযামের অফুরন্ত ধনভাণ্ডার মনি মুক্তা ইত্যাদি নিযামের ষ্টেট থেকে দিল্লী সরকারের মাল খানায় স্থানান্তরিত করল। নিযামকে সামান্য ভাতা দিয়ে বিদায় দিল। হায়াদারাবাদ রাজ্যকে ভেঙ্গেচুরে পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিশেষ করে তামিলনাড়ুর সাথে মিলিয়ে দিল। তাই আজকে হায়দারাবাদ হলো তামিল নাড়ু রাষ্ট্রের রাজধানী। নিযামের হায়দারাবাদ রাষ্ট্রের নামও সীমারেখা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিল।

গোপন সূত্রে পশ্চিম পাকিস্তান সরকার জানতে পারল যে, পাকিস্তানের দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত রাজ্য বেলুচিস্থান ও ইরানের মধ্যবর্তী কালাত রাষ্ট্র অবস্থিত–যার অধিপতিকে কালাতের খান বলা হয়। কালাতের খান ভারতের সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্য জল্পনা কল্পনা করছেন। গোপন সূত্রে এই সব খবর পেয়ে দিল্লী সরকারের মতই পাকিস্তান সরকার ত্বরিৎ গতিতে বেলুচিস্থান থেকে সামরিক বাহিনী পাঠিয়ে কালাত রাজ্য দখল করে নেয়। তার পরে অবশ্য কালাতের খানকে দিয়ে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজ তৈরী করা হয় এবং কালাত রাজ্য পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারতে কালাতের যোগ দেয়া রোধ হয়। মাউন্ট ব্যাটেন অকৃতকার্য হয়।

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য

পাকিস্তান ও ভারতের উত্তর সীমানায় হিমালয় পর্বত এলাকায় অবস্থিত বিশাল জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য। ১৯৪১ সনের আদম সুমারী অনুযায়ী জম্মু ও কাশ্মীরের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৪০ লক্ষ। কাশ্মীরে শতকরা ৯২% এবং জম্মুতে প্রায় ৬০% শতাংশ মুসলমান অধিবাসী, কিন্তু এই মুসলিম রাজ্যের শাসক হলেন ডোগরা শিখ রাজা। এই রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান সামরিক দিক দিয়ে খুই গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর দিকে বিশাল মহাচীন। রাশিয়া ও আফগানিস্তান অতি নিকটবর্তী। তাই জম্মু ও কাশ্মীর ষ্টেটের সামরিক গুরুত্ব ভারত ও পাকিস্তানের উভয়ের নিকট খুব বেশী।

আল্লাহ যেন নিজ খুশীতে এই জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভূবন বিখ্যাত করে তৈরী করেছেন। এ জন্য একে ভূস্বর্গ বলা হয়। কাশ্মীরের বরফ ঢাকা সাদা ধবধবে পর্বত শৃংগ–চুনার প্রভৃতি সবুজ গাছে আবৃত পর্বতের পাদদেশ, মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র-বৃহৎ কয়েকটি হ্রদ যার মধ্যে রয়েছে ভ্রমণকারীদের ব্যবহার ও আনন্দের জন্য সুন্দর সুন্দর হাউস বোট, শিকারা (ছোট নৌকা) ও মটর ইঞ্জিন বিশিষ্ট স্পীডবোট। পৃথিবীর বহু দেশের বহু পর্যটক প্রতি বৎসর কাশ্মীরে আসেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও আনন্দ উপভোগের জন্য। পর্যটনই কাশ্মীরের রাজস্বের প্রধান উৎস।

জম্মু ও কাশ্মীর ষ্টেটের দক্ষিণেই অবস্থিত পাঞ্জাব ও ভারতের উত্তর প্রদেশ। সেখানে তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা তুঙ্গে। তার ঢেউ এসে পড়েছিল কাশ্মীর ষ্টেটের দক্ষিণে অবস্থিত পুনচ এলাকায়। বহু মুসলমান শরণার্থী কাশ্মীরের পুনচ্ এলাকায় জমায়েত হয়েছিল নিজেদের জান ও ইজ্জত বাঁচাবার জন্য। কাশ্মীরের

ডোগরা রাজ স্বভাবতই ভারতীয় শিখ ও হিন্দুদের সহমর্মী ছিলেন, তাই তিনি পুলিশ ও কাশ্মীর রাজার কিছু সৈন্য পাঠিয়ে পুনচ্ থেকে কিছু শরনণর্থীদের জুলুম ও মারাধোর করে তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিল। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের অন্যান্য এলাকার মুসলমান প্রজারা স্বভাবতই নিকটতম পাঞ্জাব, শিখরাজ্য, পাতিয়ালা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আগত মুসলিম উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিয়েছিল বলে ডোগরা শিখ সরকার তাদের উপরও খাপ্পা হয়ে জুলুমের শাসন চালাতে শুরু করেছিল।

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যেও শিখ ও হিন্দু সম্প্রদায় শিখ রাজার পুলিশ এবং সামরিক বাহিনী মিলে মুসলমানদের উপরে এই জুলুম ও অত্যাচারের কাহিনী পার্শ্ববর্তী উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও উপজাতীয় এলাকায় পাঠানদের নিকট পৌছতে দেরী হলো না। পাঠানেরা স্বভাবতই ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের উপর কোন রকম জুলুম বা অত্যাচার হয়েছে শুনলে ক্রোধে তাদের রক্ত টগবগ করে, তারা এক দুর্ধর্ষ সামরিক জাতি। তাদের ঘরে ঘরে নিজেদের রাইফেল পিস্তল ইত্যাদি আগ্নেয়াস্ত্র মজুদ থাকে। তাছাড়া উপজাতীয় এলাকায় রয়েছে অস্ত্র তৈরীর নিজস্ব কারখানা। বৃটিশ আমল থেকেই এই কারখানাগুলি অস্ত্রপাতি তৈরী করে থাকত। তাই এই দুর্ধর্ষ পাঠান উপজাতীয়রা ডোগরা রাজা, শিখ ও হিন্দুদের জুলুম থেকে মুসলিম ভাই বোনদের বাঁচাবার জন্য দলে দলে বিধর্মী ডোগরা রাজ্যের বিরুদ্ধে যেহাদ করে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য তৈরী হয়ে গেলেন। পাকিস্তান সরকারও হয়ত সীমান্ত পাঠানদের এই ধর্মযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে কিছুটা ইন্ধন জুগিয়েছিল। খুব সম্ভব এইসব সীমান্ত পাঠানের দল অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে (১৯৪৭ সন) কাশ্মীর রাজ্যে ঢুকে পড়ে! এই খবর পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ইংরেজ গভর্ণর পাকিস্তানের ইংরেজ সেনাধ্যক্ষকে টেলিফোনে জানিয়ে দেয়। নিমক হারাম ইংরেজ পাকিস্তান সেনা বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ অতি সত্ত্বর ভারতের ইংরেজ সেনাধ্যক্ষকে টেলিফোনে এই খবর জানিয়ে দেয়। ইত্যবসরে পাঠান মুজাহিদ বাহিনী কাশ্মীর রাজ্যের রাজধানী শ্রীনগরের ত্রিশ পঁয়ত্রিশ মাইলের মধ্যে ঢুকে যায়। কাশ্মীরের শিখ রাজা প্রাণভয়ে শ্রী নগর থেকে জম্মুতে আশ্রয় নেয় এবং ২৬শে অকটোবর ১৯৪৭ সন জম্মু ও কাশ্মীরের ডোগরা রাজা ভারতীয় গভর্ণর জেনারেল লর্ড লুই মাউন্ট ব্যাটেনের কাছে একটি পত্র লিখে জম্মু ও কাশ্মীরের আইন শৃংখলা রক্ষার অজুহাতে ভারতীয় সৈন্য পাঠাতে অনুরোধ করেন। এবং ঐ চিঠিতে তিনি ভারতে যোগ দিতে রাজী আছেন বলে প্রকাশ করেন। দিল্লী সরকারের তখন হায় হুতাশ লেগে গেছে– নেহেরু প্রভৃতি সকলে মাউন্ট ব্যাটেনকে ধরে শিখ রাজার ২৬শে

অকটোবরের পত্রানুযায়ী ঐ রাজ্য ভারতে সামিল করার জন্য অনুরোধ করলেন। যদিও মুসলমান প্রধান জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ভারতে যোগ দেয়া হিন্দু প্রধান জুনাগড় ও হায়দারাবাদ থেকে ব্যাতিক্রম ছিল তবুও মাউন্ট ব্যাটেন তার প্রকৃত প্রভু ভারতীয় সরকারকে খুশী করতে মহারাজার অনুরোধে কাশ্মীর রাজ্য ভারতে সামিল হওয়া মঞ্জুর করলেন। কিন্তু তার জবাবে শেষের দিকে লিখে দিলেন যে, 'The question of states accession shall be settled by a reference to the people অর্থ ঃ রাজ্যের সামিল হওয়ার প্রশ্ন গণভোটের মাধ্যমে মীমাংসিত হবে।

তারপরে শুরু হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সর্বাধিনায়ক নব্য স্বাধীন ভারতের ভাড়াটিয়া বিদেশী গভর্ণর জেনারেল মাউন্ট ব্যাটেনের সামরিক পরিকল্পনা— তাকে সাহায্য করছেন বিদেশী ইংরেজ ভাড়াটিয়া সামরিক সেনাধ্যক্ষগণ। মাউন্ট ব্যাটেনের হুকুম ভারতীয় বেসামরিক যাত্রী বাহিনীর সব বিমান ও ব্যাস ট্রাক রিকুইজেশন করে যে ভাবেই পারে ত্বরিৎ গতিতে কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য পাঠাতে শুরু হল।

কিন্তু ধর্মের নামে উদ্বুদ্ধ পাঠান মুজাহিদগণের নিকট দলে দলে ভারতীয় সৈন্য নিহত ও পরাজিত হতে লাগল। কিছুতেই পাঠান মুজাহিদদের অগ্রগতি থামানো গেল না। শ্রীনগর ও শ্রীনগরের এয়ারোড্রোম প্রায় পতনোন্মুখ।

পাঠান মুজাহিদদের কাছে ভারতীয় সুদক্ষ সামরিক বাহিনীর এ হেন নাকানি-চুবানি দেখে নেহেরু সরকার আর কোন উপায় না দেখে সোজা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের দরজায় দৌড়ে গেলেন এবং বাঁচাও বাঁচাও বলে ধর্না দিলেন। তখন নিরাপত্তা পরিষদ ভারতীয় অনুরোধে ২১শে এপ্রিল ১৯৪৮ সনে এভাবে রেজুলেসন পাশ করলেন—

Declaring that the only way to settle the Kashmir problem (Document S/7-6) peacefully was to demilitarise the state and held plebeside thereafter under the supervision and control of the United Nation in order to determine wheather the state desire to accede to India or Pakistan.

অর্থ ঃ ঘোষণা করা যাচ্ছে যে কাশ্মীর সমস্যার (দলিল–এস/৭)–৬ শান্তিপূর্ণ সমাধান নির্ভর করছে রাজ্যকে সেনাবাহিনী মুক্ত করে জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রণে এটি পাকিস্তানে যোগ দিবে না ভারতে যোগ দিবে তার জন্য গণভোট অনুষ্ঠান করা।

তারপরে যুদ্ধ থামল। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য দখল অনুযায়ী দ্বিখণ্ডিত হয়ে

পশ্চিম খণ্ড পাকিস্তানে, পূর্ব খণ্ড ভারতের দখলে চলে গেল। কিন্তু আজও আর গণভোট হলোনা। ভারত আরো তালবাহানা করে সময়ক্ষেপন করতে লাগল। শত চেষ্টা করেও জাতিসংঘ আজ পর্যন্ত কাশ্মীরে গণভোট করতে সক্ষম হলোনা।

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও হিন্দুদাঙ্গাকারীদের মিলিত অভিযানে প্রায় ৫ লক্ষ কাশ্মীরী মুসলমান শরণার্থী নিকটতম পাকিস্তান এলাকায় এসে ভীড় জমালো। দ্বিতীয়ত ভারতীয় সেনাবাহিনী জম্মু ও কাশ্মীর থেকে স্বাধীনতাকামী মুসলিম নাগরিকদের উচ্ছেদ করতে করতে পাকিস্তানের জাতীয় সীমান্তে ঢুকে পড়ার হুমকীর সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা হওয়ায় পাকিস্তান নিজ স্বাধীনতা রক্ষার অজুহাতে ১৯৪৮ সালে মে মাসে তার নিয়মিত সামরিক বাহিনী কাশ্মীরে ঢুকে পড়ল। এবং বর্তমান কাশ্মীর যুদ্ধ বিরতি রাখা পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ঠেকাবার জন্য অগ্রসর হলো। নানা অজুহাতে ভারতীয় সামরিক বাহিনী কিছুতেই কাশ্মীর এলাকা থেকে ভারতে ফিরে যেতে রাজী হলো না যদিও পাকিস্তান সরকার জাতিসংঘের প্রতিনিধির অনুরোধক্রমে সম্পূর্ণ পাঠান স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনী ফিরে না যাওয়ার অজুহাতে আজও কাশ্মীরে পাকিস্তান সেনা বাহিনী রয়ে গেল। ফল হলো আজ (১৯৯৩ সন) প্রায় চার দশকের উর্ধ্বে আজাদ কাশ্মীর নামে পাকিস্তানের অধিকৃত অংশ দখল করে আছে। জাতিসংঘ বহু চেষ্টা করেও আজ পর্যন্ত ভারতীয় সরকারকে দিয়ে উভয় দেশের সামরিক বাহিনী ফেরত নিয়ে স্বাধীন নিরপেক্ষ জাতিসংঘের প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে কাশ্মীর জনগণের অভিমত অর্থাৎ তারা ভারতে না পাকিস্তানে যোগ দিতে ইচ্ছুক জানা গেল না। মনে হয় বর্তমান যুদ্ধ বিরতি লাইন উভয় দেশ মেনে নিয়ে দুই বাংলাদেশের মতন দুই কাশ্মীর রাজ্য মেনে নিয়েছে।

ভারত সরকারের একগুঁয়েমির ফলে কাশ্মীরী জনগণ যখন তাদের স্বাধীন সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করতে পারল না তখন কাশ্মীরের জনগণ বিভিন্ন সময়ে ভারতের এই জবর দখলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সোচ্চার হলো। তা সত্ত্বেও ১৯৫০ সনে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে তথাকথিত গণভোটের মাধ্যমে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কাশ্মীরের গণপরিষদ সৃষ্টি করে ভারতের সাথে এই তথাকথিত গণপরিষদ দিয়ে ভারতে সামিল হওয়ার জন্য দরখাস্ত করা। ইতিমধ্যে নেহেরু সরকার গণভোটের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন এবং ভারতীয় গঠনতন্ত্র সম্প্রসারিত করে মে, ১৯৫৪ সনে জম্মু ও কাশ্মীর ষ্টেট ভারতবর্ষের মধ্যে সামিল করে।

এই নিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বহু বৈঠক হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুতেই কিছু না হওয়াতে ১৯৬৫ সনে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। তখন ভারতের প্রধান মন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আয়ুব খান। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। কিন্তু আল্লাহর রহমতে চট্টগ্রামের টেকনাফ থেকে আফগান সীমান্তের তুরখাম পর্যন্ত জনগণের একতা ও পাকিস্তান সেনা বাহিনীর দুর্ধর্ষ সাহসিকতার জন্য হিন্দুস্থান সামরিক বাহিনী পাকিস্তান সামরিক বাহিনী থেকে ৫ গুণ বড় হওয়া সত্বেও পাকিস্তানের এক ইঞ্চি ভূমিও দখল করতে পারেনি– যদিও ভারতীয় বাহিনী জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য থেকে বেশী জোড় দিয়েছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের পেটে অর্থাৎ লাহোর সেক্টরে আঘাত হানতে। তারা ভেবেছিল সেখানে সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত হেনে পাকিস্তানকে দ্বিখন্ডিত করে ফেলে তাকে পরাজিত ও পরাভূত করবে। কিন্তু তাদের সেই দুরাশা তিরোহিত করে দিল বাঙ্গালী বৈমানিক স্কোয়ার্ডন লীডার মোহাম্মদ আলম— যে একদিনে একই আঘাতে ভারতীয় বিমান বাহিনীর ১১ খানা বিমান ধ্বংস করে পৃথিবীর সকল যুদ্ধের রেকর্ড ভঙ্গ করে দিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জার্মান বিমান বাহিনীর একযোগে অসংখ্য এয়ারোপ্লেনে বৃটেন হামলা করলে রাজকীয় বিমান বাহিনীর কোন বৈমানিক এক আঘাতে ৫ খানার বেশী বিমান ধ্বংস করতে পারেনি। স্কোয়ার্ডন লীডার আলম এই বিশ্ব রেকর্ড করাতে আমরা বাঙ্গালীরা তো খুবই গর্বিত কিন্তু পাকিস্তানীরাও এই বিরাট ও অভাবনীয় সাফল্যে তাকে উপযুক্ত পদক ও পদোন্নতি দিয়েছিল।

তাছাড়া ইন্দো পাকিস্তানের স্বাধীনত্তোর আজ পর্যন্ত সবচেয়ে বড়ো ট্যাংক যুদ্ধ হয়েছিল শিয়ালকোট সেক্টরে যেখানে উভয় পক্ষ প্রায় হাজার খানেক ট্যাংক ব্যবহার করেছিল। ভারতীয় সেনাধ্যক্ষ যখন দেখতে পেল যে পাকিস্তানী সৈনিকগণ ডিনামাইট বুকে নিয়ে আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিয়ে প্রতিটি আগ্রাসী ভারতীয় ট্যাংকের নীচে শুয়ে পড়ে জান দিয়েও ভারতীয় ট্যাংক ধ্বংস করে দিয়েছে তখন অল্প সংখ্যক অক্ষত ট্যাংক বাহিনী নিয়ে পশ্চাদপসারণ করতে বাধ্য হলো।

এই ১৯৬৫ সনের যুদ্ধে খেমকারণ (ভারতীয় বিকানীর রাজ্যের পাকিস্তান বর্ডার থেকে প্রায় ১৫ মাইল ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি শহর) সেক্টরে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটালিয়ান যুদ্ধরত ছিল। তার কমান্ডার ছিল বঙ্গ শার্দুল

মরহুম লেফ্টন্যান্ট এ, টি, কে হক) তার অধীনস্থ একজন কোম্পানী কমান্ডার ছিলেন অতীব সাহসী বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষক, মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার ও স্বাধীনতা যুদ্ধের আহবায়ক বাংলাদেশের শহীদ রাষ্ট্রপতি লেফটন্যান্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান। তাদের দুর্দমনীয় সাহসে ও যুদ্ধ কৌশলে বঙ্গ শার্দুল প্রথম ব্যাটালিয়ান ১৫ মাইল ভারতের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে এবং বিকানীর ষ্টেটের খেমকারণ শহরটি জয় করে। ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর সাহায্যার্থে তাদের মাথার উপরে মেঘের মত ভারতীয় বিমান বাহিনী ঘুরে ঘুরে বোমা বর্ষণ করে। কামান ও এয়ারোপ্লেনের শিলা বৃষ্টির মত বোমা বর্ষণকে পরোয়া না করে এই বাঙ্গালী সৈনিকদল সাহসের যে উদাহরণ রেখে গেল তার খবর বাংগালিরা সকলে না জানলেও পাকিস্তানের ঐ যুদ্ধের সামরিক ইতিহাসে তা লেখা আছে। বঙ্গ শার্দুলের এই দুঃসাহসের জন্য ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটালিয়নে ঐ যুদ্ধের পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আটটি পদক পেয়েছিল। যা ১০০ বছরের পুরনো পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কোন ব্যাটালিয়ন পায়নি। সাবাস বঙ্গ শার্দুল ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটালিয়ান। মেজর গণি ও আমরা ক'জন মিলে ১৯৪৮ সনে ফেব্রুয়ারীতে এই ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন করার জন্য আমরা গর্বিত। সময় ও সুযোগ এলে বাঙ্গালী সেনাবাহিনী তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য আরো অধিক সাহস ও দক্ষতার পরিচয় দিবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

জম্মু ও কাশ্মীর সমস্যা যখন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে আলোচিত হচ্ছিল তখন ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ভারতীয় পার্লামেন্টে নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন। (২৬শে জুন ১৯৫২ সন)। যা ভারতীয় সরকারের মনোনীত প্রতিনিধি নিরাপত্তা পরিষদেও উচ্চারিত করে ওয়াদাবদ্ধ হন। 'If after a proper plebeside the people of Kashmir said' "We do not want to be With India" we are committed to accept that. We will accept it though it might pain us We will not send any army aganist them, We will accept that however hurt us we might feel about it, we will Change the constitution if necessary" অর্থ 'একটি যথাযথ গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীরের জনগণ যদি এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা ভারতের সাথে থাকবেনা' তাদের সে রায় মেনে নিতে আমরা ওয়াদাবদ্ধ। তাদের সে রায় মেনে নিতে যদি আমাদের ব্যথাও লাগে, তবুও আমরা তাদের বিরুদ্ধে সেখানে কোন সৈন্য পাঠাব না। আমরা মেনে নিব যদিও তা আমাদের জন্য বেদনাদায়ক হয় এবং আমরা এ জন্য প্রয়োজন বোধে শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করব।'

জওহরলাল নেহেরুর ১৯৫২ সনের ২৬শে জুন ভারতীয় পার্লামেন্টে প্রকাশ্য বিবৃতি।

ভারতীয় পার্লামেন্টে দেয়া প্রধান মন্ত্রী পন্ডিত নেহেরুর ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫১ সনের বিবৃতি নিম্নরূপ ঃ

''আমরা কাশ্মীরের জনগণের কাছে ওয়াদা করেছিলাম পরে সেই একই ওয়াদা করেছিলাম জাতিসংঘের কাছে এবং আজও আমরা তাতে অটল আছি। কাশ্মীরের জনগণ নিজেরাই নিজেদের সিদ্ধান্ত নিবেন। ৫ই জুন ১৯৫১ সনে কংগ্রেস অধিবেশনে দেয়া নেহেরুর বিবৃতি, "কাশ্মীরের জনগণই তাদের ভবিষ্যতের চূড়ান্ত বিচারক।" এমনি পন্ডিত নেহেরু ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আরও অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কখনও পাকিস্তান সরকারের কাছে প্রেরিত তারবার্তায়, কখনও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে কখনও ভারতীয় পার্লামেন্টে। কিন্তু কোন প্রতিশ্রুতি এ যাবত পালন করা হয়নি। প্রায় গত ৫০ বছর যাবত কাশ্মীরের জনগণের দাবিকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে, ভাওতা দিয়ে, কখনও নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালিয়ে নস্যাৎ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভারতের বিশাল জনসংখ্যার তুলনায় কাশ্মীরের অল্প সংখ্যক জনগণের এই যে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে মনে হয় সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের পাদদেশে অবস্থিত পাঞ্জাব রাজ্যের এককালের মুসলমানের জানের শত্রু শিখেরা স্বাধীনতার সংগ্রামে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। কাশ্মীরীদের মত অকাতরে হিন্দুদের সাথে স্বাধীনতার সংগ্রাম করে যাচ্ছেন আজ প্রায় ১ দশক ধরে।

মনে হয় কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের জনতার জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতের উত্তর পূর্ব সীমান্তে নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মনিপুর ও আসামের পার্বত্য অঞ্চলের চির অবহেলিত, চির শোষিত জনবসতি আজ স্বাধীনতা সংগ্রামে মেতে উঠেছে– তাদের সার্বিক মুক্তির তীব্র প্রত্যাশায়।

তেমনি ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের শোষিত তামিল ও ঝাড় খন্ডের অধিবাসীরা স্বাধীনতা সংগ্রামে বোধ হয় কারও পিছে থাকবে না। সারা ভারতময় এই যে মুক্তি ও স্বাধীনতার দুর্বার বান ডেকেছে তা রুখবার শক্তি ও শুভবুদ্ধি বর্তমান বর্ণবাদী ও সম্প্রসারণবাদী হিন্দু নেতৃত্বের আছে কি? বর্তমানে বৃটিশের সৃষ্ট অখণ্ড ভারত আজ পরিষ্কার তিন খন্ডে বিভক্ত যথা ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। কিন্তু সারা ভারতের মুক্তি প্রয়াসী শোষিত জাত ও সম্প্রদায় সমূহের সংগ্রামী অবস্থা দেখে মনে হয় ভারত যেন অদূর ভবিষ্যতে বহু খন্ডে বিভক্ত হয়ে যাবে। দুই শত বছর রাজত্বের পর ভারতের জীবন মরণ স্বাধীনতা সংগ্রামের নিকট পরাজিত হয়ে বৃটিশ শাসক যেমন ভারত ছেড়ে ইংল্যাণ্ডে চলে যেতে বাধ্য

হয়েছিল অনুরূপ মনে হয় সম্প্রসারণবাদী, আধিপত্যবাদী ভারতের শাসকবৃন্দ সারা ভারতময় ক্ষীপ্ত স্বাধীনতা প্রিয় জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত-শ্রান্ত ও অর্থনীতিতে পুঙ্গ হয়ে দিল্লীর আশে পাশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে।

ইতিমধ্যেই ভারতের অর্থনৈতিক পঙ্গুতা ও দারিদ্র্য প্রমাণ করে ভারত সরকারের ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকে মজুদ স্বর্ন থেকে খুব সম্ভব ১৯৯১ সনে ২৭ মন স্বর্ন বিশ্ব বাজারে নিলাম বিক্রীর মধ্য দিয়ে। এর পরে হয়ত দেশময় এই অঘোষিত যুদ্ধের খরচা মিটাবার জন্য হায়দারাবাদ নিযাম ষ্টেট থেকে লুণ্ঠিত সোনা চান্দি বহু মূল্যবান মনি মুক্তা নিলামে বিশ্ব বাজারে ছাড়তে হবে। ভারত যদি সত্যিই তাদের বহুল প্রচারিত গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে তবে অতিসত্ত্বর জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যের স্বাধীনতা সংগ্রামরত এলাকায় জনমত যাচাই করে সংখ্যাগরীষ্ঠ জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত। তা না করে তারা এটম বোমা তৈরি করলে কিছুই ফল হবে না। কারণ আমরা মনে করি জনগণের শক্তি বহু এটম বমের চেয়ে বহু গুণ শক্তিশালী।

আশাকরি ভারত সরকারের এই শুভ বুদ্ধির উদয় হবে। এবং এর ফলে জম্মু ও কাশ্মীর পাঞ্জাব প্রভৃতি এলাকায় রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম বন্ধ হবে। জনগণ তাদের স্বেচ্ছায় নির্বাচিত সরকারের দ্বারা শাসিত হোক ও আবার শান্তি ও সুখের নীড় গড়ে তুলুক আমরা এই প্রত্যাশা করছি।

প্রায় দুইশত বছর বৃটিশ শাসনের ফলাফল

বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রায় দুই শত বছর পূর্বে যখন এ দেশে পলাশীর যুদ্ধ ক্ষেত্র (১৭৫৭ খৃঃ) থেকে আস্তে আস্তে তাদের শাসন ভারত উপমহাদেশে বিস্তার করছিল তখন গোটা ভারতবর্ষে প্রায় বহু শত ছোট ছোট তথাকথিত স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। ভারতের জাতীয়তা বোধ তদনুযায়ী বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতি ছিল। তার উপর বর্ণবৈষম্যের বিভেদ-তো ছিলই। কিন্তু বৃটিশের এই দুইশত বছর ভারত শাসন করে ভারতবাসীকে এক অখণ্ড জাতীয়তা বোধে বহুলাংশে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল। ভারতবাসীকে এক অখণ্ড জাতিতে উদ্বুদ্ধ ও পরিণত করতে করতে উপমহাদেশকে সংকুচিত করে প্রায় একটা দেশে এক জাতিতে পরিণত করেছিল। কিন্তু আমার ধারণা উচ্চ শ্রেণীর বর্ণহিন্দুদের মনে অবস্থিত সাম্প্রদায়িকতা ও ভেদনীতি এত গভীরে প্রোথিত ছিল যে তারা উদার ভাবে মুসলিম, শিখ ও খৃষ্টান দূরে থাকুক সকল হিন্দুদেরও ভাইভাইয়ের মতন আপন

করে এক জাতি হতে পারেনি। বৃটিশ শাসকগণ আইন করে সতী দাহ, বাল্য বিবাহ বন্ধের মত জনহিতকর পদক্ষেপ নিয়েছিল, বহু আধুনিক শহর, বন্দর পোতাশ্রয় স্থাপন করেছিল। অন্ধকার দেশে বিজলী বাতি ছড়িয়ে দিয়েছিল। নৌকা গরু ও ঘোড়ার গাড়ির দেশে বহু পাকারাস্তা মোটর গাড়ী ও রেল গাড়ির প্রবর্তন করেছিল। আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি শিক্ষাসহ পশ্চিমের জ্ঞান ভাণ্ডারের দার খুলে দিয়েছিল। (যা দেখে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বারা। সেথা সবে আন উপহার।) তাছাড়া এক অখণ্ড শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর সৃষ্টি করেছিল– রাজনীতির ক্ষেত্রে গণতন্ত্র, সংসদ, সংসদীয় আইনের শাসন প্রবর্তন করেছিল ও এদেশবাসীকে তার ব্যবহার শিখিয়েছিল। এই সব উন্নতি ও প্রগতি মূলক কার্যক্রমের জন্য আমরা বৃটিশ সরকারের ও জাতির নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু বলা বাহুল্য এত কিছু করেও তারা আমাদের মন জয় করতে পারল না কেন? কেন তাদের বিরুদ্ধে 'স্বাধীনতা দাও' 'ভারত ছাড়' ইত্যাদি বিদ্রোহী শ্লোগানে সারা দেশ সোচ্চার হয়ে উঠেছিল? আমার দৃঢ় ধারণা তার কারণ হয়েছে মোঘল পাঠানের মত বৃটিশ জাতি ভারত বর্ষ ও ভারতবাসীকে আপন করে নিয়ে এ দেশে চিরদিনের জন্য স্থায়ী বাসিন্দা হতে আদৌ চেষ্টা করেনি– যেমনটি তারা করেছে অষ্ট্রেলিয়ায়, নিউজিল্যাণ্ডে ও কানাডাতে। তারা যত কিছু উন্নয়ন মূলক কাজ করেছে তার মূল লক্ষ্যই ছিল ভারত বর্ষকে শোষণ ও শাসন করার সুবিধার জন্য। অন্যদিকে বৃটিশও যেমন এই উপমহাদেশের লোককে আপন করে নিতে চেষ্টা করেনি তদনুরূপ ভারতবাসীও তাদেরে পরদেশী বা ভিনজাত বলে তাদের থেকে স্বাধীনতা নিয়ে এদেশ থেকে বৃটিশদের চির বিদায় দিতে বাধ্য হলো।

আমাদের সরকারের তাই মনে রাখতে হবে যে, সরকারের শুধু উন্নতি মূলক, ভালো ভালো কাজ করলেই চলবে না। জনগণের জন্য চাই তাদের মনঃপুত, নির্বাচিত ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার। মাথার উপর চাপান সরকার নয়। তা যদি না হয় তবে দেশীয় সরকারও পূর্ববর্তী বৃটিশ সরকারের মত যত ভাল কাজই করুক না কেন সেই সরকারকে জনগণ বিদায় দিয়েই দিবে।

পাকিস্তান প্রসঙ্গে

আগে আমার পাসপোর্টে উল্লেখ ছিল যে– আমি ভারতীয় নাগরিক। ভারত বিভাজনের পর আমিই হলাম পাকিস্তানী।

পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পরেও প্রায় মাস তিনেক আমাকে ভারতীয় সামরিক বাহিনী ও কর্মরত অবস্থায় ভারতের বিভিন্ন শহরে কাটাতে হয়েছিল। ঐ সময়

আমাকে একমাত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মেটানোর কঠিন কার্যে ব্যস্ত থাকাতে– দুটি জিনিষ আমার মনে গভীর রেখা পাত করেছিল। একটা হলো হাজার হাজার হিন্দু ও শিখ মিলে হাজার হাজার বছরের মুসলিম প্রতিবেশী বা মুসলিম অধ্যুষিত প্রতিবেশী গ্রামে নারকীয় হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ করে নির্মূল করে দিল। কি করে তাদের মনে প্রতিবেশী মুসলমানের জন্য এতটুকু দরদ সহমর্মিতা বা সহানুভূতি দেখা যায়নি। অনুরূপ ভাবেই হয়ত পাঞ্জাবের মুসলমানেরা তাদের হিন্দু ও শিখ প্রতিবেশী প্রতি চরম দূর্ব্যবহার করেছে– আমার মতে এ দুটোই ঘোর অন্যায়। দুটো অন্যায় মিলে কখনও একটি সঠিক উত্তর হতে পারে না। অন্যায় অন্যায়ই। আর একটি হলো ভারতের যেখানেই গিয়েছি দেখেছি পাকিস্তানের ভারত আক্রমণের জুজুর ভয়। সরকারী কর্মচারী বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর মধ্যে নিয়ে তখনকার দিনে প্রতিদিনই খবরের কাগজে বহু লেখালেখি হতো, এবং রেডিওতে বলা হতো– যার অর্থ হলো পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী ভারতের মাত্র এক চতুর্থাংশ। এই সংখ্যানুপাত জেনেও ভারতবাসীর মনে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর আক্রমণের সম্ভাবনায় এত ভয় ভীতি সঞ্চার হলো কেন? একি তাদের হীনমন্যতা (ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স) না উদ্দেশ্য মূলক প্রচারণা?

১৯৪৭ সনের শেষের দিকে ভারত সরকার দিল্লী থেকে আমাদের সোজা পথে লাহোর না পাঠিয়ে বম্বেতে পাঠিয়ে দিল। আমাদের নিরাপত্তার জন্য বম্বে থেকে নিরাপদ সাগর পথে জাহাজ যোগে করাচী পাঠিয়ে দিল। আজন্ম ভারতের পথে ঘাটে, স্কুল কলেজে ও চাকুরি জীবন কাটিয়েছি হিন্দু মুসলমান মিলিতভাবে। কিন্তু আশ্চর্য করাচীতে এসে দেখি এক নতুন দেশ। পাকিস্তান। প্রায় সবই আমরা মুসলমান। শুধু নামে নয়, আচার ব্যবহারে, কৃষ্টি ও ভাষায়। সে এক নতুন অনুভূতি। সকলের মনে এক নব উদ্যম। আবাল বৃদ্ধবর্নিতা ধনী ও দরিদ্র, প্রিয়জনহারা ছিন্নমূল ভারত হতে বিতাড়িত মোহাজিরিন সকলের মনে শিশু রাষ্ট্র পাকিস্তান (পবিত্র ভূমি) গড়ে তোলার এক বজ্র শপথ।

উর্দু বনাম পাঞ্জাবী ভাষার আধিপত্য

আমি কোন ভাষাবিদ বা কোন ভাষায় পণ্ডিত নই। কিন্তু এতদিন ভারতে চাকুরিরত অবস্থায় দেখে আসছিলাম যে, ইংরেজির পরে উর্দুভাষাই সরকারের মঞ্জুরিকৃত দ্বিতীয় ভাষার মত মর্যাদা লাভ ও বিস্তার করেছে। উর্দু সামরিক

বাহিনীতেও দ্বিতীয় প্রধান ভাষা। ইংরেজ আই.সি.এস-রা বা মিলিটারী অফিসারগণ নির্ধারিত উর্দুভাষা শিখে পাশ করতে পারলে সরকারের তরফ থেকে কিছু টাকা পুরস্কার বা ভাতা পেতেন। তা ছাড়া ইংরেজ রাজত্বের বহু পূর্বে ভারতে মোঘল-পাঠানরা আরবী, ফার্সি ও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা মিশ্রিত করে আরবী অক্ষরে ডান থেকে বাম দিকে যে ভাষাটা লিখতেন তার নামই উর্দুভাষা। এই উর্দু ভাষা সেই মোঘল ও পাঠান আমল থেকে উর্দিপরা লোক (ইউনিফর্ম পরিহিত) সামরিক বাহিনীতে এই ভাষার মাধ্যমে ভারত সকল ভাষা ভাষীদের সাথে মনের কথা বা ভাবের আদান-প্রদান করতেন। সামরিক বাহিনীতে এই ভাষা ছিল দ্বিতীয় প্রধান ভাষা। বেসামরিক বৃটিশরা এবং সামরিক বাহিনীতে এই ভাষা ইংরেজি অক্ষরে লিখত। এরা এই পদ্ধতিতে লেখার নাম দিয়েছে রোমান উর্দু। ইংরেজির পরে এটাই ছিল প্রধান ভাষা। তাই উর্দু ভাষা প্রাচীন একটি ঐতিহাসিক সমৃদ্ধশালী ভাষা। এ ভাষার মাধ্যমে সাহিত্য ও কবিতা লিখে গালিব, ডঃ ইকবাল ও আরও অনেকে প্রখ্যাত হয়েছেন। তাদের অনেক উর্দু কবিতা ও গদ্য সাহিত্য পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

পাকিস্তান সরকার সংখ্যাগরীষ্ঠের মাতৃভাষা বাংলাভাষা বাদ দিয়ে উর্দুভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করতে চেয়েছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কারণগুলির মধ্যে বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার চেষ্টাও একটি। কিন্তু যেহেতু পাকিস্তানের সরকারী চাকুরি বিশেষ করে সৈন্য বাহিনীতে অন্যান্য প্রদেশের লোকের চেয়ে পাঞ্জাবীরা সংখ্যাধিক সে জন্য পাঞ্জাবীরা আশা করত যে চাকুরিতে তাদের সংখ্যাগরীষ্ঠতার জোরে তারা স্থানীয় ও কথ্য ভাষা পাঞ্জাবীকে তাদের রাষ্ট্রভাষা না হোক অন্ততঃ মুখে মুখে ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। এই কারণে পাঞ্জাবীদের সাথে ভাবের আদান প্রদান খুবই কষ্টকর বলে মনে হতো। বলে রাখছি আমি পাঞ্জাবী রেজিমেন্টে চাকুরি করতাম। স্বাভাবিকভাবে সেখানে পাঞ্জাবীরা ছিল সংখ্যাধিক্য। বলার অপেক্ষা রাখে না যে পাঞ্জাবী ভাষা আমার নিকট মোটেই বোধগম্য ছিল না।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিভেদের সৃষ্টি করতে পারে ভেবে পাঞ্জাবীদের এই ভাষার চেষ্টা আমার কাছে বেদনাদায়ক বলে মনে হতো।

ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠনের পরিকল্পনা

বৃটিশ আমল থেকে শতাধিক বৎসরের পুরনো কয়েকটি পাঞ্জাব ও একটি বেলুচ রেজিমেন্ট ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পরে পাঠানরাও পাঠান রেজিমেন্ট নামে একটি

গ্রন্থাগার
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

রেজিমেন্ট গঠনের দাবী উত্থাপন করল। এদিকে আমরা নগণ্য সংখ্যক বাংগালী সামরিক অফিসাররাও সকলে মিলে দাবী করলাম যে, সংখ্যাগরীষ্ঠ পূর্ব বাংলার নামে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন করা হোক। কারণ দেশ ভাগের পর আমাদের এই অংশের নাম ইষ্টবেঙ্গল বা পূর্ব বাংলা নামে অভিহিত ছিল। পরে অবশ্য পূর্ব পাকিস্তান নাম সরকারী ভাবে ঘোষিত হয়েছিল। আমাদের এই দাবী দাওয়ার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মরহুম মেজর গনি। কিছু দিনের মধ্যে আমাদের উক্ত সঙ্গত দাবী মেনে নিয়ে ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট মঞ্জুর করা হোল। ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৪৮) পূর্ব বাংলার গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক বোর্ন ও প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন মন্ত্রী পরিষদের সকল সদস্য ও তদানীন্তন জি-ও-সি ব্রিগেডিয়ার (পরবর্তীতে ফিল্ড মার্শাল ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট) মোঃ আইয়ুব খান ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে আমাদের সকলের সামনে ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের জন্ম ঘোষণা করলেন। আমরা যারা ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা আজও বেঁচে আছি তারা পাকিস্তান আমলে আমাদের উত্তরসূরীদের শত্রুদের মোকাবিলায় যে দুঃসাহসী সামরিক কর্মকান্ড বিশেষ করে ১৯৬৫ সনের যুদ্ধে খেমকারণ সেক্টরে যে দুঃসাহসিক বিজয় গৌরব অর্জন করেছেন তা দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। তার পরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ইষ্টবেঙ্গল রেজমেন্টের দুঃসাহসিক অফিসার ও জোয়ানরা যে ত্যাগ তিতিক্ষা ও সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তা শুধু আমরা প্রাক্তন ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠাতারা ছাড়াও সকল বঙ্গ-সন্তান চিরদিন কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবেন। উপরন্তু স্বাধীনতার ইতিহাসে তাদের বিজয় গাঁথা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। মাঝে মাঝে ভাবি আমরা গুটি কয়েক বাঙ্গালী অফিসার যদি সেদিন পাকিস্তান আমলে (১৯৪৮ সন) এই ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠা না করতাম তবে ১৯৭১ সনে স্বাধীনতা যুদ্ধে কারা নেতৃত্ব দিত? মেজর গনি অবশ্যই ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের পিতা (পাপা টাইগার) তাই আমিও এই রেজিমেন্টের চাচা (চাচা টাইগার) বলে গর্বিত হতে পারি।

পাকিস্তানের সৃষ্টি লগ্ন থেকে আফগানিস্তানের সকল সরকার পাকিস্তানের বিরোধিতা ও ভারতের সহযোগিতা করে আসছিল। পাকিস্তানের স্বাধীনতার পর যখন জাতিসংঘের মঞ্জুরির জন্য ভোটাভুটি হয়েছিল তখন মাত্র একটি ভোট জাতিসংঘে পাকিস্তানের মঞ্জুরির বিরুদ্ধে পড়েছিল সেই ভোটটি ছিল আফগানিস্তানের। ভারতের ইঙ্গিতেই হোক বা রাশিয়ার উস্কানীতেই হোক বা উভয় কারণেই– হোক পাকিস্তানের জন্ম লগ্ন থেকে আফগানিস্তান বিরোধিতা করে আসছিল। নিরাপত্তা পরিষদে হোক বা পাক আফগান সীমান্তেই হোক। এ ব্যাপারে অঘোষিত ছোট খাটো সংঘর্ষ লেগেই থাকত। আমিও কয়েকবার আমার

পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সাথে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে এরূপ সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলাম। প্রায় ১ দশকের মতন আফগান মুজাহিদরা বিশেষ করে পাকিস্তান, সৌদী আরব ও আমেরিকার আর্থিক সাহায্য ও সামরিক সহযোগিতায় আফগান মুজাহিদগণ শেষ পর্যন্ত আফগান রাজতন্ত্রের উত্তরসূরী কম্যুনিষ্ট শাসনকে উৎখাত করে সেখানে একটি ইসলামিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। হয়ত এর ফলে পাকিস্তানের সাথে আফগানিস্তানের দীর্ঘদিনের বৈরিতা চিরস্থায়ী মিত্রতায় পর্যবসিত হবে।

পাকিস্তান গোত্র বিভাগ

আমাদের পূর্ববাংলার (পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশ) সকলেই বাংলাভাষাভাষী অনার্য্য জাতি বলে ভারতীয় আর্য্যরা আমাদের চিহ্নিত করেছে, যদিও কোন কোন বর্ণ হিন্দু আর্য্য হতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। কিন্তু পুরনো ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায় উত্তর ভারতের আর্য্যরা আমাদের অনার্য্য এবং অঙ্গরাজ্যের অধিবাসী বলে নিতান্ত অসভ্য ও বর্বর মনে করত। তাছাড়া আর্য্যরা আদি বাংগালীদের দেখেছে দাস দস্যু, অসুর, পিশাচ সামরিক রাক্ষস পাপ ম্লেচ্ছ হিসেবে। দাক্ষিণাত্য থেকে আগত সেন রাজারা বাংগালীদের উপর দেবতাদের রোষ দেখেছে। কেননা তাদের মতে বাংগালীরা ছিল ধর্মচ্যুত, বর্ণজ্ঞান হীন ও নিকৃষ্টমানের মানুষ। (১১০ পৃঃ বাংলাদেশ, বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশ কাল ১৯৭৪ (স্বাধীনতার দু'বৎসর পর)। আমরা ঐ বাংগালি জাতিরই উত্তরসূরী কাজেই ভারতীয়দের মতে আমরা বাংগালিরা সবাই অনার্য্য। তারপরে যে বিশেষণগুলি বাংগালী জাতি সম্পর্কে আর্য্যরা ব্যবহার করেছেন আমার মতে তা প্রত্যেকটি বাংগালী জাতির কাছে খুবই বেদনাদায়ক। তথাকথিত কু-বুদ্ধিজীবীরা জোর করে নিজেদের আর্য বলে প্রকাশ করে তথাকথিত ভদ্র জাতি (আর্যজাতি) হিসেবে সমাজে স্থান করে নিতে বৃথাই চেষ্টা করছেন।

পশ্চিম পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীরা প্রায় সকলেই পাঠান-মুসলমান। আফগান ও পাকিস্তানের মধ্যবর্তী উপজাতীয়রাও পাঠান-মুসলমান। পাঠান ভারত ও আফগানিস্তানে রাজত্বকারী, ও উভয়দেশীয় (পাক–আফগান) পাঠানরা সজাতি বলে দাবী করে। তখনও দু' দেশের সীমান্ত পেরিয়ে এপার-ওপার উঃপঃসীমান্ত বিবাহাদি অনুষ্ঠিত হয়। তার পরে প্রদেশের বিরোধী দলের নেতা এই অঞ্চলের মরহুম আব্দুল গাফফার খান ওরফে বাদশাখান, (সীমান্ত গান্ধী) এবং তার ছেলে জনাব ওয়ালীখান পাকিস্তানে নিরাপদ মনে না

করেই আফগানিস্তানে নিরাপদে দিন কাটাতেন। ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয় এককালে এই পাঠানরা ভারতবর্ষের বহুলাংশে রাজত্ব করে গেছেন। এমনকি আমাদের বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলায় এখনও বহু পাঠান বাসিন্দা দেখা যায়। যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আমাদের সকলের সাথে সমভাবে লড়েছেন। তারাও আজ আমাদের মতন বাংগালী হয়ে গেছেন। পাঠানদের পেশা এরা যেমন সুশাসন করতে জানেন তেমন সামরিক বাহিনীতেও এরা খুবই দুর্ধর্ষ যুদ্ধবিগ্রহেও পারদর্শী। এরা অতিথিপরায়ণ। এদের ভাষা পশ্‌তু।

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দক্ষিণে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশ অবস্থিত। এই অঞ্চলের অধিবাসিদিগকে সাধারণতঃ পাঞ্জাবী বলা হয়। এখানে স্কুল কলেজে শিক্ষনীয় ও সরকারী ভাষা উর্দু। কিন্তু বে-সরকারী ও স্থানীয় ভাষা পাঞ্জাবী। পাকিস্তান জন্মের পর হিন্দু ও শিখেরা ভারতে চলে যাওয়ায় এ অঞ্চলের লোক সবই প্রায় পাঞ্জাবী মুসলমান। তাদের পেশা কৃষি ও জমিদারী, এবং যখন যেই সরকারই আসুক না কেন যেমন মুগল, পাঠান, শিখ ও বৃটিশ এদের আমলে এরা সামরিক বাহিনীতে বিশেষ মর্যাদার সাথে চাকুরি করতেন। কিন্তু এই বিরাট সংখ্যক পাঞ্জাবী মুসলমানরা কখনও কোন বাদশাহী বা হুকুমত চালিয়ে ছিলেন কিনা তা ইতিহাসে পাওয়া যায়না। কিন্তু পাকিস্তান হওয়ার পর বিশেষ করে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর এখন তারা সামরিক বাহিনীর মারফতেই হোক, বা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই হোক দেশের হুকুমত করায়ত্ত্ব করার স্বপ্ন দেখছেন।

পাকিস্তানের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলকে সিন্ধু প্রদেশ বলে। আরব সাগরের পারে করাচী বন্দর এককালের তাদের প্রাদেশিক রাজধানী। সপ্তম শতাব্দীতে ইরাকের জেনারেল মুহাম্মদ বিন কাসিম ভারতের রাজা দাহিরকে পরাজিত ও পরাভূত করে সিন্ধু দেশ জয় করে। সিন্ধু ছাড়াও পাঞ্জাবের ভাওয়ালপুর ষ্টেট ও মুলতান ডিভিশন মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে ইরাকী-আরব সামরিক বাহিনীর দখলে আসে। ধীরে ধীরে সারাটা এলাকা ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে সংখ্যাগরীষ্ঠ লোক মুসলমান হয়ে যায়। তাদের ভাষা আরবী প্রভাবিত সিন্ধু ভাষা। লোকগুলি ও অধিকাংশ চেহারা দেখলে মনে হয় আরবের বংশোদ্ভূত। করাচী সামুদ্রিক বন্দর হওয়াতে এদের পেশা ব্যবসা-বাণিজ্য, কিছু জমিদারী বহুলাংশ কৃষিকাজ।

পাকিস্তানের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে বেলুচিস্তান প্রদেশ অবস্থিত। প্রাদেশিক রাজধানী কোয়েটা। এখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের বেলুচ বলা হয়। এদের ভাষায় এক অদ্ভূত সংমিশ্রণ— পশ্চিম ও দক্ষিণ থেকে আগত আরবী, উত্তর দিকে আফগানিস্তান থেকে আগত পশ্‌তু, ইরান সংলগ্ন এলাকা থেকে আগত ফারসী।

মঙ্গোলিয়া থেকে আগত চেঙ্গিসখানের বংশধর এই প্রদেশ জয় করেছিল। এবং শেষ পর্যায়ে বহু লোক এই দেশে বিয়ে শাদী করে থেকে যায়। তারাও এদেশের ভাষার সংমিশ্রণে কিছু অবদান রাখে। এখানকার লোকের চেহারায় মোঙ্গল জাতির সাদৃশ্য বর্তমান। এরা দুর্ধর্ষ চেঙ্গিসখানের বংশধর বলে বৃটিশ আমলেও সামরিক বাহিনীতে পারদর্শিতা ও সাহসের পরিচয় দিয়েছে। এই এলাকার নামে বেলুচ রেজিমেন্ট কায়েম হয়েছিল বৃটিশ আমলে। বৃটিশ কূটনীতি ও সামরিক কৌশলে এই এলাকার লোকই একাধারে আফগানিস্তান ও ইরানের সীমা পর্যন্ত এলাকা রক্ষা করে আসছে। পশ্চিম পাকিস্তানে সামরিক চাকুরিরত অবস্থায় এবং পরবর্তীতে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী হিসেবে সারাটা পাকিস্তান সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা হলো যে, বহু পাঠান, বেলুচি, সিন্ধু ও পাঞ্জাবীদের মনে বাংলাদেশীদের জন্য অফুরন্ত সম্মান, সহমর্মিতা ও মায়া মহব্বত রয়েছে।

পাকিস্তান জন্মের প্রসব বেদনা

বৃটিশ আমলে অখণ্ড ভারতের রাজধানী ১৯৩৭ সন পর্য্যন্ত ছিল কলিকাতা। তারপর ছিল দিল্লী। কলিকাতা ছিল অখণ্ড বঙ্গদেশের রাজধানী। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর ছোট্ট শহর ঢাকা যা মাত্র ঢাকা জেলা ও বিভাগীয় হেড কোয়ার্টারস ছিল, তদানীন্তন পূর্ববাংলার সরকার (পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ) এই ক্ষুদ্র শহর ঢাকাকেই প্রাদেশিক রাজধানী বলে ঘোষণা দেয়। ক্ষুদ্র জেলা ও বিভাগীয় হেড কোয়ার্টার ঢাকার পক্ষে পূর্ববাংলার প্রাদেশিক সরকারকে স্থান দেয়া খুবই কষ্টকর ছিল। কলিকাতা থেকে রেলযোগে, জাহাজযোগে পূর্ববাংলা সরকারের যাবতীয় রেকর্ডপত্র, লটবহর ও সরকারী কর্মচারিরা আসতে লাগল। বর্তমান রাষ্ট্রপতি ভবনের সীমা রেখার মধ্যে একটি বিরাটকায় আধাপাকা ঘর তদানীন্তন গভর্ণরের বাড়ী নির্ধারিত হল। ধন্যবাদ তখনকার ইংরেজ গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক বোর্ন ও পূর্ববাংলার প্রাদেশিক সরকারের সকল মন্ত্রী, সেক্রেটারী এবং সকল শ্রেণীর কর্মচারিদেরকে। তারা অসহনীয় কষ্ট সহ্য করে কোন রকমে মাথা গুঁজে থাকার ব্যবস্থা করলেন। এবং উপস্থিত বুদ্ধি ব্যবহার করে কর্মচারিরা যেন তেন প্রকারে তাদের অফিস গুছিয়ে নিয়ে কাজ শুরু করলেন। পূর্ববাংলার সেক্রেটারিয়েটের জন্য ইডেন গার্লস কলেজের ভবনটি সরকারী নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ইডেন গার্লস কলেজকে পুরানা শহরের একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে স্থানান্তরিত করলেন।

সরকারি কর্মচারীরা চেয়ার ও টেবিলের অভাবে তারা নিজ নিজ সরকারী দফতরের কলিকাতা থেকে প্যাক করা আনীত দলিল দস্তাবেজের বাক্সগুলি খুলে ছোট নিচু বাক্সগুলির উপরে বসত আর উঁচু বাক্সগুলিকে দিয়ে টেবিলের কাজ সারত। এই অপরিসীম কষ্ট চলল বেশ কয়েক মাস বা বছর যতদিন না সরকারী তরফে চেয়ার টেবিল সাপ্লাই হল। গভর্ণর সাহেব ও তার ষ্টাফদেরও একই অবস্থা। নাম-কা ওয়াস্তে গভর্ণর হাউসের সকল কর্মচারি ইংরেজ গভর্ণর সাহেব তাদের আনীত নিজস্ব বিছানায় মেঝে পেতে শয়ন করতেন। কেউ কেউ দিনের বেলায় ঐ বিছানার উপর সরকারী কাজ চালাতেন। এত কষ্টের মধ্যেও তাদের মনে ছিল নতুন দেশ, মুসলমানদের স্বাধীন আবাসভূমি পাকিস্তান গড়ার অনমনীয় উদ্যম। মুখে ছিল দৈহিক কষ্ট উপেক্ষা করা অম্লান প্রফুল্লতা। কী কষ্ট করেই যে, আমাদের পূর্বসুরীরা ১৯৪৭–'৪৮ সনে একটি নতুন দেশ, নতুন রাজধানী ও নতুন নতুন অফিস কায়েম করেছিল ত্যাগ তিতিক্ষার ক্ষেত্রে এটা একটি অভাবনীয় ব্যাপার। চির স্মরণীয় ইতিহাস।

অরা কষ্ট করেছিল বলে পূর্ববাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যার ফলশ্রুতিতে আমরা একটি তৈরি সুপ্রতিষ্ঠিত রাজধানী ও স্বাধীন বাংলাদেশ গড়তে পারলাম।

তারপর পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে জাতীয় ক্যাডারের ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস বিভাগে একটি বাঙ্গালী মুসলমানও ছিল না। একজন মাত্র মিঃ নূরন্নবী চৌধুরী আই.সি.এস ছিলেন। তাও সরকারী মনোনয়নে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে সিলেকশনে নয়। কাজেই সেক্রেটারি জয়েন্ট সেক্রেটারী, কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার বা ডেপুটি সেক্রেটারী, লেভেলের পোষ্টগুলি পূরণ করার জন্য হয় পশ্চিম পাকিস্তানী না হয় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অপ্‌ট্ করা ভারতীয় মুসলমানদের দ্বারা অথবা বাংগালীদের মধ্য থেকে প্রমোশন দিয়ে উর্ধতন পোষ্টগুলি কোন ক্রমে ভর্তি করে শাসন কার্য পরিচালনা শুরু করা গেল। সেখানেও প্রতিটি অফিসার যথা শক্তি দিয়ে দিন রাত পরিশ্রম করে দেশ গড়ার কাজে লেগে গেলেন।

সৌভাগ্যক্রমে পুলিশ সার্ভিসে বাংগালী মুসলমান অফিসারের সিনিয়রিটি ভালই ছিল। এখানে পুলিশের ডিআইজি ও এসপি প্রভৃতি র‍্যাংকের সুদক্ষ অফিসার ছিলেন। অতি সহজেই তাদের পরবর্তী প্রমোশন দিয়ে যেমন মিঃ জাকির হোসেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম আই.জি.পি ও মিঃ হাবিবুর রহমান প্রথম এডিশনাল আই.জি.পি প্রমুখ অভিজ্ঞ অফিসার থাকাতে পূর্ব বাংলায় সুদক্ষ পুলিশ

বাহিনী গড়ে উঠেছিল। আগেই বলেছি শুধু বাংলাদেশে নিজস্ব কোন বাঙ্গালী রেজিমেন্ট ছিল না বলে আমরা বাংগালী অফিসার চেষ্টা করে বর্তমান ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠা করি। তখনকার দিনে আমাদের দেশে কোন ক্যান্টনমেন্ট ছিল না বললেই চলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নামকা ওয়াস্তে অস্থায়ী বাঁশের ঘর দিয়ে বর্তমান ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও চট্টগ্রাম নতুনপাড়া ক্যান্টনমেন্ট নামক অতি ছোট্ট দুটি ক্যান্টনমেন্ট ছিল। আল্লাহ্র অসীম রহমতে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে আস্তে আস্তে আমাদের দেশে বেশ কয়েকটি নতুন ক্যান্টনমেন্টের সৃষ্টি হয়েছে। পুরনো ক্যান্টনমেন্ট দুটি প্রসারিত ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে। বর্তমান সামরিক বাহিনীর থাকা ও প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা করা হয়েছে দেখে আমি আনন্দিত ও গর্বিত।

শিক্ষার দিক দিয়ে বাঙ্গালী মুসলমানের মান খুবই নিম্নে ছিল। আমাদের ভাগে মাত্র ছোট্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটি পড়েছিল। একটিও ইনজিনিয়ারিং কলেজ, বা মেডিকেল কলেজ ছিল না। ক্রমান্বয়ে সেখানে বেশ কয়েকটি সাধারণ ইউনিভার্সিটি, মেডিকেল, ইনজিনিয়ারিং ও এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর্মি, নেভি ও এয়ারফোর্স প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের জন্য উচ্চ প্রশিক্ষণের জন্য ষ্টাফ কলেজ স্থাপন হয়েছে। বেসামরিক জাহাজ তৈরীর জন্য শিপইয়ার্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাহাজ চালাবার জন্য সুদক্ষ নাবিক ইন্জিনিয়ারের প্রশিক্ষণের জন্য চট্টগ্রামে মেরিন কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। তারপরে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ও চালনা সমুদ্র বন্দরকে যথা সম্ভব আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এতসব সম্ভব হয়েছে স্বাধীন পাকিস্তান ও স্বাধীন পূর্ব বাংলাদেশ স্থাপিত হওয়ার ফলশ্রুতিতে। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি আমাদের এই দেশটি সর্বতোভাবে উত্তরোত্তর উন্নতি করে পৃথিবীর উন্নত দেশ ও সভ্য সমাজে স্থান লাভ-করুক। দেশের জনসাধারণের অভাব দুঃখ ও দুর্দশা চিরতরে দূরীভূত হোক। দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব চির অটুট থাকুক।

এবার চোখ রাখা যাক তখনকার (১৯৪৭) পশ্চিম পাকিস্তানের দিকে। সেখানে তাদের নিজস্ব ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস অফিসার, মিলিটারী অফিসার তো ছিলই, তা ছাড়া ভারতীয় সিনিয়র মুসলমান অফিসাররা সবাই পশ্চিম পাকিস্তানে অপ্ট করল। ফল হলো সিনিয়র এডমিনিষ্ট্রেটিভ সামরিক ও বেসামরিক ক্যাডারের পশ্চিম পাকিস্তানে কোন অভাব ছিল না। প্রত্যেকটি প্রাদেশিক রাজধানী তারা বৃটিশের তৈরী ও প্রতিষ্ঠিত পেয়েছিলো। সামরিক বাহিনী ও সেনানিবাসের কোনই অভাব ছিল না। শুধু পাকিস্তান কেন্দ্রীয় রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানের করাচীতে স্থান দিতে হয়েছিল। এজন্যও তাদের সিন্ধের প্রাদেশিক সরকারকে

তেমন কোন বেগ পেতে হয়নি। তারপরে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাকিস্তান হওয়ার কারণে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা পশ্চিম পাকিস্তানীদের ভোগ দখলে ছিল। ব্যতিক্রম হলো আমাদের জন্য– কারণ যেহেতু কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েটে সকল সিনিয়র অফিসার পশ্চিম পাকিস্তানী সেহেতু আমাদের অভাব, অভিযোগ ও প্রয়োজনের দিকে আবশ্যকীয় নজর দেয়া হত না।

তদুপরি এক হাজার মাইল প্রস্থ ভারতবর্ষ দ্বারা ঢাকা, করাচী থেকে বিচ্ছিন্ন। সমুদ্র পথেই হোক বা আকাশ পথেই হোক সাধারণ মানুষের পক্ষে কাজ কর্মের সুপারিশের জন্য করাচীতে যাতায়াত একরূপ অসম্ভব ছিল। ভারতের মধ্য দিয়ে স্থল পথে পশ্চিম পাকিস্তানে যাওয়ার কোন বৈধ ব্যবস্থা ছিল না।

মহান রাষ্ট্রভাষা বাংলা ভাষার আন্দোলন

পাকিস্তান জন্মের পরে পরেই খুব সম্ভব সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক জনাব আবুল কাসেম পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশ নামে একটি সংগঠন গড়েন। সেই তমদ্দুন মজলিশই মহান বাংলা ভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনের গোড়া পত্তন করেন। ভাষাবিদ প্রবীণ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন "যদি বিদেশী বলে ইংরেজি ভাষা পরিত্যাক্ত হয়, তবে বাংলাকে, পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা রূপে গ্রহণ না করার কোন যুক্তি নেই। যদি বাংলা ভাষার অতিরিক্ত কোন দ্বিতীয় ভাষা গ্রহণ করতে হয়, তবে উর্দু ভাষার দাবী বিবেচনা করা উচিত।" এই রকম আরো কিছু মনীষী শিক্ষাবিদ তমদ্দুন মজলিশের ভাষা আন্দোলনকে সমর্থন করেন। শিক্ষিত ও সাধারণ বাঙ্গালীরা বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করার ঘোর সমর্থক।

হলে কি হবে পাকিস্তানের শাসক চক্র এবং ঢাকার নবাব পরিবারের খাজা নাজিমুদ্দীন প্রমুখ উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে একাত্ত্বতা ঘোষণা করেন। উর্দু ভাষী শাসক চক্রতো বটেই, এই নাজিমুদ্দীন চক্র ও সভা সমিতি এমন কি পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদেও একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সমর্থনে জোর বক্তব্য রাখেন।

তদানীন্তন পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশের নেতা মরহুম অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে ঢাকা শহরে সভা ও শোভাযাত্রা করে বাংলা ভাষার স্বপক্ষে জোর আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলেন। পশ্চিম পাকিস্তান যতই উর্দুর পক্ষে বক্তৃতা ও বিবৃতি দিতে শুরু করলেন পূর্ব পাকিস্তানের বাংগালিরাও ততোধিক

বাংলার পক্ষে আন্দোলন, শোভাযাত্রা, সংখ্যাগরীষ্ঠের ভাষা বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষাকরণের যুক্তি বুঝাতে লাগলেন। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে উর্দুর বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন করত না বা উর্দুকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করো না তাও বলত না। তারা শুধু বাংলাভাষার পক্ষেই যুক্তি দেখাতো। কেন্দ্রীয় সরকার তারা শুধু জনসাধারণের ব্যবহার্য মুদ্রা, মনি অর্ডার ফরম, ডাক টিটিটের উপরে একমাত্র উর্দুভাষা ব্যবহার করল। যার জন্য গোটা পূর্ব পাকিস্তানবাসী বুঝতে ও লিখতে কষ্ট অনুভব করল। পাবলিক সার্ভিস কমিশনও ইংরেজির সাথে একমাত্র উর্দু ব্যবহার করত। আগেই বলেছি সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে উর্দু ব্যবহার হতো। তার উপর তখন পাঞ্জাবী ভাষার চাপে বাংগালীদের জন্য এক অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করল। এইভাবে পাকিস্তান ভাঙ্গার পরিস্থিতির প্রথম স্তর পশ্চিম পাকিস্তানবাসীরাই সৃষ্টি করল।

কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পূর্ববঙ্গ সফর

আমি তখন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে চাকুরিরত অবস্থায় আছি। মরহুম ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান তখন ব্রিগেডিয়ার হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের জি.ও.সি। হেড কোয়ার্টার্স ঢাকার পুরাতন হাইকোর্ট বিল্ডিং।

১৯৪৮ সনের ১৯শে মার্চ পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রথম ও শেষবারের মতন পূর্ববঙ্গ সফর উপলক্ষে ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করলে তাকে পূর্ব বাংলার জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যে সংবর্ধনা দিয়েছিল তা ঢাকার বুকে এর পূর্বে আর কখনও দেখা যায় নাই। ২১শে মার্চ রেস কোর্সে তাকে গণ সংবর্ধনার জন্য যে হর্ষোৎফুল্ল জনতার ঢল নেমেছিল তাকে এক ঐতিহাসিক জনসমাবেশ বলা যায়। ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সমাবর্তন উৎসব হয়। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল কায়েদে আজমের পূর্ব বাংলার (চিটাগাংসহ) অনুষ্ঠান সমূহে সেনাবাহিনীর তরফ থেকে কর্তব্যরত থাকার। কার্জন হলে ভাইস চ্যান্সেলর ও চ্যান্সেলর এবং কায়েদে আজমের বক্তৃতার প্রথমার্ধ মানুষ পিনপড়া নীরবতার সাথে শুনেছিলেন। কিন্তু কায়েদে আজমের ভাষণে যখনই তিনি বললেন 'Urdu and only Urdu shall be the state language of Pakistan'. অর্থাৎ 'উর্দু একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' কায়েদে আজমের এই মন্তব্যের সাথে সাথে সমাবর্তন উৎসবে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী কেহ কেহ No- No না-না- বলে

কায়েদে আজমের অন্তর্ধান

পাকিস্তানের জন্ম লগ্ন থেকে রাষ্ট্রের জনক কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নতুন দেশ গঠনের জন্য দিবা রাত্রি কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছিলেন। তিনি যৌবনে স্বাধীন সার্বভৌম এবং গণতান্ত্রিক দেশ ইংল্যাণ্ডে পড়াশুনা করে ব্যারিষ্টারী পাশ করেছেন। সেখানে ছাত্র-সমাজের ও দাদা ভাই নৌরোজির বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য পদ প্রার্থী হওয়াতে বহু গণতন্ত্রমনা জনসমাবেশে তিনি বক্তৃতা দিয়ে নৌরোজিকে বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য পদে জয়ী করেছেন। তারপরেও এক যুগের অধিক লণ্ডনে ব্যারিষ্টার হিসেবে কোর্টে প্রাকটিস করেছেন এবং নিঃসন্দেহে তিনি প্রকৃতই গণতন্ত্র মনা জননেতা তৈরী হয়েছিলেন। তাই বোধ হয় তিনি দিনরাত খেটে তার নিজ হাতে গড়া নতুন দেশ পাকিস্তানকে একটি অভিনব গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্র দেয়ার জন্য এবং এই দেশের গঠনতন্ত্র লিখবার জন্য কায়মনে প্রাণে চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। এই পরিশ্রমই তার সুপ্ত অসুখ যা তিনি অনেক দিন থেকেই বহন করে আসছেন তা প্রকট আকার ধারন করল। এবং কষ্টদায়ক ও বেদনাদায়ক হয়ে দেখা দিল। পাকিস্তান সরকার তার চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী তাকে কিছু দিনের জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। এ জন্য তাকে বেলুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটার অনতিদূরে একটি ছোট্ট জনবিরল স্বাস্থ্যকর জায়গা জিয়ারত শহরে স্থানান্তরিত করলেন। কায়েদে আযমের সেবা যত্নের জন্য তার নিজস্ব সরকারী ডাক্তার বয়, বাবুর্চি করাচী থেকে সবই তার সাথে আনা হয়েছিল। তার চিকিৎসা বা যত্নের কোন ত্রুটি হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। আমি নিজেও আমার কৌতুহলী মনের সান্ত্বনার জন্য কোয়েটা থেকে জিয়ারত গিয়ে দু'দিন থেকেছি। উঁচু পাহাড় ও বনানী দিয়ে ঘেরা সবুজ ও শীতল জিয়ারত খুবই জনবিরল স্বাস্থ্যকর জায়গা। আমি কায়েদে আজমের স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নিয়ে দু'দিন পরে আবার কোয়েটা ফিরে এসে আমার কর্তব্যে যোগ দিই।

কিন্তু মানুষের মরণ যখন ডাক দেয় তখন ঔষুধ-পত্র, সেবা যত্ন স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া কোন কাজে লাগে না।' দিন দিন তাঁর স্বাস্থ্যের আরো অবনতি হলো। এ দেখে পাকিস্তান সরকার তাঁকে জিয়ারত থেকে করাচীতে গভর্ণর জেনারেলের বাসভবনে নিয়ে আসে। করাচীতে পাকিস্তানের বাছা বাছা ডাক্তার কায়েদে আজমের চিকিৎসায় রত ছিলেন– কিন্তু পাকিস্তানের জনক কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাঁর দেশবাসীকে অকুল শোক সাগরে ভাসিয়ে ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সন জান্নাতে গমন করেন। তাঁর তিরোধানে পাকিস্তানের

প্রতিবাদ জানাল। বোধ হয় পাকিস্তানে এই প্রথম কায়েদে আজমের মুখের সামনে কেউ তার কথার তীব্র প্রতিবাদ জানাল। কায়েদে আজম কিছুক্ষণ চুপ থেকে কি যেন চিন্তা করলেন তার পরে উন্নত মস্তিষ্কে সবার দিকে তাকিয়ে "It is up to the parents to give language to their Children" "পিতা–মাতা সন্তানদের ভাষা শিখাবেন–সন্তানদের ভাষা বেছে নিবার কোন অধিকার নাই।" আমার যতটুকু মনে হয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধির আইনজ্ঞ ব্যারিষ্টার মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর উত্তর যতই যুক্তিযুক্ত হোক না কেন কার্জন হলে উপস্থিত বাংগালী ভদ্রমণ্ডলী তা মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। কারণ সংখ্যাগরীষ্ঠ বাংগালীর এই ভাষা কি হবে তা বাংগালী পিতা মাতারাই ঠিক করে দেবেন। পশ্চিম পাকিস্তানের ইংরেজি ও উর্দুভাষা শাসক-শোষকরা তা ঠিক করে দিতে পারে না।

আমার মনে হয় যদি রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন পাকিস্তান ভাঙ্গার প্রথম সিঁড়ি হয় তবে এর ভিত্তি প্রস্তর খানা পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল ও মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহই স্থাপন করে গিয়েছিলেন।

মর্মান্তিক ২১শে ফেব্রুয়ারী

ভাষা আন্দোলনের পরের ইতিহাস বড়ই হৃদয় বিদারক ও করুণ। ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সন– ছাত্র জনতার ভাষা আন্দোলনের বিরাট মিছিলের উপর ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে যেখানে বর্তমান শহীদ মিনারটি অবস্থিত সেখানে শান্তি প্রিয় মিছিলের উপর পুলিশ গুলি চালায়। বহু ছাত্র জনতা আহত হয়– কিন্তু নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হয় বরকত, ছালাম, জব্বার, শফিক।

বাংলাদেশের বহু মানুষ অসুখে-বিসুখে অনাহারে মারা যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও বিভিন্ন সময় বাংলাদেশে কয়েকজন ছাত্র শাসকের হুকুমে পুলিশের গুলিতে মারা গেছে– সেটা বড় কথা নয়। সবচেয়ে বড় কথা হলো এই কয়েকজন শহীদের তাজা বুকের রক্তে প্রতিষ্ঠিত হলো বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতার সোপান। তাই জাতি চিরদিন তাদের মনে রাখবে– এদের উদ্দেশ্যে প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক (বর্তমান লণ্ডনে অবস্থিত) গাফফার চৌধুরী লিখেছিলেন– 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো ২১শে ফেব্রুয়ারী– আমি কি ভুলিতে পারি– ছেলে হারা শত মায়ের অশ্রু ঝরায়ে ফেব্রুয়ারী আমি কি ভুলিতে পারি।'

কায়েদে আজমের অন্তর্ধান

পাকিস্তানের জন্ম লগ্ন থেকে রাষ্ট্রের জনক কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নতুন দেশ গঠনের জন্য দিবা রাত্রি কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছিলেন। তিনি যৌবনে স্বাধীন সার্বভৌম এবং গণতান্ত্রিক দেশ ইংল্যাণ্ডে পড়াশুনা করে ব্যারিষ্টারী পাশ করেছেন। সেখানে ছাত্র-সমাজের ও দাদা ভাই নৌরোজির বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য পদ প্রার্থী হওয়াতে বহু গণতন্ত্রমনা জনসমাবেশে তিনি বক্তৃতা দিয়ে নৌরোজিকে বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য পদে জয়ী করেছেন। তারপরেও এক যুগের অধিক লণ্ডনে ব্যারিষ্টার হিসেবে কোর্টে প্রাকটিস করেছেন এবং নিঃসন্দেহে তিনি প্রকৃতই গণতন্ত্র মনা জননেতা তৈরী হয়েছিলেন। তাই বোধ হয় তিনি দিনরাত খেটে তার নিজ হাতে গড়া নতুন দেশ পাকিস্তানকে একটি অভিনব গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্র দেয়ার জন্য এবং এই দেশের গঠনতন্ত্র লিখবার জন্য কায়মনে প্রাণে চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। এই পরিশ্রমই তার সুপ্ত অসুখ যা তিনি অনেক দিন থেকেই বহন করে আসছেন তা প্রকট আকার ধারন করল। এবং কষ্টদায়ক ও বেদনাদায়ক হয়ে দেখা দিল। পাকিস্তান সরকার তার চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী তাকে কিছু দিনের জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। এ জন্য তাকে বেলুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটার অনতিদূরে একটি ছোট্ট জনবিরল স্বাস্থ্যকর জায়গা জিয়ারত শহরে স্থানান্তরিত করলেন। কায়েদে আযমের সেবা যত্নের জন্য তার নিজস্ব সরকারী ডাক্তার বয়, বাবুর্চি করাচী থেকে সবই তার সাথে আনা হয়েছিল। তার চিকিৎসা বা যত্নের কোন ত্রুটি হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। আমি নিজেও আমার কৌতুহলী মনের সান্ত্বনার জন্য কোয়েটা থেকে জিয়ারত গিয়ে দু'দিন থেকেছি। উঁচু পাহাড় ও বনানী দিয়ে ঘেরা সবুজ ও শীতল জিয়ারত খুবই জনবিরল স্বাস্থ্যকর জায়গা। আমি কায়েদে আজমের স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নিয়ে দু'দিন পরে আবার কোয়েটা ফিরে এসে আমার কর্তব্যে যোগ দিই।

কিন্তু মানুষের মরণ যখন ডাক দেয় তখন ঔষুধ-পত্র, সেবা যত্ন স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া কোন কাজে লাগে না।' দিন দিন তাঁর স্বাস্থ্যের আরো অবনতি হলো। এ দেখে পাকিস্তান সরকার তাঁকে জিয়ারত থেকে করাচীতে গভর্ণর জেনারেলের বাসভবনে নিয়ে আসে। করাচীতে পাকিস্তানের বাছা বাছা ডাক্তার কায়েদে আজমের চিকিৎসায় রত ছিলেন– কিন্তু পাকিস্তানের জনক কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাঁর দেশবাসীকে অকুল শোক সাগরে ভাসিয়ে ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সন জান্নাতে গমন করেন। তাঁর তিরোধানে পাকিস্তানের

গণতন্ত্রের যে অপূরণীয় ক্ষতি হলো তার মাশুল আজও পাকিস্তান দিয়ে যাচ্ছে।

তাঁকে করাচী শহরের সর্বোচ্চ পাহাড়ের টিলার উপরে সমাধিস্থ করা হয়েছে। তাঁর সাথে আরও সমাধিস্থ আছেন তারই একমাত্র ভগ্নি মিস ফাতিমা জিন্নাহ ও এককালের রাজনীতির প্রিয় সাথী পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী মরহুম লিয়াকত খান, সীমান্ত প্রদেশের গভর্ণর মরহুম আব্দুর রব নিস্তার, পূর্ব পাকিস্তানের এককালের প্রধানমন্ত্রী মরহুম নূরুল আমীন। তার মাজারে গড়ে উঠেছে এশিয়া মহাদেশের শ্রেষ্ঠতম সুন্দরতম মৌসুলিয়াম।

পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম উপনির্বাচন

পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী মরহুম নূরুল আমীন সাহেব পূর্ব পাকিস্তানে টাঙ্গাইল উপনির্বাচন কেন্দ্রে ১৯৪৯ সনে ২৬শে এপ্রিল উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষনা করেন। পূর্ব পাকিস্তান সরকার ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা এককালের প্রখ্যাত জমিদার বিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম দিকে প্রথম গ্রামীণ করটিয়া কলেজের প্রতিষ্ঠাতা দেশ প্রিয় জমিদার মরহুম ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর (চাঁনমিয়া) উত্তর সুরী খুররম খান পন্নীকে মুসলীম লীগ সরকার স্বীয় স্বার্থে পূর্ব ঘোষিত অযোগ্যতা বাতিল করে মুসলীম লীগ প্রার্থী হিসেবে এই উপনির্বাচনে নমিনেশন দেন। তখন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিরোধী দল প্রতিষ্ঠিত না হলেও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ মনে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরীষ্ঠের ভাষা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা না দেয়াতে, অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে এবং শাসনতান্ত্রিক একচেটিয়াপনা ও দুর্ব্যবহারের ফলে এই অল্প সময়ের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার ও তার একান্ত সমর্থক পূর্ব পাকস্তান মুসলীম লীগ তার সমর্থন হারিয়েছিল। জনগণের প্রার্থী হিসেবে এই দলের মনোনীত প্রার্থী ছিলেন উদীয়মান সাধারণ ঘরের ছেলে সামছুল হক। জনাব নূরুল আমীনের নেতৃত্বে সরকারী দল মুসলিম লীগের আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও মুসলীম লীগ প্রার্থী খুররম খান পন্নী গরীব নিঃস্ব সামছুল হকের নিকট পরাজয় বরণ করেন। মুসলিম লীগের এই ভরা ডুবি দেখার পর সরকার ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত আর কোন উপ নির্বাচন দেননি। বা দিতে সাহস করেননি। নূরুল আমীন সাহেবের মুসলীম লীগ সরকার ক্ষমতা আঁকড়িয়ে থাকার জন্য ৩৫টি উপনির্বাচন বন্ধ করে পূর্ব পাকিস্তানের গণতন্ত্র হত্যার প্রথম সোপান স্থাপন করলেন। ফল হলো মারাত্মক। জনগণের চাপে পড়ে যখন ১৯৫৪ সনে পূর্ব

পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে বাধ্য হলো তখন মুসলিম লীগের একেবারেই ভরাডুবি হলো— বলতে গেলে নির্মূল হয়ে গেল।

পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম

পূর্ব পাকিস্তানে এভাবে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা অস্বাভাবিকভাবে কমে যাওয়াতে মরহুম মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে ও সামছুল হক সাহেবকে সম্পাদক করে বাংলাদেশে প্রথম আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়। সহৃদয় পাঠকগণের সহজে বুঝবার জন্য লেখা যেতে পারে যে, আওয়ামী শব্দটি জন্মগতভাবে উর্দু শব্দ যার অর্থ জনগণ। ইংরেজিতে পিপল। লীগ হল ইংরেজি শব্দ– অর্থ হল দল। বর্তমান আওয়ামী মুসলীম লীগ নওয়াব, খাজা বা জমিদার শ্রেণীর মুসলীম লীগ নয়। এর ভিত্তিমূল জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বলেই তারা বুঝাতে চান। ধীরে ধীরে এই পার্টি পাকিস্তানে জাতীয় মুসলিম লীগের চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানে অধিক জনপ্রিয় হলো।

ভারতীয় কংগ্রেস পার্টির পূর্ব পাকিস্তান শাখা

উপমহাদেশ পাক ভারত স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কংগ্রেস পার্টি স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যেক জেলা-সাবডিভিশন প্রভৃতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানকে আর্থিকভাবে অচল ও প্রশাসনিক দিক দিয়ে দুরূহ ও অসম্ভব করে দেয়ার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ বর্ণ হিন্দু সরকারী কর্মচারী ভারতে চলে যান। স্বাভাবিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানের বর্ণবাদী হিন্দু নেতারাও ভারতে চলে যান। এই প্রক্রিয়ায় পূর্ব পাকিস্তান অচল হোক বা না হোক এদেশের কংগ্রেস পার্টি এতদিন যা ভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের ছত্র ছায়ায় ছিল তা একেবারেই অচল হয়ে পড়ে। নেতৃত্বের এই মহাসংকটের ফলে মুষ্টিমেয় যে কয়জন হিন্দু নেতা পূর্ব পাকিস্তানে তখনও অবস্থান করছিল তারা আওয়ামী মুসলীম লীগকে ফুসলাতে লাগল যে তোমরা যদি তোমাদের পার্টির নাম হতে মুসলিম শব্দটি বাদ দাও অর্থাৎ শুধু আওয়ামী লীগ রাখ তবে আমরা কংগ্রেসের নাম বিলুপ্ত করে সদলবলে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে তোমরা আর আমরা একত্রে মিলে সরকারী দল মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে শক্তিশালী দল দাঁড় করাতে পারি। এদিকে আওয়ামী মুসলিম লীগের পার্টি শক্তিশালী করার জন্য

নতুন নেতৃত্ব বাড়াবার প্রয়োজন হওয়াতে কংগ্রেসের এই প্রস্তাবে তারা রাজী হয়ে গেল। এবং আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম হতে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে শুধু আওয়ামী লীগ রাখা হলো। এবং হিন্দুরাও সদলবলে আওয়ামী লীগে যোগ দিল। সেই হতে ভারতীয় কংগ্রেসের হিন্দু নেতাগণ বা তাদের উত্তরসূরীগণ আজও বেনামে আওয়ামী লীগে বিরাজ করছেন। এই সত্য ঘটনা অস্বীকার করার কোন উপায় আছে কি?

নিজদের কোমড়ে শক্তি না থাকাতে লতাগুল্মাদি স্বাভাবিক ভাবেই যেমন শক্তিশালী বৃক্ষ ধরে উপরে উঠতে চায় সেরূপ ভাবে পূর্ব পাকিস্তান বা পাকিস্তানের কমুনিষ্ট পার্টি যখন শতকরা ৮০ ভাগ ধর্ম প্রাণ মুসলমানের প্রাণে স্থান করতে পারল না তখন তারা অবস্থার বিপাকে পড়ে কখনও আওয়ামী লীগ ধরে কখনও বেনামে কখনও স্বনামে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করতে চেষ্টা করে কেহ কেহ আফগান ষ্টাইলে (প্রথমটা না শেষেরটার) ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছে। প্রয়াতঃ মনিসিং দুর্গাপুর থানার অমুসলমান হাজং এলাকায় কমরেড ইলামিত্রের সাথে নওয়াবগঞ্জ মহকুমার অমুসলমান সাওতাল সম্প্রদায় অধ্যুষিত নাচোল এলাকায়, কমরেড সুব্রত পাল বিয়ানীবাজার থানার অন্তর্গত অমুসলমান নমঃশুদ্র প্রভৃতি পাহাড়ী ও অমুসলিমদের শ্রেণী সংগ্রামের দোহাই দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় সশস্ত্র অভ্যুথানের বহু চেষ্টা করলেও রূঢ় বাস্তব এই যে, তারা কোথাও কামিয়াব হতে পারেনি। আর পারবারও কোন আশা আছে বলে মনে হয় না। কারণ কমুনিজমের জন্মদাতা খোদ রাশিয়া সহ পূর্ব ইয়োরোপের সকল কমুনিষ্ট দেশ এখন কমুনিজম বর্জন করে বাজার অর্থনীতি ও গণতন্ত্র গ্রহণ করে কমুনিজমকে বিসর্জন দিয়েছেন। মহাচীনও দেখি কমুনিজম বিসর্জন না দিলেও ধীরে ধীরে গণতন্ত্র ও বাজার অর্থনীতির দিকে পা বাড়াচ্ছে। আমাদের দেশের কমুনিষ্ট পার্টিও এখন উদ্দেশ্যবিহীন ও শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

পশ্চিম পাকিস্তানে প্রথম নির্বাচন

১৯৫১ সনের ডিসেম্বরে পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়। পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচন দিতে সাহস পেল না মসনদ হারাবার ভয়ে। এখানে নির্বাচন পিছে পড়ে রইল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে সকল প্রদেশে ১৯৫১ সনের ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেল। এই নির্বাচনের বিশেষ লক্ষ্যণীয় হলো যে, যে পাঞ্জাবে পাকিস্তানের আগ পর্যন্ত ইউনিয়নিষ্ট দল সরকার গঠন করত সেখানে পাকিস্তান

মুসলীম লীগ অত্যধিক সংখ্যাগরীষ্ঠ ভোটে জয়লাভ করে। যে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাকিস্তান সৃষ্টির আগ পর্যন্ত কংগ্রেস মন্ত্রী সভা গঠন করত সেখানে ৯৭ টি আসনের মধ্যে ৪টি আসন ছাড়া সব আসনেই মুসলীম লীগ জয় লাভ করে। সরকার গঠন করে যেই সিন্ধু প্রদেশে নামে মাত্র মুসলীম লীগ মেজরিটি থাকাতে মন্ত্রী পরিষদ সব সময় টল টলায় মান ছিল। সেখানে ৪০টি আসনের মধ্যে ৭টি আসন ছাড়া সব আসনেই মুসলীম লীগ জয়লাভ করে। মোটকথা হলো পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় মুসলীম লীগ সরকার দ্বারা শোষিত ও শাসিত বঞ্চিত হওয়াতে খুবই জনপ্রিয়তা হারিয়েছিল। আর পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় মুসলীম লীগ শাসনামলে পাকিস্তানের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে থাকাতে ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষা-দীক্ষা-কৃষিকার্য ও সামরিক দিক দিয়ে তারা খুবই উন্নত হওয়াতে সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলীম লীগ খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

পাকিস্তানে প্রথম সামরিক জান্তা

১৯৫১ সনের মার্চ মাসে জেনারেল আকবর খানের নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক বিপথগামী সামরিক অফিসারের নিয়মতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাৎ করে ক্ষমতায় যাওয়ার অপচেষ্টা করায় তখনকার প্রধানমন্ত্রী নওয়াব জাদা লিয়াকত আলী খান মেজর জেনারেল (পরবর্তীতে ফিল্ড মার্শাল) আয়ুব খানের সহযোগিতায় মেজর জেনারেল আকবর খান ও তার দল বল সকলে ধরা পড়ে, তাদের বিচার হয় ও অনেকে সাজাপ্রাপ্ত হয়।

পাপও লুকায় না, সাগরও শুকায় না

যে সকল ক্ষমতাধর বেকসুর জনতা হত্যাকারী, প্রাসাদ কুচক্রী, যারা সাধারণ মানুষ বা নিয়মিত আইন আদালত, কোর্ট কাচারির বিচারের ধরা ছোঁয়ার বাইরে ইতিহাসে দেখা যায় তাদের বিচার ও সাজা দেয়ার ভার স্বয়ং আল্লাহতালা গ্রহণ করেন। যেমন ১৭৫৭ সালে নওয়াব সিরাজুদ্দৌলার প্রধান মন্ত্রী ও সিপাহশালার মীর জাফর আলী খানের নেতৃত্বে কয়েকজন কুচক্রীর দেশদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বহু মর্দে মুজাহিদ, নওয়াব সিরাজুদ্দৌলা, মীর মদন, মোহন লাল ও আরও বহু সৈন্য সামান্ত প্রাণ দিয়েছিলেন। মীর জাফর প্রমুখের

বিশ্বাসঘাতকতায় শুধু বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীনতা সূর্য ডুবে যায়নি– বিশাল ভারত উপমহাদেশকে ইংরেজ জাতির প্রায় দুই শত বৎসর গোলামী করতে হয়েছিল। এই পাপিষ্ঠ বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকে মানুষ সাজা দিতে না পারলেও আল্লাহ তাকে এক মারাত্মক কুষ্ঠ রোগে ও তার পুত্র মীরণকে বজ্রাঘাতে জীবনাবসান করেছিল। মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার একান্ত সহযোগী উমিচাঁদ যখন দেখতে পেল যে তার সহযোগিতার জন্য রবার্ট ক্লাইভ তাকে কোন পুরস্কার বা পদক দেয়নি তখন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। বিশ্বাসঘাতক কুচক্রী জগৎশেঠ ও রাজা রাজবল্লভ তাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য হাত-পা বাধা অবস্থায় বিহারের মুঙ্গের দূর্গ শীর্ষ থেকে নবাব মীর কাসেম কর্তৃক গঙ্গানদীতে নিক্ষিপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। আর এক কুচক্রী নন্দ কুমারকে ওয়ারেন হেষ্টিংস মিথ্যা মামলায় আসামী করে ফাঁসিতে ঝুলায়। তারপরে পলাশী যুদ্ধের প্রধান নায়ক রবার্ট ক্লাইভ বিলেতে বিচারে সাজা পাবার ভয়ে আত্মহত্যা করে মারা যায়।

ভারতের শেষ গভর্ণর জেনারেল মাউন্টব্যাটেন যার অশুভ ইঙ্গিতে তদানীন্তন পাকিস্তান মুসলিম মেজরিটি গুরুদাসপুর জেলা, পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশে মুসলিম সংখ্যাগরীষ্ঠ জেলা সিলেট করিমগঞ্জ হারায় মাউন্ট ব্যাটেনের রাজনীতির প্রজ্ঞাহীনতার কারণে ভারতের অসংখ্য হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িকদাঙ্গা-হাঙ্গামায় প্রাণ হারায়। কোটি কোটি মানুষ প্রিয়জন ও আত্মীয় স্বজন হারিয়ে গৃহহারা, ছিন্ন মূল হয়ে উভয় দেশে শরণার্থী হতে বাধ্য হয়, যে মাউন্টব্যাটেনের অপকৌশলের কারণে কাশ্মীরের মুসলমান জনগণ আজ প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল যাবত ভারতের অত্যাচার অবিচার ও জুলুমের শিকার হয়েছে ও এখনও হচ্ছে সেই ক্ষমতাধর মাউন্ট ব্যাটেনকে যখন নিয়ম তান্ত্রিক কোর্ট কাচারি বিচার করতে পারলনা তখন আল্লাহ তালার গজবে বড় করুণভাবে মাউন্ট ব্যাটেনকে বৃদ্ধ বয়সে তারই প্রমোদতরীতে বোমার বিষ্ফোরনের আঘাতে তার দেহ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে প্রাণ হারায়। তার পরে ভারতের এককালের প্রধানমন্ত্রী প্রয়াতঃ ইন্দিরা গান্ধী ও তৎপুত্র সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী কাশ্মীরে মুসলিম গণহত্যা, পাঞ্জাবে শিখদের পবিত্র স্বর্নমন্দির অপবিত্রকরণ, গুরু ভিন্দেনারায়ণ সহ বহু বহু শিখ হত্যা, বাংলাদেশের পূর্ব দিকে ত্রিপুরা রাজ্যে তথাকথিত শান্তিবাহিনীকে খাওয়া, পরা প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রপাতি দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙ্গালী মুসলমান নিধন যজ্ঞ চালান যা আজও অব্যাহত আছে, যারা পার্শ্ববর্তী শান্তিপ্রিয় বৌদ্ধ রাজ্য শ্রীলংকার স্বাধীনতা হরণের জন্য তামিলদের ভারতের দাক্ষিণাত্যে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র পাতি দিয়ে শ্রীলংকায় নির্বাচিত সরকার উৎখাতের আগুন জ্বেলেছিল মানুষ যখন এই ক্ষমতাধরদের বিচার করতে অসমর্থ হলো তখন তারা

আল্লাহর পরিকল্পনানুযায়ী নিজেদের লোকদ্বারা কত করুণভাবে নিহত হয়েছিল। এরূপভাবে স্বদেশের ও বিদেশের বহু উদাহরণ দেয়া যায়। যে ক্ষমতাধরদের বিচার যখন সাধারণ মানুষ করতে পারে না তখন তাদের পাপের জন্য আল্লাহ স্বয়ং বিচারের ব্যবস্থা করেন।

লিয়াকত আলী হত্যা

কায়েদে আযমের মৃত্যুর পরে পূর্ব পাকিস্তানের খাজা নাজিমুদ্দীন পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল হলেন। প্রধানমন্ত্রী রয়ে গেলেন পূর্বের মতন নওয়াব জাদা লিয়াকত আলী খান। যিনি ভারতীয় শরণার্থী। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী দু'জনার কেহ প্রকৃত পশ্চিম পাকিস্তানের বাসিন্দা নয়। তাই ক্ষমতালোভী পাঞ্জাবী সিনিয়র সরকারী অফিসার ও কোন কোন নেতৃস্থানীয় ক্ষমতালোভী রাজনীতিবিদ প্রাসাদ ষড়যন্ত্র শুরু করে দিলেন। তখন সংসদীয় গণতন্ত্র অনুযায়ী ক্ষমতার মালিক ছিলেন প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান। খাজা নাজিমুদ্দীন নেহায়েত শান্তি প্রিয় ও আনুষ্ঠানিক ক্ষমতাবিহীন গভর্ণর জেনারেল। তাই ক্ষমতালোভী পাঞ্জাবী কুচক্রী দল চক্রান্তের চোরাগলি পথে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের নিখুঁত পরিকল্পনা করলেন। ১৯৫১ সনের ১৬ই অক্টোবর রাওয়ালপিণ্ডিতে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় বক্তৃতা দানকালে প্রকাশ্য দিবালোকে আততায়ীর গুলিতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান শাহাদাত বরণ করেন। তার মুখ নিসৃত শেষ বাক্য ছিল "আল্লাহ পাকিস্তানকে হেফাজত করো।" যাতে এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের কোন স্বাক্ষী প্রমাণ জীবিত না থাকে সে জন্য পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী এই হত্যাকাণ্ডের হোতা আকবরকে তক্ষুণি একজন পাঞ্জাবী পুলিশ হাবিলদার গুলি করে হত্যা করে। পাকিস্তানবাসী বিশেষ করে মরহুমের পত্নী বেগম লিয়াকত আলী খানের বারবার চেষ্টা সত্ত্বেও পাকিস্তান ক্ষমতাসীন চক্র আজো তার হত্যাকাহিনীর রহস্যের রিপোর্ট প্রকাশ্যে বাহির করেনি।

পাঞ্জাবীদের মসনদ দখল

সাদাসিদা ভালো মানুষ গভর্ণর জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দীনকে ঐ পাঞ্জাবী চক্র বোঝালেন যে, প্রকৃত ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে আর তার চেয়ে উপযুক্ত, অভিজ্ঞ

জননেতা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার উপযুক্ত আর কেহ নাই। কাজেই তারা খাজা নাজিমুদ্দীনকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করল এবং তার শূন্যপদে পাঞ্জাব অধিবাসী পুরাতন সরকারী কর্মচারী ও বর্তমান অর্থমন্ত্রী গোলাম মোহম্মদকে গভর্ণর জেনারেল করা হলো। পাঞ্জাবী চক্রান্ত এখানেই শেষ হয়নি। কিছুদিনের মধ্যেই গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদকে দিয়ে নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রীসভা গণপরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে দিয়ে অন্তবর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বসালেন। তখন গণপরিষদের স্পীকার ছিলেন স্বনামধন্য প্রবীণ শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হকের সহকর্মী মৌলভী তমিজউদ্দিন খান। গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের বে-আইনী গণ পরিষদ ভেঙ্গে দেয়ার বিরুদ্ধে মামলা করলেন গণপরিষদের স্পীকার মৌলভী তমিজউদ্দীন খান। বিলেত থেকে প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার ডি, এন প্রিট ও অন্যান্য ব্যারিষ্টার আনা হলো। যাদের আন্তর্জাতিক সাংবিধানিক আইন সম্মন্ধে পারদর্শিতা ছিল। হাইকোর্টে তমিজউদ্দীন খান জিতলেন। অর্থাৎ গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ বে-আইনী ভাবে গণপরিষদ ভেঙ্গে দিয়েছেন বলে রায় দিলেন।

সরকারও নাছোড় বান্দা। তারা সুপ্রীম কোর্টে আপীল করলেন। পাঞ্জাবী চক্রের ভাগ্য প্রসন্ন। সুপ্রীম কোর্টের চীফ জাষ্টিসও ছিলেন একজন পাঞ্জাবী বিচারক। তাই সুপ্রীম কোর্টের রায় উল্টো হয়ে গেল। অর্থাৎ গণপরিষদ ভেঙ্গে দেয়া সঠিক হয়েছে বলে রায় হলো। কাজেই প্রথম পাঞ্জাবী গভর্ণর জেনারেল আইনানুগভাবে দেশ শাসনের স্বাদ উপভোগ করতে শুরু করলেন। গোলাম মোহাম্মদকে আমি গভর্ণর জেনারেল হিসেবে অতি কাছে থেকে দেখেছি কোয়েটাতে। জনশ্রুতির সাথে আমিও একমত যে, গোলাম মোহাম্মদ ছিলেন একজন অর্ধউন্মাদ। তিনি পাকিস্তানে প্রথম স্বৈরতান্ত্রিক শাসন কায়েম করেছিলেন। এর কিছুদিন পরে তার আরও মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে পরে এক সময় তার মৃত্যু হয়।

এবার দৃষ্টি ফেরানো যাক পূর্ব পাকিস্তানের দিকে। টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে সরকারী মুসলীম লীগ পার্টি পরাজিত হওয়ার পরে মসনদ হারাবার ভয়ে প্রায় সাত বছর হতে চলল পূর্বপাকিস্তানে তখনও কোনো সাধারণ নির্বাচন হয়নি। যদিও পূর্ব পাকিস্তানের সহ-অঙ্গ পশ্চিমপাকিস্তানে বহু পূর্বেই ১৯৫১ সনে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এই যে, পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচন তখনও হয়নি, সেজন্য পূর্ব পাকিস্তান সরকার জনগণের নিকট খুবই লজ্জিত। বিরোধী দলের আন্দোলনের মুখে ইলেকশন না দেয়ায় তারা কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখাতে পারছে না। তাই স্বদেশ ও বিদেশের রাজনৈতিক চাপে পড়ে ১৯৫৪ সনের ৮ থেকে ১২ই মার্চ পর্যন্ত সাধারণ নির্বাচন হয়। ভাষা

আন্দোলনের উত্তালস্রোতে নির্বাচন না দিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার অপরাধে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম সরকার শেরে বাংলা ফজলুল হক, মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্টের নিকট সরকারী মুসলীম লীগ দল গো–হারা হেরে গেল। তখন পৃথক নির্বাচন। অর্থাৎ মুসলমানগণ মুসলমান সদস্য পদপ্রার্থীকে এবং হিন্দুরা হিন্দু সদস্যপদ প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আইন ছিল। ২৩৭টি মুসলিম নির্বাচনী কেন্দ্র হতে ২২৩ টি আসন পায় যুক্তফ্রন্ট, মুসলীম লীগ পায় মাত্র ৯টি আসন। বাকি ৫টি আসন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা লাভ করে। তখনকার দিনে আইন ছিল কোন রাজনৈতিক দল কমপক্ষে ১০টি আসন না পেলে তাদের রাজনৈতিক দলের নামে কোন পার্লামেন্টারী পার্টি গঠন করতে পারবে না সে হিসেবে মুসলীম লীগ পার্টির পার্লামেন্টারী পার্টি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার উপক্রম দেখে স্বতন্ত্র প্রার্থী আজীবন মুসলিম লীগের নিবেদিত প্রাণ–কর্মী যাকে মুসলীম লীগ নমিনেশন দেয়নি চট্টগ্রামের সেই ফজলুল কাদের চোধুরী স্বতন্ত্র ভাবে জিতে ও তার আজীবন প্রিয় মুসলীম লীগ পার্টিতে যোগ দিয়ে মুসলীম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি গঠন করে মুসলিম লীগের ইজ্জত রক্ষা করে। ক্ষুদ্র মুসলীম লীগ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধীদল গঠন করে। এবং যুক্তফ্রন্ট অতি সহজেই সরকার গঠন করলেন।

যুক্তফ্রন্টের নেতা শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হককে গভর্ণর এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতা মরহুম আতাউর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী করে মন্ত্রীপরিষদ গঠন করা হয়। এই মন্ত্রীপরিষদের শেরে বাংলার কৃষক প্রজা পার্টি, মাওলানা ভাসানীর আওয়ামী লীগ, মাওলানা আতাহার আলীর নেজামে ইসলাম প্রভৃতি পার্টি নিয়ে এক মিশ্র বা ইউনাইটেড মন্ত্রীপরিষদ গঠন করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এতদিন পরে গণতান্ত্রিক নির্বাচিত সরকার পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। পূর্ব পাকিস্তানবাসী পাকিস্তান আমলের এই একটি সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ইলেকশনের স্বাদ পেয়ে জনগণ বিজয়ের আনন্দ উৎসব করে।

এই ইলেকশন যে সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ ছিল তার একটি বড় প্রমাণ এই যে, এই প্রথম সরকারীদল সাধারণ নির্বাচনে হেরে গেল। শুধু হেরে গেল বললে ভুল হয় প্রায় নির্মূল হয়ে গেল। তার পরে একটানা ১৯৯০ সন পর্যন্ত অর্থাৎ প্রধান বিচার পতি সাহাবুদ্দিনের অন্তবর্তীকালীন সরকার নিয়ন্ত্রিত ১৯৯০ সনের নির্বাচন পর্যন্ত পূর্বপাকিস্তানে বাংলাদেশের অধিবাসীরা আর কোনদিন নিরপেক্ষ, সুষ্ঠ, গণতান্ত্রিক ইলেকশন দেখেনি। ১৯৫৪ সনের পর থেকে সব সময় সরকারী পার্টিই ইলেকশনে

বিপুল ভোটে জিতেছে। আর জনগণ ভোটে কারচুপি, ভোট ডাকাতি, মিডিয়া কু ইত্যাদি বলে প্রতিবাদ, মিছিল সভা-সমিতি করেছে।

পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী মরহুম আতাউর রহমান খানের সময় পার্টি কোন্দল, হিংসা, স্বার্থের সংগ্রাম ইত্যাদির জন্য পার্টির মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি হল। মানুষের অভাব অভিযোগ তখনও ছিল। বরাবর কিছুটা থাকবেই কিন্তু কোন্দলে অস্থির হয়ে এবং আতাউর রহমান খানের স্বদল আওয়ামী লীগ নেতা ভাসানীর বিরুদ্ধাচরণে যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গনের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল। আতাউর রহমান খান তার অভিজ্ঞতা প্রসূত বইতে লিখেছেন যে, পাঁচমিশালী দল দিয়ে জারিগান করা যায় কিন্তু সরকার চালান যায় না।

হলোও তাই, দলীয় কোন্দলের বাড়াবাড়িতে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ডিপুটি স্পীকার জনাব শাহেদ আলীকে সংসদের মধ্যেই সম্মানিত নির্বাচিত সদস্যরা এমন মার দিলেন যে তিনি এই মারের ফলশ্রুতিতে দুই তিন দিনের মধ্যেই ইহধাম ত্যাগ করলেন। এবং এই মারামারিতে কয়েকজন সংসদ সদস্য গুরুতর আহত হলেন। সদস্যগণ সেদিন দস্যুতার বিরল নিদর্শন রাখলেন।

এই এক লজ্জাষ্কর ঘটনার সাথে যোগ দিল আদমজী নগরের শ্রমিকদের মধ্যে দলীয় কোন্দল। কেন্দ্রীয় সরকারের উস্কানীতে বিহারী শ্রমিকদের মারমুখো আক্রমণ। সে যেন এক ছোট খাটো যুদ্ধ। নিহত হলো বেশ কয়েকটি শ্রমিক।

এই সুযোগ সন্ধানে ছিল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার। তাদের কথায় পূর্ব পাকিস্তান সরকার অযোগ্য, সংসদ সদস্যরা উচ্ছৃংখল। বাংলাদেশে কমুনিষ্টদের অপ্রতিহত হাঙ্গামার সৃষ্টি যা পূর্ব পাকিস্তান সরকার কিছুতেই বন্ধ করতে পারছেন না। এই সকল সত্য–অসত্য ঘটনার অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তান সরকার ও প্রাদেশিক পরিষদ বাতিল করে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হককে স্ব-গৃহে অন্তরীণ করে ৯২ ক ধারা অর্থাৎ প্রাদেশিক গভর্ণর শাসন জারী করল। এতে সারা পূর্ব পাকিস্তানে হরিষে বিষাদ নেমে এল।

লোভে পাপ পাপে মৃত্যু

ক্ষমতার লোভ বড় লোভ। এই ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে চক্রান্ত করে হত্যা করা হলো। মসনদ লাভ করার পরেও ক্ষমতায় যাতে আমরণ থাকা যায় তার চেষ্টা চলতে লাগল। পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বিজয়ী যুক্তফ্রন্টকে ভেঙ্গে দেয়া হলো। পাকিস্তানের গণপরিষদ ভেঙ্গে

দেয়া হল। বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে দিয়ে ট্যালেন্ট সরকার গঠন করা হলো। ভাগ্যের কী পরিহাস যে মোহাম্মদ আলী ১৯৪৬ সনে সোহরাওয়ার্দীর বঙ্গীয় মন্ত্রীসভায় অর্থমন্ত্রী ছিলেন ক্ষমতার লোভে পাকিস্তানের সেই মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রী সভায় জনাব সোহরাওয়ার্দী হলেন আইন মন্ত্রী। শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দীর সম্পর্ক ছিল সাপে নিউলে। তিনিও পাঞ্জাবী চক্রের চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রী সভায় যোগদান করে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাসাম্যের ভিত্তিতে ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন সেই ফজলুল হককে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন কারণে রাষ্ট্রদ্রোহী বলে আখ্যা দিয়েছিলেন– সেই ফজলুল হককে ১৯৫৫ সনে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদ দিয়ে পুরস্কৃত করেন। ক্ষমতায় যাওয়ার লোভ এক সাংঘাতিক ব্যাপার। ক্ষমতায় যাওয়ার লোভে গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলে কথিত সোহরাওয়ার্দী সাহেব পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রদেশ ভেঙ্গে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান নামক এক প্রদেশ (ওয়ান ইউনিট) কায়েম করলেন। তার পরে সংখ্যাগরীষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানবাসিকে সংখ্যালঘিষ্ঠ পশ্চিম পাকিস্তানবাসীর রাজনৈতিক সমপর্যায়ে নিয়ে এসে সোহরাওয়ার্দী সাহেব ১৯৫৬ সনের পাকিস্তান গঠনতন্ত্র রচনা করলেন। সেই গঠনতন্ত্রের আইনে শেরে বাংলার মতন গরীবের জন্য ডাল ভাতের বন্দোবস্তকারী প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর চাকুরি করলেন।

উপরোক্ত রাজনৈতিক পদক্ষেপ ও ১৯৫৬ সনের গঠনতন্ত্র কোনটা গণতান্ত্রিক ছিল? এত করেও কী আওয়ামী লীগ বা কৃষক শ্রমিক পার্টি বা যুক্ত ফ্রন্ট শেরে বাংলা বা সোহরাওয়ার্দী কেউই কী বেশি দিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পেরেছিলেন? সেই গোলাম মোহাম্মদ পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল হয়ে যখন পূর্বপাকিস্তানে প্রথম সফরে আসেন তখন তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্য পূর্ব পাকিস্তানের তদানীন্তন আওয়ামী লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির যে হাস্যাস্পদ ও তীব্র প্রতিযোগিতা হয়েছিল তা যারা দেখেছেন তারা বলবেন যে, ক্ষমতার লোভে আমাদের নেতারা কত নীচুতে নামতে পারেন। কিন্তু এত করেও কেউই তো বেশি দিন ক্ষমতায় টিকতে পারলেন না। পূর্ব পাকিস্তানের এই নেতৃত্বের কোন্দলের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকবৃন্দ শেরে বাংলা ও তার কৃষক প্রজা পার্টি, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং তার আওয়ামী লীগকে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদগণ যথেচ্ছ ব্যবহার করার পর প্রয়োজন শেষে ভাঙ্গা কুলার মতো ক্ষমতার গদি থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তাই পূর্ব পাকিস্তানবাসী পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের সঠিক ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে দুর্ভাগ্য ক্রমে ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত হতেন।

সুয়েজ খালের জাতীয়করণ

স্বাধীন মিশরের বুকের উপর দিয়ে ভূমধ্যসাগর হতে লোহিতসাগর পর্যন্ত প্রায় ১০০ মাইল দীর্ঘ সুয়েজ খালটি উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জাহাজ চলাচল শুরু করে। কিন্তু এর নির্বাহী ক্ষমতা থাকে পুঁজি নিয়োগকারী ও নির্মাণ কর্তা ফ্রান্স ও বৃটেনের হাতে। যে খালের যাতায়াতগামী জাহাজ থেকে রাজস্ব আদায়ের সিংহভাগ নিয়ে যেত বৃটিশ ও ফরাসী জাতি। কিন্তু মিশরের দুর্বল রাজতন্ত্র বৃটিশ ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করতে সাহস পেত না। তাই অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই হোক বা স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্যই হোক বা উভয় কারণেই হোক তদানীন্তন মিশরের প্রেসিডেন্ট আরব বিশ্বের প্রিয় নেতা জামাল আব্দুল নাসের সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করার সিদ্ধান্ত নেন। তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৃটিশ ও ফরাসী নির্বাহী কর্মচারিদের নিকট থেকে সকল ক্ষমতা মিশরবাসী গ্রহণ করে। এতে ক্ষীপ্ত হয়ে বৃটিশ সামরিক বাহিনী এই এলাকায় মিশরীয়দের উপর সশস্ত্র হামলা বা ছোট খাটো যুদ্ধ পরিচালনা করে। মিশরের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী এই হামলার প্রতিবাদে ঢাকা শহরে বিক্ষোভ ও মিছিলে ফেটে পড়ে। ৩রা নভেম্বর ঢাকার ক্ষীপ্ত জনতা পুরানা পল্টনস্থ বৃটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস ভবনটি আগুন দিয়ে ভস্মীভূত করে দেয়। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ নেতা ও পাকিস্তানের মন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী বৃটিশ ও ফরাসি সরকারকে সমর্থন দিয়ে এমন অবস্থা করলেন যাতে সমস্ত আরব জাহান পাকিস্তানের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। তাই এই আরব প্রধান বিরোধী এবং মুসলিম ঐক্যের পরিপন্থী কাজ আরবরা বহুদিন দুঃখের সাথে মনে রেখেছিলেন। ১৯৬১ সনে আমি যখন লেবাননের রাজধানী বৈরুত হয়ে ইয়োরোপে যাই তখন সাধারণ আরবদের এই সোহরাওয়ার্দী সাহেবের বৃটিশ ও ফরাসি সমর্থন সূচক উক্তির বিরুদ্ধে বিরক্ত ও ঘৃণা প্রকাশ করতে দেখেছি।

ইস্কান্দার মীর্জা গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত

কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুর পরে যে প্রাসাদ রাজনীতি ও ষড়যন্ত্র পাকিস্তানে জন্ম নেয় তার ফলাফলরূপে কয়েকজন গভর্ণর জেনারেল এবং কয়েকটি মন্ত্রীসভার অস্বাভাবিক উথান-পতন ঘটে। গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ অসুস্থতার কারণে ছুটি নিলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ইস্কান্দার মীর্জা (মুর্শিদাবাদ নবাব পরিবারের বংশধর) ১৯৫৫ সনের ৫ই আগষ্ট প্রথমে ভারপ্রাপ্ত তারপরে

গোলাম মোহাম্মদের মৃত্যুর পর পাকিস্তানের স্থায়ী গভর্ণর জেনারেল পদে নিযুক্ত হন। আমেরিকার একাংশ বিশ্বাসভাজন বগুড়ার মোহম্মদ আলীর নেতৃত্বে মুসলীম লীগ ও যুক্তফ্রন্ট কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয় ১০ই আগষ্ট ১৯৫৫ সনে। শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হককে এককালে রাষ্ট্রদ্রোহী অভিযোগে অভিযুক্ত ও গৃহবন্দী করেছিলেন।

ইস্কান্দার মীর্জার ষড়যন্ত্রকারী মন্ত্রীসভার প্রয়োজনে সেই শেরে বাংলাকেই আবার পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত করেন। এইভাবে আরও কিছুদিন চলে। আদর্শবিহীনরাজনীতিবিদদেরউথান-পতন মন্ত্রীসভা পরিষদ গঠন ও ভাঙ্গন। যা দেখে পাকিস্তানের জনগণ সরকারের প্রতি সম্পূর্ণ অনীহা ও অবিশ্বাস স্থাপন করে আগেই বলেছি প্রচার করা হতো পূর্ব পাকিস্তান ভারতীয় কংগ্রেসের অংশ। জেলা সাব ডিভিশন ও থানা সংগঠন পর্যায়ে নিজেদের দুর্বল ও অসহায় দেখে পাকিস্তান সৃষ্টিকারী মুসলিম লীগের বিরোধীদল আওয়ামী মুসলিম লীগের মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু সংগঠন কংগ্রেসকে এর সামিল করে নেন। এর ফলে মুসলিম লীগের উপযুক্ত বিরোধী দল গঠন সহজ হয়। তাই ১৯৫৫ সনের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে তিনদিন যাবত কাউন্সিল মিটিং করে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে শুধু আওয়ামী লীগ গঠিত হয়। তখন থেকে আওয়ামী লীগ পুরাতন হিন্দু কংগ্রেস নেতা কুমিল্লার ধীরেন দত্ত, ফরিদপুরের ফণী মজুমদার প্রমুখ স্থান পায়। আজও তাদের উত্তর সুরীরা আওয়ামী লীগের মাধ্যমে এদেশে রাজনীতি করে যাচ্ছেন। তাই আওয়ামী লীগের বিরোধীরা আওয়ামী লীগকে ভারতীয় কংগ্রেসের অংশ বলে আখ্যায়িত করেন। এই দলের সর্ব-পাকিস্তান দলনেতা মিঃ সোহরাওয়ার্দী ও পূর্ব পাকিস্তানের আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর যৌথ নেতৃত্বে ও ব্যক্তিত্বে এই সংগঠনকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হয়! মুসলিম লীগের পাকিস্তান সরকার একটানা বহুদিন পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের ন্যায্য দাবী দাওয়া থেকে বঞ্চিত ও আর্থিক শোষণের কারণে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে খুবই জনপ্রিয় ও শক্তিশালী হয়ে উঠে।

আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার

পাকিস্তানের প্রাসাদ রাজনীতি এক পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহম্মদ আলীর ক্ষমতা খর্ব করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার ইঙ্গিতে সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেস নেতা ডাঃ খান সাহেবের নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানে রিপাবলিকান পার্টি

(অধুনা লুপ্ত) প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষমতার লোভে মুসলীম লীগ সদস্যরা দলে দলে রিপাবলিকান পার্টিতে যোগদান করে। যেখানে নীতির কোন বালাই নাই, নেতার প্রতি কোন আনুগত্য নাই সে দেশে কী না হয়। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী মনের দুঃখে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন এবং নেজামে ইসলাম পার্টিতে যোগদান করেন। আর ওদিকে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভায় শপথ নেন। যদিও এই মন্ত্রীসভা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। গণতন্ত্রের মানসপুত্ররা যখন আদর্শবিহীন সরকার গঠনের পুতুল খেলার শামিল হলেন তখন গণতন্ত্র লজ্জায় পাকিস্তান থেকে বিদায় নিল।

ভাসানীর ঐতিহাসিক আচ্ছালামু আলাইকুম

১৯৭২ সনে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার বহু পূর্বে ১৯৫৫ সনের ১৭ই জুন রোজ শুক্রবার ঢাকার পলটন ময়দানে এক ঐতিহাসিক জনসভায় সভাপতির ভাষণে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারী ঘোষণা করেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের শোষণ-শাসনের মনোবৃত্তি ত্যাগ না করলে পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা 'আচ্ছালামু আলাইকুম' বলতে বাধ্য হবে। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে যাবে। যদিও পশ্চিম পাকিস্তানে এই ভাষণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল প্রচুর। শুধু প্রতিবাদের জন্য কিন্তু প্রতিকার করা হয়নি কিছুই। তাই মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানীর হুঁশিয়ারীবাণীর প্রতিফলন ঘটল, বাংলাদেশ স্বাধীন হলো, ১৯৭২ সনে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির জন্ম

মুসলিম লীগের ন্যায় আওয়ামী লীগও পূর্ব পাকিস্তানের দাবী-দাওয়া জলাঞ্জলি দিয়ে শুধু মন্ত্রীত্ব করনের আয়েশে এবং সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়বৃত্তি করনের জন্য রাজনীতি করাতে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিবিদদের ও আওয়ামী লীগের মধ্যে এক বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তাই মজলুম নেতা মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৫৭ সনে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) নামে এক জাতীয়পার্টির জন্ম নেয়। এই দলের মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল শুধু পূর্ব পাকিস্তানে নয় সারা পাকিস্তানের কৃষক-শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত— ভূমিহীন ও ক্ষেত মজুরদের সার্বিক মুক্তি ও জনগণের খাদ্য-বস্ত্র-চিকিৎসা স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।

পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রে পরিণত করা— ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির এই জনকল্যাণমুখী ডাক কমুনিষ্ট সোসালিষ্ট ও সর্বহারাদের হৃদয় স্পর্শ করে। তাই তারা হুড় হুড় করে ন্যাপে যোগদান করে। ন্যাপের এই রং দেখে বিরোধী মুসলীম লীগও আওয়ামী লীগ উভয়ই মাওলানা ভাসানী ও তার ন্যাপকে বেনামী কমুনিষ্ট পার্টি আখ্যা দিতে থাকে। দুর্বল কমুনিষ্ট সম্প্রদায় হয়তো মাওলানা ভাসানীর শক্তিশালী নেতৃত্বে কমুনিজমের স্বপ্ন দেখে থাকবে। কিন্তু আসলে মাওলানা ভাসানী ছিলেন খাঁটি মজলুম জননেতা ও একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম। তাই কমুনিষ্ট ও সোসালিষ্টরা মাওলানা ভাসানী হতে কেটে পড়েন। মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মাওলানা ভাসানী তার মুরীদানদের নিয়ে ইসলাম ও মজলুম জনগণের খেদমত ও সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন।

ইস্কান্দার মীর্জার অপসারণ

ইতিহাস বিখ্যাত ষড়যন্ত্রকারী মুর্শিদাবাদ মীরজাফর পরিবারের উত্তরসূরী গভর্ণর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা ও তার পূর্বসূরীদের ন্যায় ষড়যন্ত্র পারদর্শীতায় ষড়যন্ত্রে প্রধানমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খান নুনের সমর্থনে নিজেও প্রতিশ্রুতি দেন এবং আদর্শবিহীন ক্ষমতা লিপ্সু সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগেরও সমর্থন আদায় করে দেন। খুব সম্ভব ১লা কি ২রা অক্টোবর ১৯৫৮ সালে এই নতুন মন্ত্রীসভায় ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯ সনে সারা পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ধার্য্য হয়। আমিও পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে হিজলা মুলাদী ও মেহেন্দীগঞ্জ থানায় জনগণের সাথে যোগাযোগ করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। ৮ই অক্টোবর ১৯৫৮ সনে খুব সকালে আমি নৌকাযোগে মফঃস্বল থেকে পাতারহাটে পৌঁছে দেখলাম একটা দোকানে রেডিওতে খবর বলছে আর বহু লোক উৎসাহ সহকারে রেডিওর খবর শুনছে। এত লোকের অস্বাভাবিক ভীড় দেখে আমারও কৌতূহল হলো খবর শুনবার। গিয়ে শুনি ৭ই অক্টোবর মধ্যরাত্রিতে গভর্ণর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা সমগ্র দেশব্যাপী সামরিক শাসন ঘোষণা করেছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা বরখাস্ত করেছেন। ও প্রাদেশিক পরিষদ বাতিল করেছেন। সকল রাজনৈতিক দল ও তাদের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সংবিধান রহিত করেছেন এবং প্রধান সেনাপতি জেনারেল মোহাম্মদ আয়ুব খানকে প্রধান সামরিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছেন। আর জনগণ হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে

করতালির মাধ্যমে এই খবর শুনে তাদের আনন্দ প্রকাশ করছেন। এই জনগোষ্ঠীর সামরিক শাসনকে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানাতে আমার নিকট এই প্রতীয়মান হলো যে, পাকিস্তানের জনসাধারণ বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানবাসী তদানীন্তন প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ও রাজনীতিবিদদের স্বার্থপরতা ও কর্মহীনতার কারণে জনগণ সরকার থেকে এবং রাজনীতিবিদদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। তারপর মরার উপড়ে খাড়ার ঘা হিসেবে তদানীন্তন সরকারী কর্মচারিদের উৎকোচ গ্রহণ, চোরাচালানী, কালো বাজারীদের স্বর্গরাজ্য পাকিস্তানে বিশেষ করে পূর্বপাকিস্তানে দ্রব্য মূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতা নাগালের বাইরে চলে যাওয়াতে মানুষ এই জগদ্দল পাথরের মতো জনস্বার্থ বিরোধী সরকার অপসারণ বিকল্প হিসেবে সামরিক সরকারকেই অভিনন্দন জানাচ্ছে। আমার নির্বাচনে দাঁড়াবার প্রথম প্রয়াস ও স্বল্প দিনের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা বিফলে গিয়েছে দেখে আমি মনে মনে কিছুটা ক্ষুব্ধ হলেও জনগণের কাতারে দাঁড়ায়ে জনগণেরই একজন হিসেবে আমিও মার্শাল-লকে মনে মনে অভিনন্দন জানালাম। এই আশায় বুক বেঁধে যে, তুরস্কের জেনারেল গাজী কামাল পাশা ও মিশরের মেজর জামাল নাসেরের মতো জেনারেল আয়ুব খানও হয়ত পাকিস্তানকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যাবেন ও পৃথিবীর সভ্য সমাজে পাকিস্তানকে এক সম্মানিত আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন।

ক্ষমতা গ্রহণের অল্প কিছুদিন পরেই জেনারেল আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। তার আগমনোপলক্ষে ঢাকার ষ্টেডিয়ামে বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয়। দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদদের বিদায় দিয়ে সামরিক শাসনের অভ্যুত্থানে জনগণ যে কত আনন্দিত হয়েছিল তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে সামরিক প্রধান শাসনকর্তা।– জেনারেল আয়ুব খানকে সাধারণ লোকের বিশাল সমাবেশে আনন্দ মুখরিত প্রাণ ঢালা অভিনন্দনের মাধ্যমে।

জেনারেল আয়ুব খান যখন রাজধানী করাচী হতে হাজারো মাইল দূরে পূর্ব পাকিস্তান সফররত তখন আয়ুব খানকে ক্ষমতা থেকে সরাবার জন্য ষড়যন্ত্রে সম্রাট ইস্কান্দার মীর্জা কর্মব্যস্ত। তার গোপন প্রচেষ্টা ফাঁস হয়ে যাওয়াতে করাচীতে লেঃ জেনারেল আযম খান, লেঃ জেনারেল ডাব্লিউ এ, বারকী ও লেঃ জেনারেল কে, এম, শেখ খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে ঢাকাতে আয়ুব খানকে ইস্কান্দার মীর্জাকে সরাবার জন্য নির্দেশ দানের জন্য টেলিফোন করেন। তখন জেনারেল আয়ুব খান তার রক্তপাতহীন বিপ্লবকে রক্ত ঝরাতে বারণ করেন এবং তিনি করাচীতে না আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে আদেশ করেন। অক্টোবরের শেষের দিকে ষড়যন্ত্রের সম্রাট ইস্কান্দার মীর্জা পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং লণ্ডনের পথে

জন্মভূমি পাকিস্তান হতে চির বিদায় গ্রহণ করেন। লণ্ডনে গিয়ে নাকি উনি শেষ বয়সে হোটেলে চাকরি করে জীবন অতিবাহিত করেন। তার মৃত্যুদেহও দেশের মাটিতে স্থান পায়নি— এ হলো ষড়যন্ত্রের পরিণাম।

জেনারেল আয়ুব খানের সামরিক শাসন (মার্শাল-ল)

আগেই বলে রাখি মার্শাল-ল কোন নিয়মতান্ত্রিক ল বা আইন নহে। কোন সংসদ দ্বারা পাশ করা বিধিগত কোন আইন নহে। সামরিক শাসন কর্তাগণ খুশী মত যখন যা চাহেন তাই তারা হুকুম দিতে পারেন। এবং তা সামরিক ও বেসামরিক শাসকগণ ও জনগণ পালন করতে বাধ্য হন। এই সামরিক আইন বা মার্শাল-ল এর বিরুদ্ধে কোন কোর্ট কাচারি–হাই কোর্ট বা সুপ্রীম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা যায় না। কাজেই ইহা কোন সভ্য জাতির পক্ষে গ্রহণ যোগ্য আইন হতে পারে না।

কিন্তু তবুও কথা থাকে যেমন আমাদের দেহের কোন অংশ যদি এতই রোগ গ্রস্থ হয় যে, তা অস্ত্রোপচার ছাড়া আরোগ্য করা যায় না– তখন যেমন অস্ত্রোপচার করে সে দুরারোগ্য অংশটি যেমন হাত, পা, কিডনী, গল ব্লাডার, দাঁত প্রভৃতির একাংশ দরকার বোধে অস্ত্রোপচার করে ফেলে দেয়া হয়, রোগীর প্রাণ বাঁচানোর জন্য।— সেইরূপ কোন দুর্ভাগা দেশে দেশ বাঁচানোর জন্য, দেশের জন সাধারণের দুঃখ কষ্ট দূরীভূত করার জন্য, জনগণের সুশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য, চরিত্রহীন, স্বার্থপর কুশাসক– সে সরকারী কর্মচারী হোক, বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দই হোক, তাদের অপসারণ করবার জন্য কখনও কখনও কোন দেশের বিশেষ করে আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বে সামরিক শাসন বা মার্শাল-ল কখনো কখনো প্রয়োজন হয়, যেমন প্রয়োজন হয়েছিল গাজী মোস্তফা কামাল পাশার সময়ে তুরস্ক প্রজাতন্ত্রকে বাঁচাতে ও কুখ্যাত রাজতন্ত্র ও চরিত্রহীন, স্বার্থপর, কুচক্রী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হতে মিশরের প্রকৃত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করতে মিশরের মেজর জামাল নাসেরের সময়— সেরূপ পাকিস্তানেও দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারী ও রাজনৈতিকবৃন্দের উপর জনগণ এত অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল যে, পাকিস্তানের জনগণ জেনারেল আয়ুব খানের পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসনকে সেইরূপ স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন ও স্বাগত জানিয়েছিলেন।

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর পরই জেনারেল আয়ুব খানের সামরিক শাসন দুর্নীতি অলসতা ও অদক্ষতা ও কর্ম বিমুখতার জন্য পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের ডজন খানেক উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত অফিসার; তিনশতাধিক প্রথম শ্রেণীর চাকুরে ও

আড়াই হাজারের উপর নিম্নপদস্থ সরকারী কর্মচারিকে বরখাস্ত করেন পাবলিক অফিস ডিস কোয়ালিফিকেশন অর্ডিন্যান্স জারি করে কোন কোন প্রাক্তন মন্ত্রী ও আইন-পরিষদ সদস্যদের বিচারের ব্যবস্থা করেন। এ ভাবে তিনি বহু দূর্নীতিপরায়ণ রাজনৈতিক নেতা ও সরকারী কর্মচারিকে অপসারণ করে প্রশাসনের মধ্যে দক্ষতা, কর্মচাঞ্চল্য ও শৃংখলা আনয়ন করেন। বিশেষ কারণবশতঃ তাদের কেহ কেহকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করতেও সামরিক শাসন দ্বিধা করেনি।

এই সামরিক শাসনের আমলে বৈদেশিক মুদ্রাসহ সীমান্ত পাচারকারী, চোরাচালানী–মুনাফাখোরীদের বিরূদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সমুদ্র কিনারা হতে দুই টনের মতো স্বর্ণোদ্ধার করা হয়। সামরিক আইন ভঙ্গকারিকে কারাগারে নিক্ষেপ করা ছাড়াও দিবালোকে, জনসমক্ষে বিশেষ অপরাধীকে বেত্রদণ্ডও করা হতো। ফলে দেশে অন্যায়-অবিচার, চোরাচালানী, মুনাফাখোরী প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় হতে লাগল, দ্রব্যমূল্য বহুলাংশে কমে গিয়ে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার নাগালের মধ্যে আসল। পাকিস্তানে আবার সুদিন আসল, জনগণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, পাকিস্তান মন্ত্রীসভা খুশি হয়ে জেনারেল আইয়ুব খানকে ফিল্ড মার্শাল পদে অভিষিক্ত করলেন।

১৯৫৪ সনে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের মাধ্যমে আগেই জমিদারী প্রথা তুলে দেয়া হয়েছিল কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে সুবিধাবাদী জমিদার ছাড়া রাজনীতি করা প্রায় অসম্ভব ছিল। তাই ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানের সামরিক শাসন এই প্রথম বারের মতো পশ্চিম পাকিস্তানে ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার করেন। জলসেচ-সুবিধা প্রাপ্ত জমির ক্ষেত্রে ৫ শত একর ও জলসেচ ব্যবস্থাবিহীন জমির ক্ষেত্রে এক হাজার একর সর্বোচ্চ জমির মালিকানা নির্বাচন করে দেন। এভাবে ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান বিনা খেসারতে পশ্চিম পাকিস্তানের জায়গীর ও জমিদারী সমূহের বিলুপ্ত করেন। যা সামরিক শাসন ছাড়া প্রায় অসম্ভব ছিল।

করাচী হতে রাজধানী রাওয়ালপিণ্ডিতে স্থানান্তর

পাকিস্তান সৃষ্টিলগ্নে করাচীতে কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপনের বাড়িঘর, স্বল্পায়াসে পাওয়ার সুযোগ থাকাতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানের দক্ষিণ সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তের কাছাকাছি ও আরব সমুদ্র পাড়ে করাচী বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু দেশরক্ষা ব্যবস্থার নিরীখে এই সামরিক ব্যবস্থা মোটেই সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত ছিল না। তার পরে করাচী পাকিস্তানের প্রধান বন্দর

হওয়াতে কোন রাজধানী বন্দরগায়ে না হওয়াই বাঞ্ছনীয় যেমন পূর্ব বাংলার রাজধানী চট্টগ্রামে না হয়ে ঢাকায় স্থাপিত হয়েছে, ভারতের রাজধানী বম্বে বা কলিকাতাতে না হয়ে দিল্লীতে হয়েছে– সৌদী আরবের রাজধানী জেদ্দাতে না হয়ে রিয়াদে হয়েছে সেইভাবে সামরিক দিক দিয়ে বিচার করে এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল বেছে রাওয়ালপিণ্ডি জেলায় স্থানান্তর করা হয়। এই এলাকা স্থল ও জলযোগে ভারত থেকে আক্রমণ করা খুবই দুরূহ। মার্শাল-ল বা সামরিক শাসনামলে এ কাজটি যত সহজে করা হলো সংসদীয় শাসনামলে মোটেই করা যেত কিনা তাতে সবিশেষ সন্দেহ আছে।

দেশে একটি সংবিধান প্রণয়নকল্পে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন-এর নেতৃত্বে ১৯৬০ সনে একটি কনষ্টিটিউশন কমিটি গঠন করেন। ভোটাধিকার প্রশ্নে মতামত দানের জন্য 'ফ্রানচাইজ কমিশন' ভূমি ব্যবস্থার জন্য 'ল্যাণ্ড রিফর্ম কমিশন' খাদ্য ও কৃষি সমন্ধে 'ফুড এণ্ড এগ্রিকালচারাল কমিশন' শিক্ষা বিষয়ে 'এডুকেশন কমিশন' চিকিৎসা সমন্ধে 'মেডিকেল রিফর্ম কমিশন' এরূপ ভাবে পাকিস্তানের প্রত্যেক স্তরের জনগণের কল্যাণের জন্য বাস্তবমুখী সুপারিশ পাওয়ার জন্য ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান বিভিন্ন কমিশন নিযুক্ত করেন। এবং তাদের সুপারিশ মতো দেশব্যাপী উন্নয়নের কাজ তরান্বিত হতে লাগল। দশ বৎসরের ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানের শাসনামলে পাকিস্তানের প্রভূত উন্নয়ন বিকাশের সুযোগ হল। আমাদের বঙ্গভবন, বাংলাদেশ ব্যাংক ভবন, সংসদ ভবন, সুপ্রিম ও হাইকোর্ট ভবন, জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তার আমলের উন্নয়নের স্বাক্ষ্য বহন করে।

পূর্ব পাকিস্তান গভর্ণর পদে লেঃ জেনারেল আযম খান

পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শাসনামলে স্বল্পকালের জন্য প্রথম গভর্ণর নিযুক্ত হন জনাব জাকির হোসেন (প্রাক্তন ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য।) তাকে বদলী করে লেঃ জেনারেল আযম খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। আযম খানের আন্তরিকতা, বিভিন্ন খাতে উন্নতি বিশেষ করে তার কর্মদক্ষতা, সততা, এবং আন্তরিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানের জেলে ভাই, চাষী ভাই সহ সকল শ্রেণীর জনগণের মন কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেন। ১৯৬০ সনের উপর্যুপরি দুটি ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ফলে চট্টগ্রাম বন্দরনগরী ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহ যে ভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল সেই দুর্যোগ মুহূর্তে গভর্ণর আযম খান ত্বরিৎ গতিতে ও আন্তরিকতার সাথে বাংগালী

জাতিকে যে খেদমত করে গেছেন তা আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে চিরদিন মনে রাখব।

প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আয়ুবের বৈদেশিক নীতি : ভারত-পাকিস্তান-পূর্ব পাকিস্তান

ভারত চিরদিনই অবিভক্ত বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়কে অনার্য বলে ঘৃণা করে আসছে। যে সূত্রে পূর্ব পাকিস্তানবাসী হিন্দু-মুসলমানরা ভারতের হিন্দুদের নিকট অনার্য বলে ভারতের বর্ণ হিন্দুদের থেকে নীচু জাত ও তাদের মন থেকে দূরে অবস্থিত। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান জনসাধারণকে ভারতের বর্ণ হিন্দুরা তাদের আপন আর্যজাতির উত্তরসূরী বলে মনে করেন। এই মানবিক কারণে পাকিস্তানের সাথে দু'তিনবার সশস্ত্র যুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে খুব সদয় ব্যবহার এবং পূর্ব পাকিস্তানীদের সাথে ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার খুবই দুর্ব্যবহার করে আসছে যেমন পশ্চিম পাকিস্তান সিন্ধু নদের পানির অববাহিকা হতে যাতে পর্যাপ্ত পানি নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের মরু অঞ্চল শষ্য শ্যামল করতে পারে সেজন্য কোন কোন স্থান দিয়ে সিন্ধু নদের বিকল্প পানির প্রবাহ যাতে পশ্চিম পাকিস্তানের মূল সীমার মধ্য দিয়ে খনন করতে পারে তার জন্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাথে মিলিত ভাবে বহু টাকার আর্থিক সাহায্য দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রচুর পানি পাওয়ার সুব্যবস্থায় ভারত সরকার সহযোগিতা করেছে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের বেলায় ভারত সরকার ঠিক তার উল্টো অমানবিক পরিকল্পনা করে গঙ্গানদীর উপর ফারাক্কা বাঁধ তৈরী করে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গকে পানি বন্ধ করে মরুভূমিতে পরিণত করছে। দক্ষিণ বঙ্গকে বঙ্গোপসাগরের জোয়ারের লবণাক্ত পানিতে শস্যাদি পুড়িয়ে মেরে পূর্ব পাকিস্তানে অর্থাৎ আজকালকার বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করছে ইহা ব্যতীতও ভারত সরকার বাঁধ দিয়ে (প্রায় পঞ্চাশটি নদী) হয় পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশকে ন্যায্য পানি প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করছে। অথবা নদী ভাঙ্গনের সৃষ্টি করছে। এত করেও ভারতীয় সরকারের আমাদের দেশীয় লোকের উপর ঘৃণা ও অবহেলা মিটে নাই। ব্রহ্ম নদীর পানি খাল তৈরী করে আমাদের উত্তর বঙ্গের মধ্য দিয়ে ভারতের গঙ্গানদীর মধ্যে ব্রহ্ম নদীর পানি ঢেলে দিয়ে ব্রহ্ম নদের অববাহিকা অঞ্চলকে পানি বঞ্চিত ও মরুভূমি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের এই দু'মুখো নীতির জন্য তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশ খুবই দুর্ভোগ সহ্য করছে।

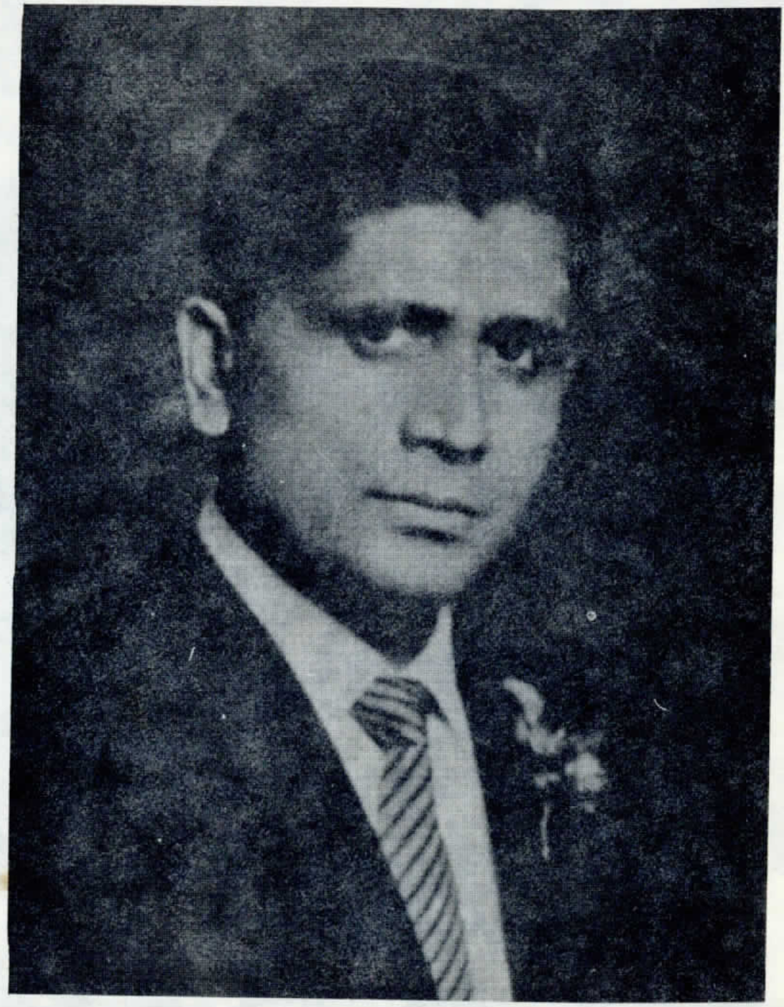

পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী মেজর (অবঃ) মুহাম্মদ আফসার উদ্দিন (১৯৬৪)

MEMBERS OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF PAKISTAN

JULY 1962

১৯৬২ সনে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ সদস্যগণের সাথে মেজর (অবঃ) মুহাম্মদ আফসার উদ্দিন (বাঁ থেকে দ্বিতীয় উপবিষ্ট) ও খান তমিজ উদ্দিন খান জাতীয় পরিষদের স্পীকার।

তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শল মুহাম্মদ আইয়ুব খানের সঙ্গে পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী মেজর মুহাম্মদ আফসার উদ্দিন (১৯৬৪)

ডান থেকে চার নম্বরে খানা খাওয়ার জন্য উপবিষ্ট ট্রানজর্ডান আর্মি অফিসারদের সাথে মেজর মুহাম্মদ আফসার উদ্দিন (১৯৪৫)

আমেরিকা

একথা সবাই জানে যে আমেরিকাকে খুশী করতে তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা দেশে সামরিক শাসন কায়েম করে তখনকার দিনের সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল (পরে ফিল্ড মার্শাল) আয়ুব খানকে প্রধান সামরিক অফিসার নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে ইস্কান্দার মীর্জাকে প্রেসিডেন্ট পদ ও পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত করে আয়ুব খান পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হয়েও আমেরিকাকে তুষ্ট করতে তিনি কোন ত্রুটি করেননি। তারই সরকারের অনুমতিতে আমেরিকাকে পূর্ব রাশিয়ার হাওয়াই জাহাজ ও সামরিক গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখার জন্য পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আমেরিকান ইউ-টু গোয়েন্দা বেজ স্থাপন করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। এই খবর প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পর কমুনিষ্ট রাশিয়ার হুমকিতে পরবর্তীতে পাকিস্তান সরকার এই বেজ বন্ধ করে দিয়েছিল। আয়ুব সরকারের যথেষ্ট সাহায্য ও সহানুভূতিতে আমেরিকার বিদেশ সচীব ডঃ হেনরী কিসিঞ্জার পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে অতি গোপনে মহাচীন ভ্রমণ করে চীন সরকারের সাথে আমেরিকার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে।

এত করেও যখন প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান দেখতে পেলেন যে, মার্কিনী সরকার ভারতের দিকেই ঝুঁকে আছেন, কাশ্মীর সমস্যারও কোন সমাধান হচ্ছে না তখন প্রেসিডেন্ট আয়ুবখান ধীরস্থির গতিতে কমুনিষ্ট রাশিয়া ও মহাচীনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও গাঢ় করার প্রচেষ্টা নিলেন আর এই প্রচেষ্টাই আমেরিকার সরকারকে ভবিষ্যতে বৈরী করে দিল এবং মার্কিন গোয়েন্দা (সি. আই. এ) পাকিস্তানে বিদ্রোহ সৃষ্টি করে আয়ুব খানকে ক্ষমতাচ্যুত করল।

অপর দিকে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান ভারতের সাথে স্থায়ী বন্ধুত্ব সৃষ্টি করার জন্য ভারত ও পাকিস্তান যুক্ত দেশ রক্ষাব্যবস্থা (কমন ডিফেন্স) প্রস্তাব নিয়ে স্বয়ং দিল্লী গেলেন। কিন্তু যে কারণেই হোক পণ্ডিত নেহেরু সরকার আয়ুব খানের এই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন যুক্ত দেশরক্ষার প্রস্তাব যা ধীরেধীরে পাকিস্তানের সাথে ভারতের বহু কিছু সুফল প্রসব করতে পারত তা অদূরদর্শিতার কারণে নেহেরু সরকার প্রত্যাখ্যান করল। এবং বলল, জয়েন্ট ডিফেন্স এগেইন্সট হুম? পাকিস্তান ইজ আওয়ার এ্যানিমি ওয়ান অর্থাৎ কার বিরুদ্ধে এই যুক্ত দেশ রক্ষা ব্যবস্থা করব? পাকিস্তান হলো আমাদের এক নম্বর শত্রু। অচিরেই নেহরু সরকারের এই ভুল ভেঙ্গে দিয়ে ১৯৬২ সনে মহাচীনের সামরিক বাহিনী ভারত আক্রমণ করে ভারতের অভ্যন্তরে উত্তর পূর্ব সীমান্ত দিয়ে (NEFA) ভারতের অভ্যন্তরে ৪০ মাইল প্রবেশ করে বহু সৈন্য সামন্ত, অস্ত্র-শস্ত্র, গাড়ী ও ট্যাংক নিয়ে যায়। অবশ্য

পরে তা ভারতকে অপমানিত করবার জন্য দয়া করে ফেরত দেয়।

ভারতীয় হিন্দু রাজাদের শাসনামলেও যেমন তারা অতি ছোট-বড় জাতি পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফ্রান্স, বৃটেন, মোঘল পাঠানদের দ্বারা নিগৃহীত ও শাসিত হয়েছিল রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতার অভাবে ভবিষ্যতেও ভারত ঐ ভাবেই খণ্ড খণ্ড রাজ্যে পরিণত হয়ে বিদেশী-বিজাতি দ্বারা আবারও শাসিত হবে বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ কাশ্মীর, পাঞ্জাব, ঝারখন্ড, আসাম, মনিপুর, মিজোরাম ও নাগাল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে স্বাধীনতার সশস্ত্র বিপ্লব যা শান্তিপূর্ণ ভাবে সমাধা করা দূরে থাকুক ভারতীয় বর্ণ হিন্দুরা আজকে একত্র হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার কারণে ভারতীয় মুসলমান নিধনে অযোধ্যার কল্পিত রাম মন্দির প্রতিষ্ঠানে। ভারতীয় বাংগালী মুসলমানদের জোর করে বাংলাদেশে ঠেলে দেয়াতে (পুশ-ইন)। শুধু ভারতীয় মুসলমানদেরই বাংলাদেশে ঠেলে দিচ্ছে কোন বাংলাভাষাভাষী হিন্দু এর মধ্যে নাই। আমার মনে হয় ভারতীয় বর্ণহিন্দুদের এই সাম্প্রদায়িকতার দোষে অসহায় নারীদের শ্লীলতাহানির অপরাধে নরনারী ও শিশু হত্যার পাপ একদিন আল্লাহর বিচারে ভারতীয় বর্ণহিন্দুদের স্বাধীনতা রক্ষার ও দেশশাসন অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং যারা তাদের চেয়ে যোগ্য তাদের হাতে খণ্ডিত ভারতের শাসনভার আল্লাহতালা অর্পণ করবেন।

১৯৬২ সালের সংবিধান ও নির্বাচন

প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান ১৯৬২ সালের ১লা মার্চ নতুন সংবিধান ঘোষণা করেন। এই সংবিধান মোতাবেক ২৮শে এপ্রিল জাতীয় পরিষদের ও ৬ই মে ১৯৬২ সনে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে পুরাতন রাজনীতিবিদদের মধ্যে যারা নির্বাচনে অংশ নিতে মার্শাল-ল এর বিভিন্ন আইন অনুযায়ী অযোগ্য ঘোষিত হয়েছে তারা তো অংশ নিতে পারেননি বরং তাদের কিছু কিছু অন্ধভক্ত ও অনুগামীরাও নির্বাচনে অংশ নেয়নি। আবার বহু পুরাতন রাজনীতিবিদ যারা সংসদের মাধ্যমে জনগণের খেদমত করতে চেয়েছিলেন তারা ইলেকশনে অংশ নিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে অনেকেই নির্বাচনে জয় যুক্ত হয়েছেন। যেমন পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদের সভাপতি ফরিদপুরের জনাব তমিজউদ্দীন খান, (প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী) মোহাম্মদ আলী (বগুড়া), পাকিস্তান সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী রমিজউদ্দীন আহমেদ (কুমিল্লা), পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাক্তন মন্ত্রী ও গভর্ণর সর্দার বাহাদুর খান, মাওলানা মুফতী মাহমুদ প্রমুখ।

আমার জাতীয় পরিষদে নির্বাচনে জয়লাভ

পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী ১৯৫৬ সনে আমি পেনশনে আসার পর থেকে নির্দলীয় ভাবে দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজে যোগ দেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্তন সৈনিকদের সংগঠিত করে তাদের সমস্যার সমাধান করতে উদ্যোগ নেই। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে দেশ রক্ষার জন্য সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করি। পাকিস্তান বাজেটের সিংহভাগ দেশ রক্ষা খাতে ব্যয়ের পূর্ব পাকিস্তানের নায্য অংশ পাওয়ার জন্য গণমনে চেতনা আনয়নের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করি। এ জন্য আমি ১৯৫৮ সনের আগষ্ট মাসে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাক্তন সামরিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দেশ রক্ষা সপ্তাহ উদযাপন করি। এ বিষয় নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের তদানীন্তন গভর্ণর ও পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি পেশ করি। ঢাকার কয়েক জায়গায় সভা-মিছিল করি, ঢাকাস্ত রেডিও পাকিস্তানে বক্তৃতা দিয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ব করি। আমার এই আন্তরিক প্রচেষ্টা ও দেশ রক্ষা সপ্তাহ উদযাপন বেশ ফলপ্রসূ হয়। আমার এই দেশ রক্ষা সপ্তাহ উদযাপনের লক্ষে দৈনিক আজাদ, ১৬ই ভাদ্র, মঙ্গলবার ১৩৬৫ সন, পাকিস্তান অবজারভার ৫. ৯. ৫৮ ইং ও দৈনিক ইত্তেফাক, সমকালে সম্পাদকীয় বের করে আমার উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। আমার মনে হয় এই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে বিশেষ করে আমাদের রাজনীতিবিদ ও ছাত্রদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং সামরিক বাহিনীতে আমাদের যুবকদের পর্যাপ্ত সংখ্যায় যোগ দেয়া যে একান্ত দরকার তার চিন্তা ও চেতনা জরুরী ভিত্তিতে প্রথম বারের মত শুরু হয়। তাই আওয়ামী লীগের বিখ্যাত ৬ পয়েন্টের এক পয়েন্ট এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটির সর্বদলীয় ছাত্র পরিষদের ১১ পয়েন্টের ১ পয়েন্ট এই চিন্তাধারার ফলশ্রুতিতে পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া সম্বন্ধে দাবী তোলেন, প্রকৃত সামরিক বাহিনীর ন্যয্য অংশ দাবী না করে অজ্ঞতা বশতঃ শুধু মিলিশিয়ার দাবী করেন। তবুও কিছু করা হলো তো।

আমার মনে হয় আমার এই প্রচেষ্টা রাজনৈতিক অঙ্গনে আমার জন্য ফলপ্রসু হয়েছিল। তা না হলে আমার মনে হয় ১৯৫৬ সনে পাকিস্তানের স্পীকার খান বাহাদুর আব্দুল ওহাব খান ও প্রাক্তন হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব আব্দুল জব্বার খান (বর্তমান সংসদ সদস্য মেননের পিতা) এর মত স্বনামধন্য ও শ্রদ্ধেয় নেতাবৃন্দের সাথে প্রতিদ্বন্দীতা করে বাকেরগঞ্জ জেলার হিজলা মুলাদী মেহেদীগঞ্জ, গৌরনদী ও উজিরপুর থানা থেকে পাকিস্তান সংসদে ১৯৬২ সনের

দিয়েছেনঃ বরিশাল জেলার অভ্যন্তরভাগে ব্যাপক সফরের পর সবেমাত্র আমি ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেছি। এই সমস্ত এলাকায় প্রকট দুর্ভিক্ষাবস্থা প্রত্যক্ষ করে আমি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছি। চাউল ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির মূল্য জনসাধারণের নাগালের বাইরে পৌছেছে। হাজার হাজার লোক আমাকে জানিয়েছে যে, গোটা দিন, ২ দিনের চেষ্টায়ও তারা এক বেলার অন্ন জোটাতে পারছে না। এমন কি ক্ষুধার্ত মানুষের জঠর জ্বালা নিবৃত্তির জন্য ভাতের ফেন পর্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করলেও খাদ্যাভাবে মানুষ করাল মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে। লজ্জা নিবারণের জন্য অসহায় নরনারী বস্ত্র পর্যন্ত জোটাতে পারছে না। বুভুক্ষ সন্তানের ক্ষুধার জ্বালা মিটাতে না পেরে অসহায় বিধবা নারী পথিপার্শ্বে কোলের শিশু ফেলে গেছে, আমার কাছে এমন কয়েকটি মর্মান্তিক ঘটনার সংবাদও এসেছে।

এই খবরটি দৈনিক ইত্তেফাক বুধবার ২২শে মে ১৯৬৩ সন তাদের কাগজে ছাপে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর আব্দুল মোনায়েম খান এই ঘটনা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে আমার উক্ত বিবৃতি সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে খবরের কাগজে বিবৃতি দেন। তখনও দেশে জরুরী আইন চলছিল এবং সরকার কর্তৃপক্ষ চাইলে যে কোন লোককে বিনা বিচারে জেলে আটক করতে পারতো। এহেন রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে আমি রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রেস কনফারেন্স করে গভর্ণর মোনায়েম খানকে চ্যালেঞ্জ করে বিবৃতি দেই। যাহা দেশের বাংলা, ইংরেজি, উর্দু প্রায় সকল দৈনিক কাগজে ছাপে। দৈনিক আজাদের ২৫শে মে ১৯৬৩ সনের ছাপানো বিবৃতিটি পাঠকদের অবগতির জন্য তুলে ধরলাম ঃ

বরিশালের খাদ্য পরিস্থিতির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য গভর্নরের প্রতি চ্যালেঞ্জ রাওয়ালপিণ্ডি, ২৫শে মে

বরিশাল জেলার দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি সম্পর্কিত বিশিষ্ট জাতীয়পরিষদ সদস্য মেজর আফছার উদ্দিনের যে বিবৃতি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর জনাব আব্দুল মোনায়েম খান অস্বীকার করেছেন তিনি উহার চ্যালেঞ্জ করেন।

মেজর আফছার উদ্দীন বলেন যে, দুর্ভিক্ষ সম্পর্কিত তার বিবৃতি সত্য ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠি নহে উহা যদি গভর্ণর প্রমাণ করতে পারেন তবে তিনি তার জাতীয় পরিষদের সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করবেন।

তিনি গভর্ণরকে তার সাথে একত্রে বরিশাল জেলা সফরে গমন করে দুর্ভিক্ষ

পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখার জন্য আবেদন জানান।

তিনি বলেন যে আমার বিবৃতি যদি সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তবে গভর্ণর সাহেব পদত্যাগ করবেন কি? পি, পি, এ।

বলা বাহুল্য ইহার পরে গভর্ণর সাহেব চুপ করে যান। এবং পূর্ব পাকিস্তান সরকার প্রচুর পরিমাণে খাদ্য ও বস্ত্র বরিশালে প্রেরণ করতে বাধ্য হয়।

পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে অতি নগন্য সংখ্যক (৫% থেকে ১০%) এর মত বাঙ্গালী চাকুরিতে নিয়োজিত থাকাতে তাদের বেতন ও ভাতা ইত্যাদি বাবদ পাকিস্তান বাজেটের অতি নগন্য পরিমাণ টাকাই পূর্ব পাকিস্তানে আসত। সিংহভাগ (৬০%–৯০%) চলে যেত পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানের ডিফেন্স প্রায় নাই বললেই চলে। এজন্য পূর্ব পাকিস্তানের দেশ ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমি খুবই উদ্বিগ্ন থাকতাম। তখন নামে মাত্র চতুর্দশ ডিভিশন পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত ছিল। কিন্তু তার অধীনে তিনটা ব্রিগেড থাকা দূরের কথা তিনটা পূর্ণ ব্যাটালিয়ানও তখনকার দিনে ছিল না। তাই পূর্ব পাকিস্তান রক্ষা ব্যবস্থায় ও পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের চাকুরির ব্যাপারে যাতে অন্ততঃপক্ষে সমতা আনা যায় তার জন্য পাকিস্তান সংসদের ভিতরে ও বাইরে আমি সততঃসচেষ্ট ছিলাম। দৈনিক ইত্তেফাকের ১১/১১/৬২ তারিখের ছাপানো সংবাদটি মাত্র একটি উদাহরণ হিসেবে তুলে দিলাম।

ভারতের হামলার মুখে প্রদেশে সৈন্য আমদানী অসম্ভব হবে।
মেজর আফছার উদ্দীন কর্তৃক প্রদেশে পূর্ণাঙ্গবাহিনী গঠনের দাবী

বাইরের যে কোন আক্রমণের হাত থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য জাতীয় পরিষদের পাক পিপল্স গ্রুপের চীফ হুইপ মেজর আফসার উদ্দীন প্রদেশে স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর একটি সম্মিলিত অপারেশন সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়েছেন।

গতকল্য (শনিবার) সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, সীমান্ত সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে পাশ্চাত্যের দেশগুলি ভারতকে অস্ত্র-শস্ত্র সাহায্য করায় বিভিন্ন দেশের শক্তির ভারসাম্য ব্যাহত হয়েছে। ফলে, এই সীমান্ত বিরোধের মূল কেন্দ্রও প্রদেশের নিকট স্থানান্তরিত হয়েছে। মেজর আফছারউদ্দীন প্রদেশের রক্ষাব্যবস্থার প্রতি সরকারের দীর্ঘ ১৫ বছর ব্যাপি ঔদাসীন্যের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন দেশ বিভাগের পর থেকেই পাকিস্তানের দেশ রক্ষা ব্যবস্থায় শতকরা

৯০% পশ্চিমঅঞ্চলে গড়ে তোলা হয়েছে। এমতাবস্থায় ভারতের সঙ্গে যদি কখনও সশস্ত্র বিরোধ বেধে যায় তাহলে প্রাকৃতিক বিচ্ছিন্নতার দরুণ দেশের পশ্চিমাঞ্চল থেকে পূর্বাঞ্চলে সৈন্য প্রেরণ করে পূর্ব পাকিস্তান রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। মেজর আফছার উদ্দীন দেশের বর্তমান রক্ষাব্যবস্থাকে 'আত্মঘাতী' বলে অভিহিত করেন। তিনি আরও বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে সশস্ত্র বাহিনীতে যে লোক নেয়া হয়, তার সংখ্যা নগন্য। পরিকল্পিত সময়ে এই সংখ্যার শতকরা ৫০% জনে উন্নীত করার জন্য তিনি জোর দাবী জানান।

পশ্চিম পাকিস্তানে স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ট্রেনিং সেন্টার ও স্কুল) নির্মাণ করা হয়েছে, উহার অধিক প্রদেশে স্থানান্তর নতুবা প্রদেশে নয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য তিনি সুপারিশ করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যায় প্রদেশেও ৪টি, সামরিক অবৈতনিক স্কুল প্রতিষ্ঠার তিনি দাবী জানান। দেশে পররাষ্ট্র নীতি পরিবর্তনের জন্য তিনি সুপারিশ পেশ করেন।

এ, পি, পি।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় (১৯৭২ সনে) আমার উপরোক্ত হুঁশিয়ারীর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। সামরিক ও বেসামরিক চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল।

চীন ভারত যুদ্ধ

রাওয়ালপিণ্ডিতে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসছে। আমি ও বরিশাল থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ব্যারিষ্টার আখতার উদ্দীন সংসদ অধিবেশনে যোগদানের জন্য রাওয়ালপিণ্ডিতে উপস্থিত ছিলাম। তখন একদিন রেডিওতে শুনতে পেলাম এবং পরের দিন সকালে দৈনিক খবরের কাগজে দেখতে পেলাম ভারতের উত্তর পূর্ব সীমান্ত দিয়ে মহাচীনের সামরিক বাহিনী আক্রমণ করে দ্রুত গতিতে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী হয় পিছু হটছে না হয় আত্মসমর্পন করে চীনা সামরিকবাহিনীর হাতে বন্দী হচ্ছে। শুনে আমি সুখী হতে পারলাম না। কারণ ভারতবাসীর সাথে একসাথে খেলাধূলা করেছি, পড়াশুনা করেছি বড় হয়েছি, এক সাথে চাকুরি করেছি। ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীকে ভালবেসেছি। আজ না হয় আমরা রাজনৈতিক কারণে পাকিস্তান ও ভারত দু'দেশের অধিবাসী হয়েছি। কিন্তু আমার সেই পুরনো সাথী, সঙ্গী বন্ধুরা হিমালয় পর্বতের ওপারের অজানিত পরদেশী চীনাবাসীর কাছে মার খেয়ে পিছু হটবে বা

আত্মসমর্পন করবে এটা আমার কাছে বেদনাদায়ক বলে মনে হলো।

সেদিনই বিকেলবেলা বন্ধুবর ব্যরিষ্টার আখতারউদ্দীন আমাকে এসে বললেন যে চীন ভারত আক্রমণ করেছে এই সুযোগটা পাকিস্তানের গ্রহণ করা উচিত। এই রকম একটা সুযোগ একটা জাতির জীবনে খুব কমই আসে। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর এক্ষুনি কাশ্মীর আক্রমণ করা উচিত। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি পাকিস্তান সম্পূর্ণ নিস্ক্রিয়। আপনি প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের সাথে আমাদের দু'জনের একটা সাক্ষাত চান। পরদিন সকাল ১০টায় সাক্ষাৎ পেলাম।

সাক্ষাত করতে গিয়ে আয়ুব খানকে চীন ভারত যুদ্ধের বিষয় আমাদের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলাতে আয়ুব খান উত্তর দিয়েছিলেন যে, চীন সরকার ভারত আক্রমণ করার পূর্বে পাকিস্তান সরকারের সাথে কোন আলাপ করেনি। আজ হোক, কাল হোক ভারত ও চীনের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি হবে। চীন একদিন তার সীমানার মধ্যে প্রত্যাবর্তন করবে। তখনও পাকিস্তান সরকারকে চীন কিছু জানাবে না। আমি কেন কাপুরুষের মতো এই সুযোগ নিয়ে কাশ্মীর আক্রমণ করব। ৪২ লক্ষ কাশ্মীরীর মুক্তির জন্য ১২ কোটি লোকের স্বাধীনতার ঝুঁকি নিব। চীনের সাথে এক তরফা যুদ্ধ বিরতি হয়ে গেলে ভারত পাকিস্তানের এই কাশ্মীর আক্রমনকে কখনও ক্ষমা করবে না। ভারত পাকিস্তানের সাথে পূর্নোদ্যমে যুদ্ধ চালাবে। তখন তো চীন পাকিস্তানকে সাহায্য করতে আসবে না। কাজেই এই চীন ভারত যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের নিস্ক্রীয় থাকা উচিত বলে মনে করি। আমরা তার যুক্তি মেনে নিলাম।

যেহেতু কমুনিষ্ট চায়না ভারত আক্রমণ করেছে সেহেতু মার্কিন সরকার হস্ত দন্ত হয়ে ভারতকে সাহায্য করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দ্রুত গতিতে অস্ত্র-শস্ত্র ফেলে পশ্চাদগামী ভারতীয় বাহিনীর নিকট আকাশ থেকে অস্ত্র-শস্ত্র গোলা বারুদ, খাদ্য দ্রব্য ও শীত বস্ত্র ফেলে ভারতীয় বাহিনীকে সাহায্য করতে লাগল। মার্কিন ও যুক্তরাজ্য সরকারের দেশ রক্ষা বিভাগের দুই জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা দিল্লী সরকারের সাথে আলোচনা করে পাকিস্তান সরকারের সাথে বুঝাপরা করার জন্য রাওয়ালপিণ্ডি এসে হাজির।

বোধহয় যুদ্ধের তৃতীয় দিন এই মার্কিন ও যুক্তরাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা রাওয়ালপিণ্ডি আসেন। মনে হলো পাকিস্তান সরকারের সাথে সুবিধা করতে না পেরে জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলের নেতাদের সাথে আলাপ আলোচনার জন্য তারা জাতীয় পরিষদের স্পীকার স্বনাম ধন্য মরহুম তমিজউদ্দীন খানের সাথে দেখা করেন। জনাব তমিজউদ্দীন খান পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে পরামর্শ করে বিরোধী দলীয় নেতা মরহুম রমিজউদ্দীন আহমেদ (কুমিলা), মরহুম ফরিদ আহমেদ, আমি ও পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন

বিরোধী নেতাকে স্পীকারের কক্ষে ডাকালেন। পরিচয়পর্ব সেরে মার্কিন ও বৃটিশ সরকারের মুখপাত্রদ্বয় আমাদের এই বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান তাদের নিকট এক দেশ। কমুনিষ্ট চীন, অকমুনিষ্ট ভারত-পাকিস্তান, বৃটিশ ও আমেরিকার সাধারণ শত্রু। কাজেই পাকিস্তানের অনতিবিলম্বে ভারতের সাহায্যে এই যুদ্ধে নামা প্রয়োজন।

মাননীয় স্পীকার ও বিদেশ মন্ত্রী যেখানে হাজির সেখানে আমাদের নীরব থাকাই সকলে বাঞ্ছনীয় মনে করলাম। কয়েক মুহূর্ত পিনপড়া নীরবতার পর বিদেশ মন্ত্রী আমাকে কিছু বলার জন্য ইশারা করলেন। তখন আমি তাদের বলে দিলাম যে, যুক্তরাজ্য ও মার্কিন সরকারের নিকট ভারত ও পাকিস্তান এক দেশ হতে পারে, কিন্তু আমাদের নিকট ও জাতিসংঘের নিকট ভারত ও পাকিস্তান দুটি দেশ। তারপর কমুনিষ্ট চায়না বা কমিউজিমের ভয়ে ভারত মার্কিন যুক্তরাজ্য বা ইয়োরোপিয়ানদের ভীত হতে পারে কিন্তু পাকিস্তান বা কোন মুসলিম রাষ্ট্রের কমুনিষ্ট বা কমিউনিজমকে ভয় করার কোন কারণ নাই। কারণ প্রকৃত মুসলিম সমাজব্যবস্থা কমুনিজমের বহু পূর্বেই সাম্য ও মৈত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক ভাষায় সমাজতন্ত্র বললেও হয়ত তেমন ভুল হবে না। তারপর যে ভারতকে চায় না আক্রমণ করেছে তারা তো পাকিস্তানের কাছে কোন সাহায্য চায়নি। এই সেদিন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান দিল্লী এয়ারপোর্টে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুকে ভারত ও পাকিস্তান যুক্ত রক্ষা ব্যবস্থার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী যে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন আর তার দেশ রক্ষা মন্ত্রী কৃষ্ণ মেনন এক ধাপ এগিয়ে বলেছিলেন ভারত কার বিরুদ্ধে যুক্ত দেশরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে? ভারতের এক নম্বর শত্রু হলো পাকিস্তান। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের কিছু করার আছে বলে আমরা মনে করি না। তোমরা রাওয়ালপিণ্ডিতে না এসে বরং দিল্লী সরকারের নিকটে গিয়ে উপরোক্ত বিষয় আলোচনা করলে ভাল হয়। পাঠক বিশ্বাস করুন আর নাই করুন আমার এই কথা কয়টি শুনে বিদেশী মেহমান স্পীকার সাহেবের কক্ষ থেকে মলিন মুখে দিল্লী অভিমুখে বহির্গমন করেন। তাদের দরজার সামনে বিদায় দিয়ে বিদেশমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো আমাকে করমর্দন করে ধন্যবাদ জানান। মনে হলো আমাদের বিদেশ মন্ত্রণালয়ও আরও বেশি ভাবে এই বিষয় মার্কিন ও যুক্ত রাজ্যকে একই প্রকারে বুঝিয়েছেন।

চারদিন যুদ্ধের পরে দেখতে পেলাম চীন ভারত যুদ্ধ থেমে গেছে। টেলিভিশনে দেখতে পেলাম চীন শুধু ভারতীয় যুদ্ধবন্দীই নয় কামান বন্দুক যত অস্ত্রপাতি, ট্যাংক ও যানবাহন সব কিছু ভারতীয় যুদ্ধবন্দী সমেত ভারতে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে এবং ৪০ মাইল ভারত ভুমিতে চীন সামরিকবাহিনী ঢুকে পড়েছিল তাও

ভারত সরকারকে ছেড়ে দিয়েছে। চীনা দূতাবাসের একজন সিনিয়র কর্মকর্তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করাতে উনি উত্তর দিলেন যে, ভারতীয় সামরিক বাহিনী কয়েক মাস যাবত ভারত সরকারের ইঙ্গিতে সীমান্ত পেরিয়ে চীনভূমিতে পদচারণা করতে ছিল। তাই মহাচীন সামরিকবাহিনীর গালে একটা চপেটাঘাত করতে চেয়েছিল মাত্র। এক ইঞ্চি ভারত ভূমিও দখল করা চীনের উদ্দেশ্য ছিল না। তাই চীন ভারতকে উপযুক্ত শিক্ষা দানের পরে যুদ্ধবন্দীদের সাথে ভারতকে সবকিছু ফেরত দেয়া হয়েছে। ভারত কেমন করে এই পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলবে তা শুধু ভবিষ্যৎই বলতে পারে। এতদিন চীন ভারত ভাই ভাই ছিল আর এখন বাই বাই (bye bye) হল।

পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষা ব্যবস্থা
জাতীয় পরিষদ সদস্য কর্তৃক গুরুত্ব আরোপ
ঢাকা, ১০ই নভেম্বর, ১৯৬৩, দৈনিক আজাদ

জাতীয় পরিষদের সদস্য মেজর এম আফছার উদ্দীন যে কোন বহিরাক্রমণের কবল হতে দেশের এই অংশকে রক্ষা করার কার্যকরী ব্যবস্থা হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীকে নিয়া একটি সম্মিলিত বাহিনীর সদর দফতর স্থাপনের জন্য আহবান জানান।

চীন ভারত সীমান্ত বিরোধ এবং পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ কর্তৃক ভারতকে যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ দ্বারা উদ্ভূত পরিস্থিতির উল্লেখ করে তিনি বলেন, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে ভারতকে এই সব যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহের ফলে সংঘর্ষের কেন্দ্র পূর্ব পাকিস্তানের সন্নিকটে স্থানান্তরিত হয়েছে।

এ, পি, পি

পূর্ব পাকিস্তান রক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য এবং পূর্ব পাকিস্তানবাসীকে সামরিক চিন্তা ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য আমার চেষ্টা অব্যাহত থাকে। পাকিস্তানের আমলের সবচেয়ে বিখ্যাত দৈনিক ডন ২৩শে জুন ১৯৬২ সন নিম্নলিখিত ভাবে একটি খবর ছাপে।

More allocation
for defence
demanded

Territorial Army
for E. wing urged.
M N A's Plea to counter
arms build-up in India.
From Khurshedul Hassan.

RawalPindi, June 13, (1962)

The demand for larger defence allocation to meet the challange passed by the massive military build up in India was the key note of the second day general debate budget in the national Assembly today. Appreciating the Rs. 10 crore increase under the head defence the members thought it was inadeiquate.

Maj. Afsarudding (opposition) said his information was that the Americans were willing to equip two or three new Divisions of the Pakistan Army subject to the condition that they were posted in East Pakistan became in their opinion the defence of the Subcontinent was not possible without fully depending that part of the country.

অর্থ
দেশ রক্ষা ব্যবস্থার জন্য
আরো সেনা বৃদ্ধির দাবী
পূর্বাঞ্চলের জন্য আঞ্চলিক
সেনা বাহিনী দরকার।
ভারতে সেনা বাহিনী বৃদ্ধির মোকাবিলার জন্য এম-এন-এর উদ্বেগ
খুরশেদুল হাসান, রাওয়ালপিণ্ডি ১৩ই জুন (১৯৬২)

ভারতে ব্যাপক সেনা বাহিনী বৃদ্ধির চ্যালেঞ্জের লক্ষ্যে এখানে সেনা বাহিনী গঠনের দাবীই হলো জাতীয় পরিষদের বাজেটের উপর দ্বিতীয় দিনের বিতর্কের মূল বিষয়। রক্ষা ব্যবস্থায় মাত্র ১০ কোটি টাকা বৃদ্ধি মেম্বারদের ধারণায় এটা অপর্যাপ্ত।

মেজর আফছার উদ্দীন (বিরোধী) বলেন তার কাছে এই মর্মে খবর আছে যে,

আমেরিকানরা এই শর্তে পাকিস্তানে দুই থেকে তিন ডিভিশন সৈন্য বাড়াতে চান যে এদের পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োজিত করতে হবে। কারণ তাদের ধারণা এই রক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া উপমহাদেশের এই অংশ রক্ষা করা সম্ভব নয়।

অনুরূপভাবে পাকিস্তান অবজারভার মার্চ ২৮, ১৯৬৩ সন লিখেন ঃ

'East Pakistan
Being treated like U. S
Negroes

By Staf Correspondent

Major Afseruddin M. N. A accused in the National Assembly on wednesday, that East Pakistan were being treated like Negroes in America in respect of military training by the Government.

অর্থ ঃ

পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রে
নিগ্রোদের মত ব্যবহৃত হচ্ছে।
ষ্টাফ রিপোর্টার

পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে কোন বিভাগে শতকরা কত নিয়োজিত আছে তা আমি সরকারীভাবে জনগণের বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর অবগতির জন্য পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের রেকর্ডে লিখিতভাবে আনাবার জন্য চেষ্টা করি। আমার সেই প্রচেষ্টার ফল দৈনিক ইত্তেফাকে ১৩ই এপ্রিল ১৯৬৩ সনে নিম্নরূপ ছেপেছিল ঃ উল্লেখ্য এই রিপোর্ট স্বয়ং সম্পূর্ণ যা সহৃদয় পাঠকবর্গকে বুঝাবার জন্য আর কিছু লেখা নিষ্প্রোয়জন।

ইত্তেফাক ১৩ই এপ্রিল ১৯৬৩
দেশরক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগে
পূর্ব পাকিস্তানীদের হার
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তান সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের জন্য অনুমোদিত হার কত এবং বাস্তব ক্ষেত্রে শতকরা কতজন আছে, তৎসম্পর্কে বিগত ১১ই অক্টোবর মেজর মোহাম্মদ আফসারউদ্দীন যে প্রশ্ন করেন

গতকল্য (শুক্রবার) দেশ রক্ষা বিভাগের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী উহার জবাব দেন। নিম্নে তাহার জবাবের সামগ্রিক। চিত্র প্রদত্ত (পূর্ব পাকিস্তানীদের শতকরা হার) হইল ঃ

	অফিসার	জুনিয়ার কমিশণ্ড অফিসার		ওয়ারেন্ট অফিসার	অন্যান্য পদবী
(ক) সেনাবাহিনী	৫	৭·৮		×	৭·৪
মেডিক্যাল কোর	২৩	×		×	×
(খ) নৌ-বাহিনী		ব্রাঞ্চ অফিসার	চীফ পেটী অফিসার	পেটি অফিসার	লিডিং সীম্যান ইত্যাদি
	১০	৫	১০·৪	১৭·৩	২৮·৮
(গ) বিমানবহিনী	১৬	১৭	–	–	৩০

১৯৪৭ সনের আগষ্ট হইতে এ-যাবৎ বিদেশে উচ্চতর ট্রেনিং-এর জন্য প্রেরিত পূর্ব পাকিস্তানী সামরিক ব্যক্তিদের শতকরা হার ঃ

	অফিসার		জুনিয়ার কমিশণ্ড		ওয়ারেন্ট অফিসার		অন্যান্য		সিভিলিয়ান	
	পূঃ	পঃ	পূঃ	পঃ	পূঃ	পঃ	পূঃ	পঃ	পূঃ	পঃ
আর্মি	৮	৯২	১	৯৯	–	–	২·৩	৯৭·৭	৬	৯৪
নেভী	১০	৯০	১২	৮৮	১২	৮৮	২০	৮০	৩	৯৭
এয়ার	১২	৮৮	–	–	১৪·২	৮·৫৮	১৭	৮৩	–	–

পাকিস্তান অর্ডিনান্স ফ্যাক্টরী (পূর্ব পাকিস্তানীদের হার)

নন টেকনিকাল		টেকনিকাল		অন্যান্য পদবী	
				টেকনিকাল	ননটেকনিকাল
১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী		
৬·২৫	৮·৭০	৩·৮০	১৪·৯	৪·৮২	১·৮০

আমার ঐকান্তিক চেষ্টায় পাকিস্তান আমলের ১৬ বৎসর পরে এই প্রথমবারের মত জানতে পারি পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের সামরিক বাহিনীতে কত নগন্য সংখ্যক

লোক চাকুরি করছে এবং সে পরিমাণে পূর্ব পাকিস্তানে টাকা আসছে। ক্ষোভে জনগণ ফেটে পড়েছিল। এইটিই হল বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অন্যতম কারণ।

মেজর আফজারউদ্দীন গত বুধবার জাতীয় পরিষদের সদস্য এই মর্মে দোযারোপ করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানীরা আমেরিকার নিগ্রোদের মত ব্যবহৃত হচ্ছে সরকারের সামরিক ট্রেনিং ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একথা বলা যায়!

একটি অনৈইসলামিক চিরাচরিত অভ্যেস বন্ধ করবার জন্য আমার সফল চেষ্টা যা আমার ফটোসহ ডেইলি মর্নিং নিউজ ঢাকা মার্চ মাসের ২য় কি ৩য় সপ্তাহে ১৯৬৩ সনে নিম্নরূপ ছেপেছিল ঃ

MNAS WILL NO MORE
BOW BEFORE CHAIR
Age-Old 'Un-Islamic
Custom to go.'

Members of the National Assembly will no longer by required to bow before the chair, or Vice-versa. The age old coustom handed down by the British.is being scraped with immidiate effect, it is learnt. Reports P. P. A.

A decision to this effect was Taken by the members of the national Assembly yesterday at a seminar on parliamentary procedure, held in the Assembly building

The suggestion to do away with this 'Un Islamic' custom was put forward by Major Afsaruddin

অর্থ ঃ

এম-এন-এরা আর চেয়ারের (স্পীকারের)
সামনে মাথা নত করবে না
পুরানা অনৈসলামিক রীতি বন্ধ হওয়া উচিত।

জাতীয় পরিষদের সদস্যদের আর চেয়ারের (স্পীকারের) সামনে মাথা নত করতে হবে না। বৃটিশের দেয়া এই সাবেক রীতিনীতি অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। সংবাদ দিচ্ছে

পি, পি, এ।

গতকাল পার্লামেন্টারী পদ্ধতির উপর এক সেমিনারে উক্ত মর্মে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেমিনার এসেম্বলি বিল্ডিংয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল।

এরূপ অনৈসলামিক পদ্ধতি বন্ধ করার প্রস্তাবটি মেজর আফছার উদ্দীন কর্তৃক উত্থিত হয়েছিল।

আর, সি, ডি

পাকিস্তানের বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে ইরাক, ইরান ও তুরস্কের যৌথভাবে ইউ–এস ও ইউকের পূর্ণ সহযোগিতায় দেশের সার্বিক উন্নয়ন কল্পে বিশেষ করে এই এলাকায় একটি রিজিওনাল কো–অপারেশন ফর ডেপলপমেন্ট; (আর–সি–ডি) নামে একটি যুক্ত সংস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। যদিও এটা একটা যৌথভাবে দেশ রক্ষা ব্যবস্থা ছিল কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেই প্যাক্ট দ্বারা পশ্চিম পাকিস্তান ছাড়া বিচ্ছিন্ন হাজার মাইল দূরে পূর্ব পাকিস্তানে এর কোন উপকারিতা ছিল না। কারণ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝখানে হাজার মাইল ব্যাপী শত্রু মনোবৃত্তির ভারত রাষ্ট্র অবস্থিত। ভারত সরকার শুধু ভারতবর্ষই নয়, আরব সাগর, ভারত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর এবং ভারতীয় আকাশ সীমায় সততঃ সক্রিয়দৃষ্টিরাখছে।

কোন দেশের শক্তি ছিল না যুদ্ধকালে অত্র এলাকার মাঝখান দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কোন রকম সামরিক সাহায্য পাঠাতে পারেন– এই কারণে পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) দেশ রক্ষার জন্য, আমি বিবেচনা করলাম যে, পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশকে ভারতের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার জন্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো নিয়ে আর–সি–ডি–এর মতো একটি দেশ রক্ষা ব্যবস্থা ও এর সাথে আর্থ উন্নতির একটা প্যাক্ট হওয়া উচিত। যা করাচী মর্নিং নিউজ ২৫শে নভেম্বর ১৯৬৩ সন নিম্নরূপ ছেপেছিল ঃ

RCD-Type Pacts With
Indonesia, China and Burma urged,

Morning News, Karachi 25 November 1963

Major Afsaruddin M. N. A. From East Pakistan ...

Addressing a press Conference here last evening said India had miserably failed to achieve its nefarious objective of dividing the people of the two wings through the 'mean and bogus propaganda'.

He described as utterly nonsense 'the AIR (All India Radio) broadcasts that a 'revolutionary council' has been set up in East Pakistan and that there was a demand for its secession.

অর্থ ঃ

ইন্দোনেশিয়া, চীন এবং বার্মার সাথে
আর-সি-ডি ধরনের একটা প্যাক্ট
করার আহবান জানানো হয়।

মর্নিং নিউজ, করাচী ২৫শে নভেম্বর ১৯৬৩ সন–

পূর্ব পাকিস্তান থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য মেজর আফছারউদ্দীন গতকাল সন্ধ্যায় এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন ভারত তার জঘন্য উদ্দেশ্য হাসিল করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তার উদ্দেশ্য ছিল সংকীর্ণ ও ভূঁয়া প্রচারের মাধ্যমে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করা।

তিনি এটাকে একটা চরম নির্বুদ্ধিতা বলে উল্লেখ করেন। এ, আই, আর (ভারতীয় রেডিও) প্রচার করছে যে, পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হবার লক্ষে সেখানে একটি বিপ্লবী কাউন্সিল গঠিত হয়েছে।

(পি, পি, এ,)

পূর্ব পাকিস্তান রক্ষা ব্যবস্থা, উন্নয়ন ও পূর্ব পাকিস্তানবাসীর ন্যায্য দাবী দাওয়া আদায়ের আমি এই যে, নিরলস জাতীয় সংসদের ভিতরে ও বাহিরে চেষ্টা করে যাচ্ছি তাতে পূর্ব পাকিস্তানী সংসদ সদস্যরা আমাকে কেহ তেমন উল্লেখযোগ্য সহায়তা করেনি। তবুও তাদের ধন্যবাদ যে, তারা আমার বিরোধিতাও করেনি। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের সরকার দলীয় সদস্যগণ আমার এই ন্যায্য প্রচেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। আর পাকিস্তান সরকার আমার এই পরামর্শের কোন আমল দেয়নি। দেখা গেল তার ফল হলো আমি যা আশংকা করেছিলাম তাই হলো।

পূর্ব পাকিস্তান ১৯৭১ সনে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

সেই কারণগুলি সব এখনও দূরীভূত হয়নি। বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে আরও ছোট ও দূর্বল হওয়াতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা নস্যাৎ করার জন্য ভারত সরকার যুদ্ধ ব্যতীত বেশ কয়েকটি কর্ম পন্থা গ্রহণ করেছে। যেমনঃ ১। ইউনিভারসিটির ছেলেমেয়েদের মন মানসিকতা (brain wash) ভারত পন্থি করার জন্য হেন কোন কাজ কাম বাকী রাখা হয় না যাতে এই সব ছেলেমেয়ে সকল সরকারী ও বেসরকারী অফিস আদালত দখল করে আসছে আজ ভারতে সামিল বা অন্তত ভারতের তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হয় তাই ভূমি নয় মন মগজ দখলের চেষ্টা চলছে।

২। ফারাক্কা বাঁধ সহ আরও ৫০টি নদীর উপর বাঁধ বা গোআইল তৈরী করে বাংলাদেশকে ফসল বিহীন মরুভূমি করা।

৩। পার্বত্য চট্টগ্রামে যুদ্ধ করার জন্য ভারতীয় ত্রিপুরা ষ্টেট শান্তি (অশান্তি) বাহিনীর জন্য কমসে-কম গোটা পাঁচেক ট্রেনিং সেন্টার খোলা।

৪। বাংলাদেশের পশ্চিম দিক থেকে স্বাধীন বঙ্গভূমি কায়েমের নামে একটি বিরাট স্বেচ্ছা সৈনিক দল সৃষ্টি করা।

৫। আধুনিক কালে 'পুশইন' স্কীমের মাধ্যমে ভারতীয় বাংলাভাষাভাষী মুসলমানদের বাংলাদেশের মধ্যে অযৌক্তিকভাবে ঠেলে দেয়া যদিও বাংলাদেশের কোনো শান্তি প্রিয় নাগরিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রপীড়িত ভারতে যাওয়ার বা ভারতে খেয়ে পরে সুখে থাকার দৃশ্যত কোনো কারণ নেই। যেমন অযোধ্যার বাবরী মসজিদকে ভেঙ্গে মুসলমানের রক্তের উপরে তথা কথিত রাম মন্দির তৈরী করা। কাশ্মীর, দিল্লী, আজমীর, আহমেদাবাদ, বম্বের মুসলমানদের গণ হত্যার মধ্যে কোন বাংলাদেশী মুসলমান ভারতে বসবাস করতে যাবে তা সাম্প্রদায়িক সরকারের লোক ও উগ্র সাম্প্রদায়িক বর্ণ হিন্দু ছাড়া কেউ বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও যে কিছু সংখ্যক হিন্দু তথাকথিত রাম রাজ্যে চলে গেছে তাদের একজন হিন্দুও এই 'পুশইন' স্কীমের প্রোগ্রামের মধ্যে সামিল হয়নি। বেছে বেছে শুধু গরীব বাংলা ভাষাভাষী ভারতীয় নাগরিক মুসলমানদের বাংলাদেশের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে।

উপরোক্ত কারণগুলি হচ্ছে অঘোষিত যুদ্ধে বাংলাদেশের অর্থনীতি, সামাজিক শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে ভেঙ্গে দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা নস্যাৎ করে স্বাধীন বাংলাদেশকে ভারতের কুক্ষিগত করা বা অন্ততঃ একটি তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করা। এসব অনাসৃষ্টি থাকলে সার্ক (SARC) কোন কাজে আসবে না। কারণ

সেখানে ভারত ছোট রাষ্ট্রগুলি হজম করার জন্য সার্কের (Shark) মতো হা করে আছে।

দক্ষিণ এশিয়া দেশ সমূহের যৌথ দেশ রক্ষা ব্যবস্থা

তাই আমার পরামর্শ হলো বাংলাদেশ, বার্মা, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া যদি সম্ভব হয় মহাচীনকে নিয়েই একটি সক্রিয় যৌথ দেশ রক্ষা ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। তা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল হবে। যেহেতু এই সব দেশগুলি ক্রমশঃ ভারতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনার মধ্যে পড়ে, সেহেতু এখন থেকে যুক্তভাবে এদেশগুলো সম্প্রশারণ পরিকল্পনা রুখতে যা যা দরকার করতে হবে। আমি এ বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করার জন্য ও সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের কাছে জোর আবেদন জানচ্ছি।

পূর্ব পাকিস্তান রক্ষা ব্যবস্থা

পূর্ব পাকিস্তান রক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পাকিস্তান দেশ রক্ষা খাতে ব্যয়ের সম অংশ পূর্ব পাকিস্তানে আনয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ। পূর্বপাকিস্তানীদের পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে অন্ততঃপক্ষে ৫০% পঞ্চাশ শতাংশ জোয়ান ও অফিসার ভর্তি করার ব্যবস্থার জন্য আমার চেষ্টা পাকিস্তান সংসদের ভিতরে ও বাহিরে অব্যাহত থাকে। ঢাকার দৈনিক পাকিস্তান অবজার্ভার ১১/১১/৬২ তারিখে নিম্নলিখিত খবরটি তিন কলাম ব্যাপী শিরোনাম দিয়ে গুরুত্ব সহকারে বের করেন। খবরটি নিম্নরূপ ঃ

Govt. Blamed for Neglecting East pak Defencc

Major Afsarudding M.N.A on Saturday Called for having an "efficient combined operation head quarters with sufficient forces including Army Navy and Airforces in East Pakistan to effectinely defend this part of The country from Any extennal aggression, Rephorts (A. P. P)

7 point programme snggested

He said that during the years since partition "ninety percent Pakistani military build-up has been done in west Pakistan" and said that "in case of any armed conflict by hostile India" "No re-inforcenent from west Pakistan" could be made available in East wing in vew of plysical seperation by a long distance to meet the situation resulting in what he called "sncidal policy he suggested for taking up a seven point programme and make Pakistan stay as a strong nation, he said that the percentage allowed in East Pakistan for recruitment in armed services being negligible it should be raised to 50% percent in a planned period.

Compulsory military training urged

Other point of his programme include arrangement for compulsory military training to every able bodied man between 18 to 45 year of age since Pakistan cannot afford to have a large standing army. This he said can be best done by the Ansar Organisation.

Major Afsaruddin also dwelt at length on the background of defence in the sub-continent and called upon India to settle all her outstanding disputes including that of Kashmir with Pakistan to establish friendly relationship between the two neighbouring countries.

But he deplored Indian government took a short sighted Pakistan Policy and turned down the 'friendly offer' made by Pakistan India turned a 'deaf ear' to the demand for self determination of Kashmiries supported by U.N.-he added.

মোটামুটি অর্থ হল ঃ

পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষা ব্যবস্থার প্রতি অবহেলার জন্য সরকারকে দোষারোপ করা হয়েছে।

জাতীয় পরিষদের সদস্য মেজর আফছারউদ্দীন যথাযোগ্য আর্মি, নৌবাহিনী, এবং বিমান বাহিনী সমন্বয়ে পূর্ব পাকিস্তানে একটি যৌথ হেডকোয়ার্টার স্থাপনের দাবী জানান। যাতে যে কোন বহিরাক্রমণ থেকে দেশের এই অংশকে রক্ষা করা যায়।" এ সংবাদ দেয় (এ, পি, পি)।

৭ পয়েন্ট প্রোগ্রামের পরামর্শ

তিনি বলেন দেশ বিভাগের পর থেকে শতকরা ৯০% ভাগ সামরিকীকরণ করা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। এবং তিনি বলেন যদি কোন সময় ভারতের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের সশস্ত্র সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় তা হলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আরো সৈন্য পাঠাবার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না– তার কারণ বাস্তবভাবেই দেশের দুটো অংশের মধ্যে অস্বাভাবিক দূরত্বের কারণে। এর ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সম্ভব হবে না এবং এটাকে তিনি 'আত্মঘাতী' নীতি বলে অভিহিত করেন।

তিনি এ জন্য ৭ পয়েন্ট প্রোগ্রাম গ্রহণ করার পরামর্শ দেন যাতে পাকিস্তান একটি শক্তিশালী জাতী হিশেবে টিকে থাকতে পারে। তিনি বলেন যে পূর্ব পাকিস্তানে সেনা ভর্তির যে শতকরা হার দেয়া হয়েছে তা 'অত্যন্ত নগণ্য'।

পরিকল্পনা করে এ হার শতকরা ৫০ ভাগে উন্নতি হওয়া উচিত।

বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার দাবী

তার প্রোগ্রামের অন্যান্য পয়েন্টের মধ্যে একটি হলো ১৮–৪৫ বছরের প্রত্যেককে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা দিতে হবে। যেহেতু পাকিস্তান একটি স্থায়ী বৃহৎ সামরিক বাহিনী রাখতে পারছে না সে জন্য আনসার সংগঠনই হবে সবচেয়ে ভাল কার্যকরী ব্যবস্থা।

মেজর আফছার উদ্দীন এই উপমহাদেশের রক্ষাব্যবস্থার পটভূমির উপর দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং ভারতকে কাশ্মীরসহ পাকিস্তানের সঙ্গে পুরানো সব গণ্ডগোল মিটিয়ে দুটি প্রতিবেশি দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব সুলভ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

কিন্তু তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, ভারতীয় সরকার পাকিস্তানের প্রতি অদূরদর্শী নীতি গ্রহণ করেছেন এবং পাকিস্তানের বন্ধুত্ব সুলভ প্রস্তাবকে নাকচ

করে দিয়েছেন। তিনি বলেন জাতিসংঘ কাশ্মিরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীকে সমর্থন করেছে অথচ ভারত এই দাবীর প্রতি কর্ণপাত করছে না।

রাজনীতি করা আমার পেশাও ছিল না নেশাও ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে যুক্তি ও বাস্তব দৃষ্টিতে আমি যখন দেখতে পেলাম যে, ভারতের স্বাধীনতা বৃটিশ শাসকের হাত থেকে ছিনিয়ে আনার জন্য কয়েক লক্ষ ভারতীয় যুবক এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেই সুযোগ গ্রহণ করে ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়ে প্রথমেই আগ্রাসনবাদী ডিক্টেটর জার্মানীর হিটলার ও ফ্যাসিষ্ট মুসোলিনিকে ঠেকাতে হবে তার পরে যুদ্ধের শেষে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর অস্ত্র বলে বৃটিশ সরকারকে ভারতের স্বাধীনতা দিতে বাধ্য করতে হবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে যোগ দেই, তেমনি পরিচ্ছন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের পর্যাপ্ত পরিমাণ দেশ রক্ষাব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার জন্য পূর্বপাকিস্তানীদের দ্বারা এই রক্ষাব্যবস্থা সুসংহত করার জন্য পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর লোক সংখ্যার অফিসার ও জোয়ানদের বর্তমানে কমসেকম ৫০% পঞ্চাশ পারসেন্ট নিশ্চিত করার জন্য যার মাধ্যমে পাকিস্তানের বাজেটেরও ন্যায্য অংশ পূর্ব পাকিস্তানে আনা যায় সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষে আমি পাকিস্তানের রাজনীতিতে যোগদান করেছি। সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ধ্রুব তারার মতো সামনে রেখে আমি এতদিন রাজনীতি করেছি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও যেমন আমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সফল হয়েছিল অর্থাৎ ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছিল হিটলার প্রভৃতির অক্ষ শক্তির পরাজয় হয়েছিল সেই রূপ আমার নিঃসঙ্গ 'দেশরক্ষা' প্রভৃতির আন্দোলন সফল হয়েছে দেখে আমি আজ সুখী ও আনন্দিত। আমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ১৯৬২ সনের এপ্রিল মাসের ২৮ তারিখে আমার পাকিস্তান সংসদ নির্বাচনে বিজয়ের পূর্বেই সূচিত হতে থাকে। আমার অবিরত চেষ্টার ফল নিম্নে কিছু বর্ণিত হলো ঃ

The Pakistan OBSERVER

DHAKA Thursday December 6.1962

(Editorial)

The out Come

What all this should boil down to is that East Pakistan must have to be defended at all costs if the necessity arises and that the essential supply and auxillary

industries for its defences must have to be given serious thought we must be able to maintain an defence potential in any circumstances Major Afsaruddin has persued this subject and one trusts that authorities have taken sufficent notice of the genuine concern felt in this province.

অর্থ ঃ সমস্ত বক্তব্যের গোড়ায় যা দাঁড়াল তা হলো সবকিছুর বিনিময়ে হলেও পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হবে।

যদি প্রয়োজন দেখা দেয় তা হলে দেশ রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসহ সহায়ক শিল্প দ্রব্য সরবরাহের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা রাখতে হবে। যে কোন অবস্থাতেই আমরা দেশ রক্ষার শক্তিকে অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হবো।

মেজর আফছার উদ্দীন উপরোক্ত বিষয়ের উপর জোর দেন। এটা বিশ্বাস করা যায় যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই প্রদেশের জরুরী বিষয়টির উপর যথেষ্ট নজর রেখেছেন।

পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের জনগণের পর্যাপ্ত পরিমাণে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে যোগ দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করার, পাকিস্তান সংসদের ভিতরে ও বাহিরে আমার চেষ্টা সামরিক হেড কোয়ার্টারস্, মন্ত্রী মহল ও প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানের নিকট ধর্না দেয়ার আমার চেষ্টা চলতেই থাকে।

মরহুম মেজর আব্দুল গণির নেতৃত্বে আমরা ক'জন বাঙ্গালী অফিসার ও জোয়ান ১৯৪৮ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে যে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠা করেছিলাম যাকে বাঙ্গালীজাতি আদর করে 'বঙ্গ শার্দুল' বলে থাকে, সেই বাহিনীর মাত্র তিনটি ব্যাটালিয়ান প্রতিষ্ঠিত করার পর আর কোন ব্যাটালিয়ান প্রতিষ্ঠিত করতে সরকার দীর্ঘ একযুগের বেশী দিন ধরে অনীহা প্রকাশ করে আসছে। কারণ বোঝা গেল সামরিক শক্তিতে পূর্বপাকিস্তানবাসী বলীয়ান হলে তাদের ন্যায্য আর্থিক, সামরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার পশ্চিম পাকিস্তানীদের আর ঠেকাবার উপায় থাকবে না। পূর্বপাকিস্তানবাসীদের উপরে শাসন ও শোষণ আর চলবে না, সে কারণে খুব সম্ভব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার পূর্বপাকিস্তানীদের সামরিক বাহিনীতে অধিক সংখ্যক ভর্তি করা ও 'ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট' বর্ধিত করা বেশ কয়েক বছর বন্ধ রাখে।

আমিও নাছোড়বান্দা হয়ে পাকিস্তান সংসদের ভিতরে ও বাহিরে চেষ্টা করতে লাগলাম। পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিক নেতা ও সামরিক বাহিনীর উচ্চ

গ্রন্থাগার
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

পর্যায়ের কর্মচারীদের বুঝাতে যে তাদের এই ভুল পলিসি পাকিস্তান বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের উপর আত্মঘাতী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। অপর দিকে পূর্বপাকিস্তানবাসীদের তাদের এই ন্যায্য দাবী দাওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা অব্যাহত রাখলাম।

আমার এই চেষ্টার ফলশ্রুতিতে বরফগলা শুরু হলো। অর্থাৎ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানীদের আরো বেশী সংখ্যায় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে ভর্তি করতে রাজি হলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আরো কয়েকটি ব্যাটালিয়ান (বোধ হয় ৬/৭ টি) গঠন করবার হুকুম দিলেন। সেই হুকুমের পরিপ্রেক্ষিতে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৪র্থ ব্যাটালিয়ান ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩ সন অর্থাৎ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট মঞ্জুরী হওয়ার ঠিক ১৫ বছর পরে আমাদের এই প্রিয় রেজিমেন্টটি রাহু মুক্ত হলো। আমার অকৃত্রিম চেষ্টা কেউ জানুক আর নাই জানুক ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নব উদ্যমে আরো ৬/৭ টি ব্যাটালিয়ান পর্যায় ক্রমে গঠন করবার আদেশ পেল। অলক্ষ্যে আমি এই ৬/৭ টি ব্যাটালিয়ানের প্রতিষ্ঠাতা বললে অতিরঞ্জিত হবে কি?

তাই ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩ সন কুমিল্লা কেন্টনমেন্টে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে নব নিযুক্ত ৪র্থ ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডার লেঃ কর্ণেল আব্দুল জববার, রাজনীতিবিদ্‌দের মধ্যে একমাত্র আমাকেই এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিশেবে দাওয়াত দেন। যার স্বাক্ষী ৪র্থ ব্যাটালিয়ানের প্রথম অফিসিয়াল ফটো। কর্ণেল আব্দুল জববার এই ফটোর এক কপি স্মৃতি ধরে রাখবার জন্য আমাকে উপহার দেন। যা আমি অতি সযতনে আজও রক্ষা করে আসছি। এই উপলক্ষে দৈনিক ইত্তেফাকের ফেব্রুয়ারি ১১,১৯৬৩ সন নিম্নলিখিত খবরটি দ্রষ্টব্য ঃ

বঙ্গ শার্দূল বাহিনীর চতুর্থ ব্যাটেলিয়ান উদ্বোধন

কুমিল্লা, ১০ই ফেব্রুয়ারি অদ্য স্থানীয় ক্যান্টনমেন্ট প্যারেড ময়দানে বিপুল উদ্দীপনার সঙ্গে অত্যন্ত আকর্ষণীয় আনুষ্ঠানিক কুচ কাওয়াজের মাধ্যমে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (বঙ্গ শার্দুল)-এর ৪র্থ ব্যাটেলিয়ান প্রতিষ্ঠার উদ্বোধন করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জেনারেল কমাণ্ডিং মেজর জেনারেল এ, এম ইয়াহিয়া খান রেজিমেন্ট পতাকা উত্তোলন এবং উদ্বোধনী প্যারেড পরিদর্শন করেন।

*চেয়ারে **উপবিষ্ট** বাঁ দিক থেকে লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ আসলাম, (এম, সি) লেঃ কর্ণেল এ, ম সেগেল, কর্ণেল আহমদ এ, শাইখ (টি, পিকে) সেন্টার কমবাইন্ড, ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ আহমদ, (টি, পিকে) এম, সি মেজর আফসার উদ্দিন আহ্মদ, (জাতীয় পরিষদ সদস্য) মেজর আব্দুল জব্বার, কোম্পানি (৪র্থ বি, এন) মেজর জেনারেল এ, এম ইয়াহিয়া খান (এস, পিকে) জি, ও, সি চৌদ্দ ডিভিশন ব্রিগেডিয়ার গোলাম মোহাম্মদ (বিডিই) কমান্ডার কর্ণেল এম, এ, জি ওসমানি, কর্ণেল মোহাম্মদ ইসহাক, লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ কাইয়ুম, লেঃ কর্ণেল এ, টি, কে হক।*

(বাঁ দিক থেকে দাঁড়িয়ে) : ক্যাপ্টেন আর এ, এম গোলাম মোক্তাদির ক্যাপ্টেন এ, ওয়াই মোশতাক আহমদ, মেজর এ জলিল খান, ক্যাপ্টেন এস, আর, খান (এডিসি) ক্যাপ্টেন আলী আহমদ খান।

প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্বোধন উপলক্ষে পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি জেনারেল মোহাম্মদ মুসা এক বাণীতে বলেন যে, নয়া ব্যাটেলিয়ানটি বঙ্গ শার্দুল রেজিমেন্টের এক যোগ্য অংশ হিশেবে যে কোন পরিস্থিতিতে পাকিস্তান সেনা বাহিনীর গৌরব ও ঐতিহ্য বজায় রাখবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন।

প্রধান সেনাপতি তাহার বাণীতে বঙ্গ শার্দুল রেজিমেন্টের দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য আনন্দ প্রকাশ করেন।

নব প্রসূত ৪র্থ ব্যাটেলিয়ান (বঙ্গ শার্দুল)কে আমি যে অভিনন্দন দিয়েছিলাম তা ১২, ২, ১৯৬৩ সনে মর্নিং নিউজে নিম্ন লিখিতভাবে ছেপেছে।

Major Affsaruddin

Hails New Battalion

Major Affsaruddin, a Member of the National Assembly and Chairman of the Standing Committee for Defence in the National Assembly has hailed the raising of the 4th Battalion of the East Bengal regiment and termed it as a 'wise step' reports P. P. A.

অর্থ ঃ

নতুন ব্যাটালিয়ানকে মেজর
আফছার উদ্দীনের অভিনন্দন

জাতীয় পরিষদের সদস্য এবং ডিফেন্সের ষ্টাণ্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান মেজর আফছারউদ্দীন ৪র্থ ব্যাটালিয়ানের উদ্বোধনকে অভিনন্দন জানান এবং একে জ্ঞানী পদক্ষেপ বলে আখ্যায়িত করেন।

১ম প্রতিষ্ঠিত ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৩টি ব্যাটালিয়ান ১৫ বছর পরে আমার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত আরো ৬/৭ টি ব্যাটালিয়ান মিলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে যে অবদান রেখেছিল তা আজ ইতিহাস স্বীকৃত। এই রেজিমেন্টের অফিসার ও জোয়ানরা বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্র সৈনিক। তা যদি স্বীকৃত হয় তা হলে এই ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম মেজর আব্দুল গণি এবং এই নগণ্য লেখককে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপ্নদ্রষ্টা বললে অত্যুক্তি হবে কি?

গৌরনদী কলেজ

আমি যখন ১৯৬২ সনে পাকিস্তান ন্যাশনাল এসেম্বলীর সদস্য নির্বাচিত হই তখন হিজলা, মুলাদী, মেহেদীগঞ্জ, উজিরপুর ও গৌরনদী থানা আমার নির্বাচনী এলাকার (কনষ্টিটিউটয়েন্সীর) মধ্যে পড়েছিল, এর মধ্যে গৌরনদী থানা ছিল রাজনীতি ও শিক্ষার দিক দিয়ে খুবই উন্নত। বর্তমান আগৈল ঝাড়া থানা তখন গৌর নদী থানার অন্তর্ভূক্ত ছিল। আমার মনে হয় তখন গৌরনদী থানায় ২৮টি হাইস্কুল ছিল। যখন আশে পাশে অন্যান্য থানায় ৮/১০টির বেশী হাইস্কুল ছিল না।

লোকমুখে একটি গল্প শুনেছিলাম, অবিভক্ত ভারতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু একবার রাজনৈতিক কারণে গৌরনদী গৈলাগ্রামে এক সভায় ভাষণ দিতে এসেছিলেন। তখন তিনি তার পাশ্ববর্তী এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে এখানে কত পোষ্ট গ্রাজুয়েট হবে? তখন ভদ্রলোক নাকি নেতাজীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে গৌরনদী থানায় না এই সভায়? নেতাজী একটু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'এই সভায়।' তখন পার্শ্বে উপবিষ্ট এক বর্ধিষ্ণু ভদ্র মহিলা নেতাজীকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি কি জানতে চান এই সভায় কত জন পোষ্ট গ্রাজুয়েট মহিলা আছেন না পুরুষ পোষ্ট গ্রাজুয়েট আছেন? তখন সুভাষ বোস অতীব আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন আচ্ছা এই সভায় কতজন পোষ্ট গ্রাজুয়েট মহিলা আছেন? তখন ভদ্রমহিলা বলেছিলেন 'তোমরা যে কয়জন পোষ্ট গ্রাজুয়েট মহিলা সভায় আছ দাঁড়াও। তখন গুণে পাওয়া গেল নাকি ৪১ জন পোষ্ট গ্রাজুয়েট মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন।

আমাকে অভিনন্দন দেয়ার জন্য গৌরনদীবাসীরা সেই সভায় একত্রিত হয়েছিলেন তাতে মাত্র দুটি দাবী করেছিলেন ১টি গৌরনদী কলেজ প্রতিষ্ঠা করা, আর একটি হলো- গৌরনদীটিকে ড্রেজিং করে দেয়া।

আমি পরবর্তিতে আই ডাব্লিউ-টি এর সবচেয়ে বড়ো হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে গৌরনদীটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর তিনি রিপোর্ট দিলেন যে, যেহেতু এই নদীর উত্তর দিকে মাদারীপুর পর্যন্ত ভরাট হয়ে গিয়ে ধান-পাট ইত্যাদি ফসলের চাষাবাদ হচ্ছে হেতু প্রকৃত পক্ষে এতদূর পথ জন স্বার্থের খাতিরেই ড্রেজিং করা সম্ভব নয়।

এখন আমার সামনে গৌরনদী থানাবাসীর দাবী রইল একটি কলেজ করে দেয়া। আমি আশ্চর্য হলাম যে, অবিভক্ত ভারতে যখন গৌরনদীর বর্ণ হিন্দুরা, এত অধিক সুশিক্ষিত ছিলেন তখন কেন কলেজ করা হয়নি- এর একটি মাত্র কারণ

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর জনাব আবদুল মোনয়েম খানকে গতকল্য। (বৃহস্পতিবার) বরিশালের গৌরনদীতে নূতন কলেজ ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিতে দেখা যাইতেছে। বামে (টে হাতে) বিশিষ্ট মুসলিম লীগ নেতা এবং জাতীয় পরিষদ সদস্য মেজর আফসার উদ্দিনকে দেখা যাইতেছে।

মনে হয় মুসলমান ও তফশিলী হিন্দুরা মিলে খুবই অশিক্ষিত কিন্তু অত্যন্ত সংখ্যাগরীষ্ঠ ছিল বলে বর্ণহিন্দুরা তাদের উচ্চ শিক্ষিত করতে চায়নি। আমি কলেজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় মনোনিবেশ করলাম। স্বর্গীয় কেপ্টেন হরলাল গাঙ্গুলী কলেজের জন্য জমিদান করলেন। ১৯৬৪ সনে ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মোনায়েম খানকে দিয়ে কাসিমাবাদ মাদ্রাসা পরিদর্শন ও গৌরনদী কলেজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা স্থাপনের প্রোগ্রাম করা হলো। ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪ সন এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে দলমত নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবর্ণিতা প্রাণঢালা অভ্যর্থনার মধ্যে গভর্ণর মোনায়েম খান গৌরনদী কলেজের শুভ ভিত্তি স্থাপন করে কাসিমাবাদ মাদ্রাসায় গমন করেন। গৌরনদী কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে জমিদান করেন ক্যাপ্টেন হরলাল গাঙ্গুলী। সর্বোত সাহায্য করেন চাঁদশি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও গোর্বধন বড়বাড়ীর জনাব দলিল উদ্দিন সাহেব। তার ছেলে সিরাজুল হক (পরবর্তীতে আই, এল, ও অফিসার) শাহজাহান (বর্তমানে কাউনসেলার বাংলাদেশ এমবাসি, টকিও জাপান) মোবারক মিঞা ও ঐ এলাকার আরও অনেকে। বর্তমান প্রিন্সিপাল হালিম সাহেব তখন ফরিদপুর কলেজে চাকুরী করতেন। সময় পেয়ে মাঝে মধ্যে সাহায্যেয় হাত বাড়াতেন। আমার এই প্রথম কলেজ করার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে দেখে আমি আনন্দিত ও গর্বিত। আমার অবিরত চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত তিন তলা বিশিষ্ট গৌরনদী কলেজ আজ প্রায় চার হাজার গ্রাম্য ছাত্র ছাত্রীকে শিক্ষার আলো বিতরণ করছে। বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে গৌরনদী কলেজকে সরকারীকরণ করেছে। তখনকার দিনে দৈনিক সংবাদপত্র 'পয়গাম' ফেব্রুয়ারি ২৮, ১৯৬৪ সন কলেজ প্রতিষ্ঠার ছবিতে মোনায়েম খান ও আমাকে দেখিয়ে নিম্ন লিখিত ক্যাপসন লিখেছিল।

পূর্ব পাকিস্তান গভর্ণর জনাব আব্দুল মোনায়েম খানকে গতকল্য (বৃহস্পতিবার) বরিশালের গৌরনদীতে নতুন কলেজ ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে দেখা যাইতেছে। বামে বিশিষ্ট মুসলিম লীগ নেতা এবং জাতীয় পরিষদ সদস্য মেজর আফছার উদ্দীনকে দেখা যাইতেছে।

বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ

আগেই বলেছি যে দৈনিক ইত্তেফাক জুন ১, ১৯৬২ সন বাখেরগঞ্জ জেলার বিভিন্ন দাবী দাওয়া সম্বন্ধে প্রাদেশিক গভর্নর সমীপে আমার নেতৃত্বে যে সব দাবী দাওয়া

পেশ করা হয়েছিল সে সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে ইত্তেফাক লিখেছিল 'প্রতিনিধি দল বরিশালে একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবী করেন। অবিভক্ত বাংলায় বরিশালে একটি মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠার যে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছিল, উহারই পরিপ্রেক্ষিতে এই দাবী জানানো হয়। দীর্ঘ দুই বছর-পাকিস্তান জাতীয় সংসদের ভিতরে ও বাহিরে প্রাদেশিক সরকার ও গভর্নর পাকিস্তান সরকার ও প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আয়ুব খানের নিকট বহুবার ধর্না দেয়ার পর খুলনা ডিভিশনের জন্য মঞ্জুরীকৃত মেডিকেল কলেজটি বরিশাল মেডিকেল কলেজ নামে বরিশালে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হই। এজন্য আল্লাকে হাজারো শুকরিয়া। পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তর কালে রাষ্ট্রপ্রতি জিয়াউর রহমানের আমলে তাঁকে পরামর্শ দিয়ে শেরে বাংলা ফজলুল হকের নাম সংযুক্ত করে বরিশাল মেডিকেল কলেজের নাম 'বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ' করানো হলো। আমদের স্বপ্ন সফল হলো। শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হকেরও স্মৃতি রক্ষা হলো। আমার সমকালীন বরিশালের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদগণও হয়তো বরিশাল মেডিকেল কলেজ স্থাপনের ক্ষেত্রে স্ব-স্ব সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করে থাকবেন।

পাতার হাট আর.সি. কলেজ

অনুরূপভাবে আমার পাকিস্তান সংসদ-আমলে মেহেন্দীগঞ্জ থানা হেড কোয়ার্টার পাতার হাটে একটি কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক সংসদ সদস্য মুলাদির মরহুম আব্দুল জলিল খানকে সঙ্গে নিয়ে আমি পাতার হাটে যাই। পাতার হাট আমর বড়ো প্রিয় স্থান। আমি এখানে ছোটকালে রামনাথপুর ফকির বাড়ির মরহুম আব্দুল ওয়াহেদ ফকির সাহেবদের বাড়ি-পরবর্তীতে চর হোগলা গ্রামের ছোট শিকদার বাড়ীর সামু মিয়াদের ঘরে জায়গীর থেকে আমার বড়ো ভগিনী পতি মরহুম আব্দুর রশীদ মিয়ার তত্ত্বাবধানে আমার পরম শ্রদ্ধেয় পাতার হাট মুসলিম হাই স্কুলের হেড মাষ্টার মরহুম আব্দুল খালেক সাহেবের আমলে নিচের ক্লাসে পড়াশুনা করি। তার পরে মেহেন্দীগঞ্জ থানাবাসী জাতীয় পরিষদের ইলেকশনের সময়ে আমকে বিপুল সংখ্যক ভোট দিয়ে তাদের সমর্থন ও ভালোবাসা জানিয়ে ছিলেন। এই মেহেন্দীগঞ্জ থানাবাসীর জন্য আমার অন্তরেও প্রচুর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা রয়েছে। তাই আমি পাতার হাটে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে গেলাম। সেখানে গিয়ে স্থানীয় অফিসার ও গন্যমান্য ও বাজারের ধনী লোকদের

কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য এক সভা আহবান করলাম। তার মধ্যে আমার সহপাটি ধনী দানবীর যাকে আমি আই, ডাব্লিউ–টি, এতে আমার চাকুরির আমলে লোক পাঠিয়ে পাতার হাট থেকে ঢাকাতে ডেকে এনে মোটর লঞ্চ কোম্পানী করতে উদ্বুদ্ধ করি ও কন্ট্রোল দামে দু'খানা মোটর লঞ্চের ইঞ্জিন দিয়ে সাহায্য করি এবং যাকে 'সোনারতরী' মোটর লঞ্চ কোম্পানির নামটি আমার প্রিয়তমা স্ত্রী দিয়ে ছিলেন ঐ সভাতে সেই গান্ধী বাবুও উপস্থিত ছিলেন।

কলেজের জন্য আর্থিক চাঁদা তেমন উঠেনি বলে আমি গান্ধী বাবুকে আলাদা ডেকে নিয়ে বুঝালাম যে, তিনি যদি কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য যাবতীয় খরচ বহন করেন তবে কলেজটি তার স্বর্গীয় পিতা রসিকচন্দ্র বাবুর নামে নামকরণ করা হবে। চিন্তা ভাবনা করে গান্ধী বাবু আমার প্রস্তাবে রাজী হলেন। আমি সভামধ্যে সর্বসমক্ষে এই কথা ঘোষণা করে দেয়াতে সবাই সমর্থন ও আনন্দ প্রকাশ করলেন। তাই পাতার হাট কলেজের নাম হলো আর.সি. কলেজ (রসিক চন্দ্র কলেজ)।

স্থির হলো যথাশীঘ্র অফিসার্স ক্লাবের টিনের ঘরে কলেজ শুরু হবে। এবং কিছু সংখ্যক পোষ্ট গ্রাজুয়েট স্থানীয় অফিসার ও হাইস্কুলের শিক্ষক পাওয়া গেল যারা অবৈতনিক পড়াবেন বলে উৎসাহ দেখালেন। এইভাবে বিনা খরচে তাৎক্ষণিকভাবে পাতারহাট আর.সি.কলেজ প্রথম যাত্রা শুরু করল। গান্ধী বাবুর বদান্যতায় কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে কয়েক একর জমির উপরে বর্তমান পাতার হাট আর.সি.কলেজটি সুপ্রতিষ্ঠিত হলো।

সাবেক ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ মিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম সভায় উপস্থিত ছিলেন না বলে আমার নিকট দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ওয়াদা করেন যে, ঐ কলেজের জন্য তিনি পাকা ছাত্রাবাস তৈরী করে দিবেন। লতিফ মিয়ার বদান্যতায় ঐ কলেজ সংলগ্ন একটি সুরম্য ছাত্রাবাস তৈরী হয়েছে। মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপনে তাদের দান বেশ উল্লেখযোগ্য।

টেলিফোন ও টেলিগ্রাম এক্সচেঞ্জ

আমি যখন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী (প্রতিমন্ত্রীর পজিশন) তখন পূর্ব পাকিস্তান টি-এন্ড টি ডিপার্টমেন্টের জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন মিঃ লোকমান। তার নিকট থেকে মেহেন্দীগঞ্জ, হিজলা ও মুলাদী থানার জন্য তিনটি বেতার টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ এক্সচেঞ্জ মঞ্জুর করালাম। তারপর

একদিন অপারেটার ও টেকনিশিয়ান নিয়ে মটর লঞ্চে প্রথম মুলাদী পৌছলাম। অনেক চেষ্টার পর মুলাদী সাব পোষ্ট অফিসের পোষ্ট মাষ্টার সাহেবকে রাজী করে তার টেবিলে ওয়ারলেস সেট প্রথম মুলাদী থানার জন্য স্থাপন করলাম। তারপরে হিজলা থানায় এসে আর কোথাও জায়গা না পেয়ে থানা পুলিশ ইনচার্জের টেবিলে টেলিফোন একচেঞ্জ প্রতিষ্ঠা করলাম। তারপরে পাতার হাটে এসে কোথাও একটু সরকারী জায়গা না পেয়ে বড়ো মুশকিলে পড়ে গেলাম। আমার এই বেহাল অবস্থা দেখে পাতার হাট কলেজের হোটেল প্রতিষ্ঠাতা দান দক্ষিণার জন্য যে পরিবার পূর্ব থেকেই পাতার হাটের মধ্যে সুনাম অর্জন করে আসছেন সেই ফ্যামিলির লতিফ মিয়া এক কালের ইউনিয়ন কাউনসিলের চেয়ারম্যান আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসলেন। থানার নিকটে বড় রাস্তার পাশে তার একটি দোকান বিনা ভাড়ায় এই ওয়ারলেস সেট স্থাপন করার জন্য প্রস্তাব করলেন। মেহেদীগঞ্জ বিশেষ করে পাতার হাট বন্দরবাসীদের উপকারের জন্য এই ওয়ারলেস টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস লতিফ মিয়ার দোকানে প্রায় এক দেড় বছর বিনা ভাড়ায় ছিল। তারপরে অনেক চেষ্টা তদবীর করে সরকার দ্বারা এই তিন থানায় টেলিফোন এক্সচেঞ্জের জন্য জমি একোয়ার করালাম–ও পাকা বিল্ডিংয়ের সুব্যবস্থা করে দিলাম। যার ফলশ্রুতিতে সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের জন্য যোগাযোগের প্রভূত সুযোগ-সুবিধা হয়েছে, এমনকি এই তিন থানা হেডকোয়ার্টার থেকে পৃথিবীর যে কোন স্থানে প্রয়োজনীয় লোকদের সাথে কর্থাবার্তা বলতে পারে, সংবাদ আদান প্রদান করতে পারে ও ব্যবসা সংক্রান্ত কর্মকান্ড সমাধা করার ব্যবস্থা হয়েছে। লোকে জানুক বা না জানুক আমি আমার কর্তব্য যতটা সম্ভব সম্পন্ন করেছি।

সুপারী বাগানে সংক্রামক রোগের আক্রমন

আমার সংসদ সদস্য আমলে খুব সম্ভব ১৯৬৩ সনে সারা পূর্ব পাকিস্তানের সুপারী বাগানে ভীষণ সংক্রামক রোগের আক্রমন হয়। বহু সুপারী গাছ মরে গিয়ে অনেক বাগান ধ্বংস হয়ে যেতে লাগল দেখে লোকজন বিভিন্ন জেলা থেকে টেলিগ্রাফের মারফত এই মারাত্মক রোগ সম্পর্কে রাওয়াল পিণ্ডিতে সংসদ চলাকালীন অবস্থায় আমাকে অবহিত করলেন। ধান পাটের পরেই সুপারী একটি অর্থকরী ফসল। আমি এই মারাত্মক সংবাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরে সংসদের ভিতরে ও বাহিরে সরকারের নিকট এই রোগ নিবারণের জন্য অনুরোধ করলাম

এবং ধান পাট ইত্যাদির রোগ নিবারণ ও উৎপাদনের উন্নয়নের জন্য যেভাবে গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে সেরূপ একটি গবেষণাগার সুপারির জন্যও মঞ্জুর করা হোক বলে প্রস্তাব দিলাম। আমার সেই প্রস্তাবের ফলশ্রুতিতে বরিশালের অদূরে রহমতপুরে একটি সুপারী গবেষণাগার সুপারী চাষী ভাইদের কল্যাণের জন্য স্থাপনে সমর্থ হই। এখনও উক্ত গবেষণাগার সারা বাংলাদেশের সুপারী চাষীদের খেদমত করে আসছে।

পাকিস্তান ভাঙ্গবার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানীরাই দায়ী

আগেই বলেছি পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই সাবেক আই-সি-এস (ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের) ভারতীয় মুসলমান অফিসারগণ সকলেই পশ্চিম পাকিস্তানে ঐচ্ছিক বদলী হলো। মাত্র এক জন পূর্ব পাকিস্তানী মিঃ নূরুন্নবী চৌধুরী ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের লোক পূর্ব পাকিস্তানবাসী বলে পূর্ব পাকিস্তানে অপট্ করলেন। তারপরে সিনিয়র মিলিটারী সার্ভিসের (লেঃ কর্ণেলের উপরের র‍্যাংক সকলে) পশ্চিম পাকিস্তানে ঐচ্ছিক বদলী হলো। এই দুই শাসন যন্ত্র পশ্চিমপাকিস্তানীরা হাতে পেয়ে পাশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিবিদ্‌দের স্বাভাবিকভাবেই বৃটিশের মত পূর্ব পাকিস্তানে একটা কলোনির মত শাসন করবার কু-প্রবৃত্তি মনে জাগল। কিন্তু তারা বুঝতে চেষ্টা করল না যে বৃটিশের মত সাম্রাজ্য শাসন করবার উচ্চ পর্যায়ের বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা তাদের ছিল না। এর সাথে যোগ হলো পূর্ব পাকিস্তানী রাজনীতিবিদ্‌দের অর্থ উপায়ের ও মন্ত্রীত্বের গদীর লোভ। যার জন্য তারা মানসিক দূর্বলতায় ভুগতো। আমার মনে হয় এই কারণে পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিবিদরা আমাদের পূর্ব পাকিস্তানীদের সাথে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করতে লাগল। যে কারণে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের মধ্যে পাহাড় সম আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্য প্রত্যেক দিন গড়ে উঠতে লাগল।

যে পূর্ব পাকিস্তান মুসলমান জনগণের ভোটে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল তাদেরই উপরে আজ পশ্চিমপাকিস্তানের অমানবিক, আর্থিক, বৈষম্যসূচক শাসকদের দূর্বার শাসন দন্ড চলতে থাকাতে স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা দৈনন্দিন অধিক ক্ষুব্ধ হতে লাগল। 'উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে এ আইন পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের মনে আগুন ধরিয়ে দিল, তাদের মাতৃভাষা হারাবার ভয়ে পূর্বপাকিস্তানবাসী শংকিত হয়ে গেল। তারপরে আমার ১১ই অক্টোবর ১৯৬৩ সনের জাতীয় পরিষদের বক্তৃতা যা দৈনিক ইত্তেফাক ১৩ই

এপ্রিল দেশ রক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগে পূর্বপাকিস্তানীদের বিভিন্ন হার শিরোনামে এবং The Dacca Times friday day April 19,1963 নিম্নরূপ ছেপেছিল East Pakistan in The Army officers; only 5 percent other Ranks: over 7 percent ঢাকা টাইম্স, শুক্রবার ১৯ শে এপ্রিল ১৯৬৩।

পূর্বপাকিস্তানে সেনাবাহিনীর অফিসারের হার ছিল মাত্র শতকরা ৫% শতাংশ এবং অন্যান্য র‍্যাংকের হার ছিল শতকরা ৭% শতাংশের উপর।

ইত্তেফাক ১৩ই এপ্রিল ১৯৬৩
দেশরক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগে
পূর্ব পাকিস্তানীদের হার
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তান সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের জন্য অনুমোদিত হার কত এবং বাস্তব ক্ষেত্রে শতকরা কতজন আছে, তৎসম্পর্কে বিগত ১১ই অক্টোবর মেজর মোহাম্মদ আফসারউদ্দীন যে প্রশ্ন করেন গতকল্য (শুক্রবার) দেশ রক্ষা বিভাগের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী উহার জবাব দেন। নিম্নে তাহার জবাবের সামগ্রিক চিত্র প্রদত্ত (পূর্ব পাকিস্তানীদের শতকরা হার) হইল ঃ

	অফিসার	জুনিয়ার কমিশণ্ড অফিসার		ওয়ারেন্ট অফিসার	অন্যান্য পদবী
(ক) সেনাবাহিনী	৫	৭·৮		×	৭·৪
মেডিক্যাল কোর	২৩	×		×	×
(খ) নৌ-বাহিনী		ব্রাঞ্চ অফিসার	চীফ পেটী অফিসার	পেটি অফিসার	লিডিং সীম্যান ইত্যাদি
	১০	৫	১০·৪	১৭·৩	২৮·৮
(গ) বিমান বহিনী	১৬	১৭	–	–	৩০

১৯৪৭ সনের আগষ্ট হইতে এ-যাবৎ বিদেশে উচ্চতর ট্রেনিং-এর জন্য প্রেরিত পূর্ব পাকিস্তানী সামরিক ব্যক্তিদের শতকরা হার ঃ

	অফিসার		জুনিয়র কমিশন্ড		ওয়ারেন্ট অফিসার		অন্যান্য		সিভিলিয়ান	
	পূঃ	পঃ	পূঃ	পঃ	পূঃ	পঃ	পূঃ	পঃ	পূঃ	পঃ
আর্মি	৮	৯২	১	৯৯	—	—	২·৩	৯৭·৭	৬	৯৪
নেভী	১০	৯০	১২	৮৮	১২	৮৮	২০	৮০	৩	৯৭
এয়ার	১২	৮৮	—	—	১৪·২	৮·৫·৮	১৭	৮৩	—	—

পাকিস্তান অর্ডিনান্স ফ্যাক্টরী (পূর্ব পাকিস্তানীদের হার)

নন টেকনিক্যাল		টেকনিক্যাল		অন্যান্য পদবী	
				টেকনিক্যাল	ননটেকনিক্যাল
১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী		
৬·২৫	৮·৭০	৩·৮০	১৪·৯	৪·৮২	১·৮০

(পরবর্তীতে জাতীয় পরিষদে আমার প্রশ্নের উত্তরে পাকিস্তান সরকার লিখিতভাবে এই পরিসংখ্যানটি দিয়েছিলো।

আর্মি, নেভি এবং এয়ারফোর্সে এই যে হিমালয় পাহাড় সমান বিরাট বৈষম্য বিরাজ করছে এটা প্রথম বারের মতো আমার চেষ্টায় সরকারের লিখিত স্বীকারোক্তিতে পূর্বপাকিস্তানবাসী বুঝতে পারল যে তারা শুধু মাতৃভাষা বাংলাই হারাতে চলছে না। উপরোক্ত কারণে আর্থিক বৈষম্য সৃষ্টি করে পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের মুখের গ্রাস– পাশ্চিম পাকিস্তানীরা দৈনন্দিন কেড়ে নিচ্ছে। আমার মনে হয় বিশেষ করে এই দুই কারণেই পূর্বপাকিস্তানীদের বিদ্রোহী হয়ে উঠবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ ছিল। সামরিক বাহিনী সম্পর্কে আমার এই পাকিস্তান সংসদীয় বক্তৃতা পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত মহলে ও সামরিক বাহিনীর নিকট দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল।

আমার নামও এইভাবে আমার অলক্ষ্যে বাংলাদেশের গণমনে ছড়িয়ে পড়ল। ১৯৬৪ সনের শেষ দিকে বা ১৯৬৫ সনের প্রথম দিকে ঢাকা ইনিভার্সিটির উপরের ক্লাসের একটি ছেলে এসে আমাকে বলল যার সারমর্ম এইভাবে বলা যায় পূর্বপাকিস্তানীদের বাঁচতে হলে পূর্বপাকিস্তানকে আলাদা করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে। এজন্য ছাত্র ও যুবকদলের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ করার জন্য বেশ সাড়া পাওয়া গেছে। ঐ ছাত্রটি আরো বললো যে ঢাকাস্থ ভারতীয় ডিপুটি হাইকমিশন তাকে কথা দিয়েছে যে, এই মক্তিযুদ্ধে যত অস্ত্র এবং টাকা পয়সা

প্রয়োজন হবে তা ভারত সরকারের পক্ষে ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশন তার ব্যবস্থার দায়িত্ব নিবে। এখন তাদের দরকার শুধু এই বিদ্রোহ বা মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়ার জন একজন উপযুক্ত প্রাক্তন সামরিক অফিসার। তাই এই নেতৃত্ব দেয়ায় জন্য আমাকেই তারা মনে মনে বেছে নিয়েছে। এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ থাকলে তার সাথে গিয়ে ভারতীয় হাইকমিশনারের সাথে কথা বলতে পারি।

আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম যে, পাকিস্তান সরকারের বিরূদ্ধে বিদ্রোহ বা মুক্তিযুদ্ধ করবার মতো সঠিক পরিস্থিতি এখনও পূর্ব পাকিস্তানে সৃষ্টি হয়নি। এভাবে চলতে থাকলে হয়ত দু-চার বছরের মধ্যে সেই পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। সবদিক বিবেচনা করে পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ণ না করে এহেন গুরুতর বিষয়ে হাত দিলে বিদ্রোহ বিফল হয়ে যেতে পারে এবং পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের উপর পাকিস্তানী শাসক ও সামরিক বাহিনীর দুর্বার অত্যাচার ও জুলুম নেমে আসবে ও অযথা বহু লোক প্রাণ হারাবে, তাই আরো কিছু দিনের জন্য অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা খুবই দরকার বলে আমি মনে করি।

তা ছাড়া যে ভারতীয় সরকার জাতিসংঘে উপর্যুপরি ওয়াদা করে জম্মু ও কাশ্মীরে গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীরীদের ইচ্ছা ও আকাঙ্খা প্রকাশ করতে না দিয়ে গণহত্যার মাধ্যমে কাশ্মীর জবরদখল করে রেখেছে সেই ভারতীয় সরকার বিনা স্বার্থে পূর্বপাকিস্তানীদের জন্য সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র ও টাকা পয়সা দিবে কেন? আমাদের দেশের ব্যাংক ও বীমা জমি মরগেজ না রাখলে আমাকে টাকা পয়সা ধার দেয় না সেখানে বিদেশী ভারত সরকার আমার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব তাদের হাতে জিম্মা না রাখলে তারা আমাদের অত বড় সাহায্য দিবে কেন। যা হোক আমার বুঝতে বাকী রইল না– যে পূর্বপাকিস্তান বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং ভারত সরকার এই বিদ্রোহে ইন্ধন যোগাচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানকে ভেঙ্গে আরও ছোট ও দূর্বল করা।

পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন করবার সক্রিয় ষড়যন্ত্র

পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর মধ্যে বিশেষ করে নৌবাহিনী স্বাধীনতার ষড়যন্ত্রে সক্রিয় নেতৃত্ব দেয়। ১৯৬৬ সনে বেশ গুজব শুনা যায় যে নৌবাহিনীর অফিসার ও জোয়ানদের মনে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার জন্য দাবানলের মতন সকল জাহাজে জাহাজে এবং করাচী বন্দরের স্থায়ী নৌঘাঁটিতে বাংগালী অফিসার ও

জোয়ানদের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি চলছে। এই চাপা গুজব প্রায় সকল দায়িত্বশীল সরকারী ও বেসরকারী মহলে প্রচারিত হয়ে পড়ে।

১৯৬৮ সনের ৬ই জানুয়ারী এক সরকারী প্রেসনোটে খবরের কাগজের মাধ্যমে জানানো হলো যে, ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনের ফার্ষ্ট সেক্রেটারির যোগ সাজসে রাষ্ট্র বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার কারণে নৌবাহিনীর পূর্বপাকিস্তানী লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের নেতৃত্বে ১৮ জন সামরিক জুনিয়র অফিসার ও জোয়ান এবং বেসামরিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই প্রেসনোটের পর সকল জল্পনা কল্পনার অবসান হলো। যেহেতু এই ষড়যন্ত্র ভারতীয় সরকার ও সামরিক বাহিনীর সাথে পাকাপোক্ত করার জন্য ভারতীয় ত্রিপুরা রাষ্ট্রের আগরতলাতে যাওয়া হয়েছিল সে জন্য এই ষড়যন্ত্রের সরকারী নাম 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' নামে প্রচার করা হয়েছিল।

পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার লক্ষে এই সক্রিয় বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রের মূলে নেতৃত্ব দিয়েছিল আমাদের নৌবাহিনীর লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন্ট মোহাম্মদ ফজলুল হক, হাবিলদার ক্লার্ক মুজিবর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন্ট জহুরুল হক প্রভৃতিসহ জুনিয়র র‍্যাংকের অফিসার ও জোয়ানগণ।

কিন্তু সরকার ঝোপ বুঝে কোপ দিবার প্রস্তুতি নিলেন। বিরোধী পক্ষের রাজনৈতিক নেতৃত্ব খতম করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সরকার আওয়ামী লীগের শেখ মজিবুর রহমান সাহেবকে তার সাথে আরো কয়েকজন রাজনীতিবিদ ও সিনিয়র সেন্ট্রাল সার্ভিসের অফিসার যারা পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী দাওয়া আদায়ের জন্য সক্রিয় ছিলেন তাদের নামও এই বিদ্রোহের সাথে যুক্ত করে দিলেন। শেখ মজিবুর রহমানের জীবনাবসান অথবা রাজনৈতিক ক্রিয়া কর্ম খতমের জন্য তাকে এই ষড়যন্ত্রের এক নম্বর আসামী করা হলো যদিও লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম ছিল এই ষড়যন্ত্রের প্রধান নেতা। লক্ষ লক্ষ বার খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতিতে ষ্টেট ভারসাস শেখ মুবিজর রহমানের নাম উল্লিখিত হতে লাগল। লোকে জানতে লাগল যেন শেখ মুজিবর রহমানই এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতে যাচ্ছিল। আগরতলা কেসেও পরে প্রমাণিত হয়েছিল যে শেখ সাহেবের এই বিদ্রোহের অংশ খুবই সামান্য ছিল। তাই আস্তে আস্তে সরকারের এই ষড়যন্ত্রমূলকভাবে শেখ সাহেবের নাম এক নম্বর আসামী হিশেবে চিহ্নিত করাতে তিনি বাঙ্গালীদের মনে স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক হিশেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন। আর এই ষড়যন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা মূল নায়ক লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেমের নাম সাধারণ একজন বিদ্রোহীর সারিতে স্থান পেল। যেই কারণে

পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা জানতে পেল না যে তিনিই ছিলেন এই ষড়যন্ত্রের মূল নেতা। পরবর্তীতে আগরতলা ষড়যন্ত্র কেসের সকল আসামীকে পূর্ব পাকিস্তানীদের জলে স্থলে সকল স্তরে গণ মানবের আন্দোলনের কারণে ছেড়ে দেয়া হল। শুধু তাই নয়, তখন শেখ মুজিবর রহমানকে রাওয়ালপিণ্ডিতে অনুষ্ঠিত সরকার ও বিরোধী দলের সকল পার্টির মিলিত গোল টেবিল বৈঠকে অংশ নেয়ার জন্য রাওয়াল পিণ্ডিতে শেখ সাহেবের যাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। গণআন্দোলন ও জনগণের বিজয় সুচিত হলো।

আগরতলা ষড়যন্ত্রের সকল আসামীর মুক্তির পরে একদিন লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম সাহেব আফসোস করে আমাকে বলেছিলেন যে, প্রকৃত বিদ্রোহ ও আগরতলা ষড়যন্ত্র নিজের জীবন বিপন্ন করে তিনি করেছিলেন, আর ভাগ্যের কী পরিহাস এই ষড়যন্ত্রের ফল পেল শেখ মুজিবর রহমান।

২৫শে মার্চ গভীর রাত্রে পাক বাহিনী যখন স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম আঘাত হানল তখন সর্ব প্রথম মোয়াজ্জেমকে গুলি করে হত্যা করা হলো আর শেখ মুজিবর রহমানকে নেয়া হল মিলিটারী হেফাজতে। এই বৈষম্য মূলক ব্যবহারেও কমাণ্ডার মোয়াজ্জেমের ষড়যন্ত্রের নেতৃত্ব সত্য বলে প্রতিপন্ন হলো।

বিখ্যাত ৬ দফা আন্দোলন

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পরে পরেই নিম্নলিখিত ৬ দফা নিয়ে বিরোধী পক্ষের রাজনৈতিক দল শহরে-বন্দরে, গ্রামেগঞ্জে, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলে প্রচারাভিযান চালাতে শুরু করল। সরকারী তরফে এর বিরুদ্ধে তেমন কোন যুক্তি সঙ্গত জোরালো প্রচারণা চালাতে সক্ষম হলো না। আমার নিজস্ব নির্বাচনী এলাকার বহু শিক্ষিত রাজনৈতিক নেতা স্কুল কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের নিকট আমি জানতে চেয়েছিলাম ৬ দফা কী তা তারা জানে কি না? আমি আশ্চর্য হলাম শুধু আমার এলাকার শিক্ষিত লোকই নয় মুর্খ লোকতো দূরের কথা রাজধানী ঢাকার বহু শিক্ষিত লোকও ৬ দফা কী তা জানতেন না। তবুও প্রচারের জোরে ও মুখে তারা ৬ দফা ৬ দফা বলে চিৎকার দিতেন ও সমর্থন করতেন। ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদ ও ১৭ই ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে বিরোধী দল নিম্নরূপ ৬ দফাকে আখ্যায়িত করতেন।

১। পাকিস্তান সরকারের রূপরেখা হয়ে ফেডারেল পার্লামেন্টারী। সকল সদস্য সর্বজনীন ভোটাধিকার ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচিত হবে।

২। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় ফেডারেল সরকারের হাতে কেবল দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় থাকবে।

৩। দেশের দুই অংশের জন্য ২টি পৃথক মুদ্রার ব্যবস্থা থাকবে। অথবা ফেডারেল রিজার্ভ ব্যবস্থাসহ দুই অংশের জন্য ২টি রিজার্ভ ব্যাংক একই মুদ্রা ব্যবহার করবে।

৪। রাজস্ব এবং ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা অঙ্গ রাজ্যের হাতে থাকবে। কিন্তু দেশ রক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি এক কথায় কেন্দ্রীয় ফেডারেল সরকারের যাবতীয় খরচ অঙ্গ রাজ্যগুলি বহন করবে।

৫। অঙ্গরাজ্যগুলি তাদের নিজ নিজ অর্জিত রাজস্ব, ট্যাক্স, বা আয় ব্যায়ের হিশেব রাখবে।

৬। দেশ রক্ষা ব্যবস্থায় শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে অঙ্গরাজ্যগুলিকে মিলিশিয়া ও প্যারা মিলিশিয়া রাখার ক্ষমতা দেয়া হবে।

ঐতিহাসিক গোল টেবিল বৈঠক

আয়ূব মন্ত্রী সভা হতে বিতাড়িত পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে পাকিস্তান পিপলস পার্টি নামক একটি রাজনৈতিক দল পশ্চিম পাকিস্তানে গড়ে উঠে। এই দলটি দেশী ও বিদেশী সহায়তায় তাক লাগানো দ্রুত গতিতে রাষ্ট্রপতি আয়ুব খানের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানে সবিশেষ জনপ্রিয় বিরোধী দল হিশেবে গড়ে উঠে। আয়ুব খান যদিও পাকিস্তানের উভয় অংশে বহু জনহিতকর কাজ করে গেছেন তবুও যেহেতু তিনি অগণতান্ত্রিক পথে মার্শাল ল'র মাধ্যমে পাকিস্তানের শাসনদণ্ড হাতে নিয়েছিলেন এই কারণে তার দেশীয় বিরোধী চক্র ও বৈদেশিক অক্ষশক্তি এক সাথে আয়ুবখানকে গদীচ্যুত করতে খুবই সুযোগ পেল। আয়ূব খানও গর্বিত লোক, এত জনহিতকর কাজ করেও দেশের উভয় অংশের জনগণের বিরোধিতা দেখে মনে মনে খুব ক্ষুব্ধ হলেন এবং বিনা রক্তপাতে শান্তিপূর্ণভাবে সর্ব দলের নির্ধারিত নেতার নিকট শাসনভার অর্পণ করার জন্য তিনি রাওয়াল পিণ্ডিতে সর্বদলীয় নেতাদের গোল টেবিল বৈঠক ডাকলেন। ১৯৬৯ সনের ২৬শে ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিণ্ডিতে অনুষ্ঠিতব্য গোল টেবিলে যোগদানের অনিচ্ছা প্রকাশ করে জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো করাচীর প্রেসক্লাবে ১৮ই ফেব্রুয়ারি বক্তৃতা দেন। জনাব শেখ মুজিবর রহমান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত হয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দল ও সংগ্রামী ছাত্রপরিষদের সাথে পরামর্শ

করে রাওয়ালপিণ্ডি গোল টেবিল বৈঠকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। গোল টেবিল বৈঠক কয়েক দফা মুলতবী হওয়ার পর, বহু আলাপ আলোচনার পর জনাব শেখ মুজিবর রহমানকে পাকিস্তানের উভয় অংশের জনগণের নেতা হিশেবে ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানের নিকট হতে ক্ষমতা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন। আয়ুব খানও এই প্রস্তাবে রাজী হন। কিন্তু জনাব শেখ মুজিবর রহমান প্রথমে জাতীয় নির্বাচন এবং পরে নির্বাচিত নেতা আয়ুব খান থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করবেন বলে জেদ ধরেন।

এই পর্যায়ে একদিন খবরের কাগজের মাধ্যমে দেখতে পেলাম প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান শেখ মজিবুর রহমানকে একা নৈশভোজের দাওয়াত দিয়ে শেখ মুজিবর রহমান ও ফিল্ড মার্শাল আয়ুবখান দীর্ঘ ৬/৭ ঘন্টা কাটিয়েছেন। তার পরের দিন জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো আয়ুবখানকে খোঁচা দিয়ে খবরের কাগজের মাধ্যমে জিজ্ঞেস করলেন যে দীর্ঘ নৈশভোজনে দু'জনে নিভৃতে সুস্বাদু গাজর কা হালুয়া খেয়েছিলেন কিনা?

আমারও মনে মনে সন্দেহ হচ্ছিল এই দীর্ঘ নৈশভোজনের কারণ কি। শেখ মজিবুর রহমান সাহেবের আয়ুব খানের কোন সহপাঠী, বাল্য বন্ধুর রাজনৈতিক বন্ধু নয় বরং শেখ সাহেবকে ফাঁসি দেয়ার জন্য আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত করা হয়েছিল। কাজেই এত দীর্ঘ সময় কী বিষয় নিয়ে গোপন আলাপ হতে পারে এ বিষয় প্রশ্ন আমার মনেও কেবলই উঁকি দিচ্ছিল।

পরবর্তীতে আয়ুবখান রাষ্ট্রপতির পদ পদত্যাগ করে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর চীফ অব ষ্টাফ ইয়াহিয়া খানের নিকট ২৪শে মার্চ ১৯৬৯ সন ক্ষমতা অর্পণ করে কিছু দিন পর চিকিৎসার জন্য আমেরিকায় চলে যান।

Presidents' House,
Rawalpindi, 24th March, 1969.

My dear General Yahhya,

It is with profound regret that I have come to the conclusion that all civil administration & constitutional authority in the country have become ineffective. If the situation continues to deteriorate at the present alarming rate all economy, life, indeed the civilized existence will become impossible.

I am left with no option but to step aside & leave it to the Defence Forces of Pakistan which today represent the only effective & legal instrument to take full control of the affairs of this country. They are by the grace of God in a position to retrieve the situation and to save country from utter chaos and total destruction. They alone can restore sanity and put the country back on the road to progress in a civil and constitutional manner.

Restoration and maintenance of full democracy according to the fundamental principles of our faith and the needs of our people must remain our ultimate goal. In that lies the salvation of our people who are blessed with the highest qualities of dedication and vision and who are destined to play a glorious role in the world.

It is most tragic that while we were well on our way to happy and prosperous future, we were plunged into an abyss of senseless agitation. Whatever name may have been used to glorify it, the time will show that this turmoil was deliberately created by well tutored and well backed elements. They made it impossible for the government to maintain any semblance of law and order or to protect the civil liberties, life & property of the people.

Every single instrument of administration and every medium of expression of saner public opinion was subjected to inhuman pressure. Dedicated but defenceless government functionaries were subjected to ruthless public critisism or blackmail. The result is that social & ethical norms have been destroyed & instruments of Govt. have become inoperative & ineffective.

The economic life of the country has all but collapsed. Workers and labourers are being incited and urged to commit acts of lawlessness and brutality. While demands of higher wages, salaries, & amenities are being extracted under threat of violence, production is

going down. There has been serious fall in exports and I am afraid the country may soon find itself in the grip of serious inflation.

All this is the result of the reckless conduct of those who acting under the cover of a mass movement struck blow at the very roots of the country during the last few months. The pity is that a large number of innocent but gullible people become victims of their evil design.

I have served my people to the best of my ability under all circumstances. Mistakes there must have been but what had been achieved and accomplished is not negligible. There are some who would like to undo all that I have done and even that which was done by the government before me. But the most tragic & heartrending thought is that there are elements at work which would like to undo even what the Quaid-E-Azam had done namely, the creation of Pakistan.

I have exhausted all possible civil and constitutional means to resolve the present crisis. I offered to meet all those regarded as the leaders of the people. Many of them came to a conference recently but only after I had fulfilled all their preconditions. Some declined to come for reasons best known to them. I asked these people to evolve an agreed formula. They failed to do so inspite of days of deliberations. They finally agreed on two points and I accepted both of them. I then offered that the unagreed issues should be referred to the representatives of the people after they had been elected on the basis of direct adult franchise. My agrument was that the delegates in the conference who had not been elected by the people could not arrogate to themselves the authority to decide all civil and constitutional issues including those on which even they are not agreeing among themselves.

I thought I would call the National Assembly to consider the two agreed points but it soon became

obvious that this would be an exercise in futility. The members of the Assembly are no longer free agents & there is no likelihood of the agreed two points beings faithfully adopted. Indeed members are being threatened & compelled either to boycott the session or to move such amendments as would liquidate the central government, make the maintenance of the Armed Forces impossible, divide the economy of the country and break up Pakistan into little bits and pieces. Calling the Assembly in such chaotic conditions can only aggravate the situtation. How can any one deliberate cooly and dispassionately on fundamental problems under threat of instant violence?

It is your legal and constitutional responsibility to defend the country not only against external aggression but also to save it from internal disorder and chaos. The nation expects you to discharge this responsibility to preserve the security and integrity of the country and to restore normal social, economic and administratiive life. Let peace and happiness be brought back to this anguished land of 120 million people. I believe you have the capacity, patriotism, dedication and imagination to deal with the formidable problems facing the country. You are the leader of a force which enjoys the respect and admiration of the whole world. Your colleaguse in the Pakistan Air Force and in the Pakistan Navy— many are men of honour and I know that you will always have their full support. Together the Armed Forces of Pakistan must save Pakistan from disintegration.

I should be grateful if you would convey to every soldier, sailor & airman that I shall always be proud of having been associated with them as their supreme Commander.

They must know in this grave hour, they have to act as the custodians of Pakistan. Their conduct and actions must be inspired by the principles of Islam and by the

conviction that they are serving the interests of their people.

It has been a great honour to have served the valiant and inspired people of Pakistan for so long a period. May God guide them to move toward greater prosperity and glory.

I must also record my great appreciation of your unswerving loyalty I know that patriotism has been a constant source of inspiration for your life. I pray for your success and for the welfare and happiness of my people. Khuda Hafiz.

Yous sincerely,
Sd/M. A. Khan.

General A. M. Yahya Khan
H. Pk. H. G., C-in-C Army.
General Head Quarters.

এর অনুবাদ মোটামুটি নিম্নরূপ ঃ

প্রেসিডেন্ট ভবন ২৪শে মার্চ, ১৯৬১

প্রিয় জেনারেল ইয়াহিয়া,

গভীর বেদনার সাথে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে দেশে সমস্ত বেসামরিক প্রশাসন ও শাসনতান্ত্রিক কর্তৃত্ব কার্যকারিতা হারাইয়া ফেলিয়াছে। যদি বর্তমানের আশংকাজনক গতিতে অবস্থার অবনতি ঘটিতে থাকে তাহা হইলে দেশের আর্থিক পরিস্থিতিতে সভ্যভাবে জীবনধারণ অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া দেশরক্ষাবাহিনীর কাছে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করা ছাড়া আমার কোন বিকল্প নাই। বর্তমান সময়ে দেশের পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণের জন্য দেশরক্ষাবাহিনীই একমাত্র কার্যকর ও আইনানুগ প্রতিষ্ঠান। আল্লাহ চাহেত অবস্থার পরিবর্তন সাধনপূর্বক পরিপূর্ণ বিশৃংখলা ও ধ্বংসের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করার ক্ষমতা তাহাদের রহিয়াছে। একমাত্র তাহারাই দেশে সুস্থতা ফিরাইয়া আনিতে পারে এবং বেসামরিক ও শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশকে

অগ্রগতির পথে ফিরাইয়া নিতে পারে।

আমাদের বিশ্বাসের মৌলিক নীতিমালা এবং আমাদের জনগণের প্রয়োজন মোতাবেক পূর্ণ গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ইহা বজায় রাখাই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। ইহার মধ্যেই আমাদের জনগণের মুক্তি নিহিত। আত্মোৎসর্গের শ্রেষ্ঠতম গুণাবলীসমৃদ্ধ আমাদের জনগণের পৃথিবীতে একটি গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রহিয়াছে।

ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যখন আমরা সুখী ও সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হইতেছিলাম তখনই আমরা কাণ্ডজ্ঞানহীন বিক্ষোভের শিকারে পরিণত হই। ইহাকে গৌরবান্বিত করার জন্য যে নামই ব্যবহার করা হইয়া থাকুক না কেন, সময়ে প্রমাণিত হইবে যে এই বিক্ষোভ ইচ্ছাকৃতভাবে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে যাহাদিগকে বিপুলভাবে প্রণোদিত করা হইয়াছে এবং মদদ যোগান হইয়াছে। আইন ও শৃংখলার ন্যূনতম চিহ্ন বজায় রাখা কিংবা নাগরিক স্বাধীনতা এবং জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ তাহারা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। প্রশাসনের প্রতিটি অঙ্গ এবং সুস্থ্য জনমত প্রকাশের প্রতিটি মাধ্যমের উপর অমানবিক চাপ প্রয়োগ করা হয়। ত্যাগী মনোভাবাপন্ন অথচ নিরাপত্তাহীন সরকারী প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহ জনগণের রূঢ় সমালোচনা অথবা ব্ল্যাকমেইলের শিকারে পরিণত হয়। ফলে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধগুলি বিনষ্ট হইয়া পড়ে এবং সরকারী যন্ত্র কার্যকারিতা হারাইয়া ফেলে। দেশের অর্থনৈতিক জীবন সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আইনবহির্ভূত এবং নৃশংস কাজ করার জন্য কর্মচারী ও শ্রমিকদিগকে উত্তেজিত করা হইতেছে। একদিকে সন্ত্রাসের হুমকির মুখে অধিক পারিশ্রমিক, বেতন ও সুযোগ সুবিধা আদায় করা হইতেছে অন্যদিকে উৎপাদন হ্রাস পাইতেছে। রপ্তানীক্ষেত্রে মারাত্মক অবনতি ঘটিয়াছে এবং আমার আশংকা অতিসত্বরই দেশ মারাত্মক মুদ্রাস্ফীতির কবলে নিপতিত হইবে।

এই সব হইতেছে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের নৈরাজ্যমূলক আচরণের ফল যাহারা গত কয়েকমাস ধরিয়া গণআন্দোলনের নামে দেশের ভিত্তিমূলে একটির পর একটি আঘাত হানিয়াছে। দুঃখের বিষয় বিপুলসংখ্যক নির্দোষ লোক এই অসৎ পরিকল্পনার শিকারে পরিণত হইয়াছে।

সকল অবস্থার মধ্যে আমি আমার ক্ষমতা অনুযায়ী দেশবাসীর খেদমত করিয়াছি। অবশ্যই যথেষ্ট ভুল ভ্রান্তি রহিয়াছে কিন্তু যাহা অর্জন করা হইয়াছে তাহাও নগণ্য নয়। এমন অনেকে আছেন যাহারা আমি যাহা করিয়াছি এমনকি পূর্বতন সরকার যাহা করিয়াছে তাহাকে ব্যর্থ করিয়া দিতে চাহিবে। কিন্তু

সবচাইতে দুঃখজনক ও হৃদয় বিদারক চিন্তা হইল যে, এমন অনেকে এখন ক্রিয়াশীল রহিয়াছে যাহারা কায়েদে আজমের অবদান অর্থাৎ পাকিস্তান সৃষ্টিকেও ব্যর্থ করিয়া দিতে চাহিবে।

বর্তমান সঙ্কট নিরসনের জন্য আমি সকল বেসামরিক ও শাসনতান্ত্রিক পন্থা প্রয়োগ করিয়াছি। যাহারা জনগণের নেতা হিশেবে পরিচিত তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবার প্রস্তাব দিয়াছি। সম্প্রতি তাঁহাদের অনেকে একটি কনফারেন্সে যোগ দিয়াছিলেন তখনই যখন আমি তাঁহাদের সকল পূর্বশর্ত পূরণ করিয়াছিলাম। কয়েকজন উক্ত কনফারেন্সে যোগ দিতে অস্বীকার করিয়াছেন; এই অস্বীকৃতির কারণ তাঁহাদেরই ভাল জানা। একটি সর্বস্বীকৃত ফর্মুলা উদ্ভাবন করার জন্য আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলাম। কয়েকদিনের আলোচনা সত্ত্বেও তাঁহারা উহা করিতে পারেন নাই। শেষ পর্যন্ত তাঁহারা দুইটি বিষয়ে একমত হইয়াছিলেন এবং আমি ঐ দুইটি বিষয়ই গ্রহণ করিয়াছিলাম। তারপরে আমি প্রস্তাব দিয়াছিলাম, যে সমস্ত বিষয়ে মতৈক্য হয় নাই সেইগুলি প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে যখন জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হইয়া আসিবেন তখন তাঁহাদের বিবেচনার জন্য পেশ করা হইবে। আমার যুক্তি ছিল এই কনফারেন্সে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ যাঁহারা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন নাই তাঁহারা সকল বেসামরিক ও শাসনতান্ত্রিক বিষয় ও নিজেদের মধ্যে যে সমস্ত বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই সেইগুলির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দাবী করিতে পারেন না।

যে দুইটি বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেইগুলি বিবেচনার জন্য জাতীয় পরিষদ আহবান করার কথা আমি চিন্তা করিয়াছিলাম কিন্তু ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে ইহা নিরর্থক প্রচেষ্টা। পরিষদের সদস্যরা আর স্বাধীন প্রতিনিধি নন এবং যে দুইটি বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেইগুলি বিশ্বস্ততার সহিত গৃহীত হয় এমন কোন সম্ভাবনা নাই। প্রকৃতপক্ষে পরিষদ সদস্যদেরকে এই মর্মে হুমকি প্রদান ও বাধ্য করা হইতেছে যাহাতে তাঁহারা হয় অধিবেশন বয়কট করেন অথবা এমন সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করেন যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার বিলুপ্ত হইয়া যায়, সশস্ত্রবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ অসম্ভব হইয়া পড়ে, দেশের অর্থনীতি দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়ে এবং পাকিস্তান ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এমন একটি বিশৃংখল পরিস্থিতিতে জাতীয় পরিষদ আহবান করার অর্থই হইতেছে পরিস্থিতিকে আরও সঙ্কটাপন্ন করিয়া তোলা।

শুধু বিদেশী আগ্রাসনই নয় বরং আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলতা হইতে দেশকে রক্ষা করার আইনগত ও শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব আপনার। জাতি আশা

করে, দেশের নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা বজায় রাখা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আপনি এই দায়িত্ব পালন করিবেন। ১২ কোটি মানুষের এই অসন্তুষ্ট দেশে শান্তি ও সুখ ফিরিয়া আসুক। আমি বিশ্বাস করি দেশের বর্তমান কঠিন সমস্যা মোকাবেলা করার মত ক্ষমতা, দেশপ্রেম, ত্যাগী মনোভাব ও প্রজ্ঞা আপনার রহিয়াছে। আপনি এমন এক বাহিনীর নেতা যার সমগ্র বিশ্বে সম্মান রহিয়াছে। পাকিস্তান বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর আপনার সহকর্মীদের অনেকেই সম্মানিত ব্যক্তি এবং আমি জানি আপনি সর্ব সময়েই তাঁহাদের সমর্থন পাইবেন। পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীকে অবশ্যই বিচ্ছিন্নতার হাত হইতে পাকিস্তানকে রক্ষা করিতে হইবে।

প্রতিটি সৈনিক, নাবিক ও বৈমানিকের নিকট আপনি এই কথা পৌছাইয়া দিবেন যে তাহাদের সুপ্রীম কমাণ্ডার হিশেবে তাহাদের সহিত সম্পর্কিত হওয়াতে আমি গর্বিত; সেই জন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।

তাহাদের জানা উচিত, বর্তমান সঙ্কটাপন্ন মুহূর্তে তাহাদিগকে পাকিস্তানের রক্ষক হিশেবে কাজ করিতে হইবে। তাহাদের আচরণ ও কাজ ইসলামের নীতিমালা ও জনগণের স্বার্থ রক্ষার মনোবৃত্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। দীর্ঘকাল ধরিয়া পাকিস্তানের সাহসী ও অনুপ্রাণিত জাগণের খেদমত করিতে পারিয়া আমি পরম সম্মানিত বোধ করিতেছি। আল্লাহ তাঁহাদিগকে অধিকতর অগ্রগতি ও গৌরবের পথে পরিচালিত করুন।

আপনার দ্বিধাহীন আনুগত্যের কথাও আমি পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করিতেছি। আমি জানি, আপনার সমগ্রজীবনে দেশপ্রেমই হইতেছে সর্বময় প্রেরণার উৎস। আমি আপনার সাফল্য এবং আমার দেশবাসীর কল্যাণ ও সুখের জন্য দোয়া করি। খোদা হাফেজ।

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাঃ / এম. এ. খান

জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা গ্রহণ

ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানের উক্ত ক্ষমতা প্রত্যাহারের পত্র প্রাপ্তির পর সৈন্য বাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সনের ২৫ শে মার্চ সন্ধ্যা ৭-১৫ মিনিটের সময়ে দেশে সামরিক আইন জারী করেন। পাকিস্তান সংবিধান, জাতীয়

ও প্রাদেশিক পরিষদ বিলুপ্ত করেন। গভর্ণর ও মন্ত্রীদের অবসান করে পাকিস্তানকে দু'টি সামরিক অঞ্চলে বিভক্ত করেন।

জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে ২৬ শে মার্চ ভাষণে দেশবাসীকে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি কর্তৃক সংবিধান প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি দেন। আয়ুব খানের উল্লেখিত ক্ষমতা ইস্তফা পত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। তবুও দফাওয়ারি বলতে গেলে আমার মনে হয় নিম্নলিখিত কারণগুলি আয়ুব খানকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১। আয়ুব খান ক্ষমতা দখলের সময় মার্কিন সরকারের আশীর্বাদ ছিল এবং সি, আই. য়ের সক্রিয় সমর্থন ছিল কিন্তু শেষের দিকে আয়ুব খান কমুনিষ্ট রাষ্ট্র রাশিয়া ও মহাচীনের সাথেও বন্ধুতা করাকে মার্কিন সরকার ঈর্ষার চোখে দেখতে লাগল। তাই তারা আয়ুব খানকে ক্ষমতা থেকে সরাবার জন্য চেষ্টিত ছিল।

২। আয়ুব খানের গঠনমূলক উন্নয়ণ পরিকল্পনা আর্থিক উন্নয়ণ, বিশেষ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ক্ষমতালাভ ও ১৯৬৫ সনের যুদ্ধে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা দেখে ভারত সরকার বিশেষ ভাবে শংকিত হয়ে পড়ে। তাই ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর দিল্লী চক্রের বশংবদদের আয়ুব খানকে ক্ষমতা থেকে সরাবার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠল।

৩। বিদেশী অর্থপুষ্ট ক্ষমতা লিপ্সু রাজনীতিবিদ্দের অপচেষ্টা।

৪। বহুদিনের পাঞ্জাবী হুকুমত কায়েমের স্বপ্নবিলাসী সামরিক ও বেসামরিক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারির অপচেষ্টাগুলো ও পাঠান হওয়ার কারণে আয়ুব খানকে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা থেকে অপসারণের প্রধান কারণ বলে আমার নিকট প্রতীয়মান হয়।

এতগুলি বড় বড় দেশী ও বিদেশী শক্তির এক সাথে একই সময় আয়ুব খানকে সরাবার চেষ্টা করলে আয়ুব খান কেন যে কোন শাসককে অপসারণ করা সম্ভব হতে পারে। এ বিষয়ে ছোট্ট একটি গল্প উল্লেখযোগ্য বলে আমার নিকট প্রতীয়মান হয়।

রাওয়ালপিন্ডিতে বসবাসকারী এক মেজর নেওয়াজ (অবঃ) আমার খুব বন্ধু ছিলেন। তার ছেলে রাওয়ালপিন্ডি গর্ডন কলেজে তখন বি, এ ক্লাসের ছাত্র। সেই ছাত্রটি আমাকে একদিন গল্পচ্ছলে বলল যে আয়ুবের বিরোধী ছাত্রদলের ছেলেরা তার চোখের সামনে নতুন নতুন তৈরী স্যুটকোট ও ফিটফাট পোষাক পরিচ্ছদ পরে বেড়াচ্ছে। তারও সাধ হলো ঐরূপ নতুন পোষাক পরিচ্ছদ পরার তাই

একদিন সে আয়ুব শাসনের বিরোধী-ছাত্র দলের নেতার নিকট গমন করে ঐ দলে নাম লিখাল। অল্প কিছু দিনের মধ্যে তাকে আয়ুব খানের বিরুদ্ধে সক্রিয় কাজ কর্ম করার জন্য নগদ বেশ কিছু টাকা ও একটি নতুন মোটর সাইকেল দেয়া হল। তার হিসেব মতে আয়ুব খান শাসনের পতনের পরে তার মোটর সাইকেল সহপ্রায় ৯শ 'মটর সাইকেল' ওয়াপস নিয়ে গেল। তার পরে এই মোটর সাইকেলগুলি কোথায় গেল বা কী হলো তা শুধু ঐ ছাত্র নেতারাই জানে।

উপরোক্ত গল্পটি যদিও খুব ছোট্ট তবুও বেশ অর্থবহ। আমার মনে হয় এই ছোট্ট গল্পটি আমার উপরোক্ত অনুমানের সত্যতার স্বাক্ষ্য বহন করবে।

জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত

জেনারেল ইয়াহিয়া খান কতিপয় সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ২৮ শে নভেম্বর ১৯৬৯ সন জাতির উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন ঃ যথা–

১। পশ্চিম পাকিস্তানের এক প্রদেশ ভেঙ্গে দিয়ে সেখানে সাবেক অবলুপ্ত যেমন, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশগুলোর পুনর্বহাল।

২। সংখ্যাসাম্য নীতি অবলুপ্ত করে এক ব্যক্তির ভোট ভিত্তিতে সংখ্যানুপাতে নির্বাচন প্রদান।

৩। প্রদেশগুলি নিয়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রে ফেডারেল পার্লামেন্টারী গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা।

৪। নব নির্বাচিত গণপরিষদ কর্তৃক প্রথম বৈঠকের পর হতে ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান রচনা এবং পরে জাতীয় সংসদ কর্তৃক এর গ্রহণ।

৫। ১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারী হতে প্রকাশ্য রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ শুরু।

৬। সংবিধান রচনা অবধি সামরিক আইন বলবৎ থাকবে এবং

৭। ৫ই অক্টোবর ১৯৭০ সন জাতীয় পরিষদের নির্বাচন হবে।

লিগাল ফ্রেমওর্য়াক (আইনগত কাঠামো)

২৮শে মার্চ ১৯৭০ সন ইয়াহিয়া খান তার রচিত লিগাল ফ্রেমওর্য়াক অর্ডার ঘোষনা করেন এবং ২৮শে অক্টোবরের মধ্যে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের সিদ্ধান্ত ঘোষনা করেন। তার এই লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার এ জাতীয় পরিষদের সদস্য সংখ্যা জনসংখ্যা ভিত্তিক নিম্নরূপ নির্ধারিত হয় যথা–

		সাধারণ আসন		মহিলা আসন
পূর্ব পাকিস্তান	”	১৬২	”	৭
পাঞ্জাব	”	৮২	”	৩
সিন্ধু	”	২৭	”	১
বেলুচিস্তান	”	৪	”	১
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	”	১৮	”	১
কেন্দ্রীয় শাসিত উপজাতীয় এলাকা	”	৭	”	০
		৩০০	–	১৩

প্রাদেশিক পরিষদ

		সাধারণ আসন		মহিলা আসন
পূর্ব পাকিস্তান	”	৩০০	”	১১
পাঞ্জাব	”	১৮০	”	৬
সিন্ধু	”	৬০	”	২
বেলুচিস্তান	”	২০	”	১
উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ	”	৪০	”	২

দেশের শাসনভার অর্পণ ও জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের জন্য আমার আহবান

প্রোসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান নব নির্বাচিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অযৌক্তিক ভাবে স্থগিত রাখছেন দেখে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদ্য নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগের সমর্থনে অধিকাংশ পূর্ব পাকিস্তানবাসী অসন্তোষ, বিক্ষোভ ও আন্দোলন করা, শুরু করেছেন। বুঝেই হোক আর না বুঝেই হোক ইয়াহিয়া খান ও তার মিলিটারী জান্তা রাজনৈতিক বিরাট ভুল পদক্ষেপ নিচ্ছেন দেখে আমি পূর্বপাকিস্তানীদের মধ্যে সর্ব প্রথম নব নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, আওয়ামী লীগের নিকট দেশের শাসনভার অর্পণ ও জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের আহবান জানাই। আমি ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ সন খবরের কাগজে এক বিবৃতি দেই। খবরের কাগজে ছাপানো ২টি কপি আজও আমার কাছে আছে। যা নিম্নরূপ ঃ

দৈনিক সংগ্রাম ১১/২/৭১

জাতীয় পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য মেজর আফছার উদ্দীনের আহবান:

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ইসলামী গণতন্ত্রী দলের সাধারণ সম্পাদক মেজর আফসার উদ্দীন যত শীঘ্রই সম্ভব শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহ্বানের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

গতকাল বুধবার সংবাদ পত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি শাসনতন্ত্র রচনার পূর্বেই বর্তমান নিদারুণ সংকট থেকে দেশকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত গণ প্রতিনিধিদের (আওয়ামী লীগের) প্রশাসণ-যন্ত্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহনের অনুরোধ জানানোর জন্যও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি ও আহবান জানান।

আর একটি সংবাদ পত্র কার্টিং

ইসারত, সোমবার ২রা ফাল্গুন ১৩৭৭ সন। নিম্ন লিখিতভাবে আমার বিবৃতিটি ছাপান।

অবিলম্বে জাতীয় পরিষদ আহবানের দাবী

ইসলামী গণতন্ত্রী দলের সাধারণ সম্পাদক (অবঃ) মেজর আফছার উদ্দীন গত ১০ই ফেব্রুয়ারী (১৯৭১ সন) এক বিবৃতিতে শাসনতন্ত্র প্রনয়নের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সাপেক্ষে দেশ শাসনের দায়িত্ব গ্রহনের জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অনুরোধ জানানোর জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহবান জানান।

তিনি বলেন, দেশের বিশেষ করে পুর্বপাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও আইন শৃংখলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটছে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান অযথা বিলম্বের দরুনই এই অবনতি ঘটছে। এই পরিস্থিতি আয়ত্ত্বের বাইরে যাওয়ার আগেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের অনুরোধ জানান। শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সাপেক্ষে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসন ক্ষমতা গ্রহনের অনুরোধ জ্ঞাপনের জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আবেদন জানিয়ে জনাব আফসার উদ্দীন বলেন একমাত্র জনগণের প্রতিনিধিরাই এ ধরনের বিরাট জাতীয়

দৈনিক সংগ্রাম ১১/২/৭১

জাতীয় পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য মেজর আফছার উদ্দীনের আহবান:

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ইসলামী গণতন্ত্রী দলের সাধারণ সম্পাদক মেজর আফসার উদ্দীন যত শীঘ্রই সম্ভব শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহ্বানের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

গতকাল বুধবার সংবাদ পত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি শাসনতন্ত্র রচনার পূর্বেই বর্তমান নিদারুণ সংকট থেকে দেশকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত গণ প্রতিনিধিদের (আওয়ামী লীগের) প্রশাসণ-যন্ত্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহনের অনুরোধ জানানোর জন্যও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি ও আহবান জানান।

আর একটি সংবাদ পত্র কার্টিং

ইসারত, সোমবার ২রা ফাল্গুন ১৩৭৭ সন। নিম্ন লিখিতভাবে আমার বিবৃতিটি ছাপান।

অবিলম্বে জাতীয় পরিষদ আহবানের দাবী

ইসলামী গণতন্ত্রী দলের সাধারণ সম্পাদক (অবঃ) মেজর আফছার উদ্দীন গত ১০ই ফেব্রুয়ারী (১৯৭১ সন) এক বিবৃতিতে শাসনতন্ত্র প্রনয়নের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সাপেক্ষে দেশ শাসনের দায়িত্ব গ্রহনের জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অনুরোধ জানানোর জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহবান জানান।

তিনি বলেন, দেশের বিশেষ করে পুর্বপাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও আইন শৃংখলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটছে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান অযথা বিলম্বের দরুনই এই অবনতি ঘটছে। এই পরিস্থিতি আয়ত্ত্বের বাইরে যাওয়ার আগেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের অনুরোধ জানান। শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সাপেক্ষে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসন ক্ষমতা গ্রহনের অনুরোধ জ্ঞাপনের জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আবেদন জানিয়ে জনাব আফসার উদ্দীন বলেন একমাত্র জনগণের প্রতিনিধিরাই এ ধরনের বিরাট জাতীয়

সমস্যা আয়ত্বে আনতে সক্ষম। এবং প্রয়োজনবোধে জনগণের ভাবাবেগকে উজ্জীবিত করে তাদের ত্যাগের পথে পরিচালিত করতে পারে। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অনেক আগেই রাজনৈতিক দলের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের নজীর ভারত এবং পাকিস্তানে রয়েছে।

জনাব আফসার উদ্দীন বিবৃতিতে এই আশা প্রকাশ করেন যে, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা—দেশকে একটি স্থায়ী শাসনতন্ত্র প্রদান করে নিজেদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিবেন।

আমার উপরিল্লিখিত বিবৃতির আবেদন যদি ইয়াহিয়া সরকার আমল দিত তা হলে হয়ত পাকিস্তানের ইতিহাস অন্যরূপ লেখা হত। বাংলাদেশের কয়েক হাজার লোক ১৯৭২ সনে পাক বাহিনীর হাতে প্রাণ হারাত না, জুলফিকার আলী ভুট্টোর ফাঁসি হতো না। কোটি খানেক পূর্বপাকিস্তানবাসী ভারতে সাহায্য প্রার্থী শরণার্থী হতো না ইত্যাদি।

সাবেক প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানের সাথে আমার শেষ দেখা

অবিভক্ত ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে আসার পূর্বে অবিভক্ত ভারত শেষ দেখার যে রকম আমার একটি আগ্রহ জেগেছিল সেরূপ ভাবে অবিভক্ত পাকিস্তান ও আমার এক কালের জি, ও, সি, পরে চীফ অব ষ্টাফ ও প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানকে শেষবারের মতো শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার জন্য আমি ১৯৬৯ সনের ডিসেম্বর মাসের ৯ই তারিখ যখন সারা পাকিস্তানে ইয়াহিয়া খানের আমলে প্রথম ও শেষ জাতীয় পরিষদের ইলেকশনের ডামাডোল তুঙ্গে তখন আমি পাশ্চিম পাকিস্তানে ভ্রমণের জন্য রাওয়ালপিন্ডি বিমান বন্দরে অবতরণ করি। এয়ারোপ্লেন থেকে অবতরণ করার পর পরই একজন পূর্বপাকিস্তানী মেজর যাকে আমি পাকিস্তান আর্মিতে মেজর অবস্থায় থাকাকালীন ক্যাডেট অবস্থায় দেখেছিলাম উনি আমাকে সামরিক সম্মান প্রদর্শনপূর্বক অভিযোগের সুরে বললো, "স্যার, আমাদের সিনিয়র বাংগালী অফিসারদের বর্তমান চীফ অব ষ্টাফ ও রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান রাওয়ালপিন্ডি আর্মি হেড কোয়ার্টারে একত্রে জমা করে অর্ডার দিয়েছেন পুর্বপাকিস্তানে যাতে আওয়ামী লীগ আসন্ন জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে পারে তার জন্য পরিকল্পনা করে দৈনন্দিন ইয়াহিয়া খানের এডমিনিস্ট্রেশনকে পরামর্শ দেয়ার জন্য। ইয়াহিয়া প্রশাসন একান্ত ভাবে চেষ্টা

করছে যাতে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ আসন্ন জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং নির্বাচনের পরে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও ইয়াহিয়া খান মিলে মিশে পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা হাতে নিতে পারে। এই পরিস্থিতিতে এহেন সামরিক শাসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের জয় সুনিশ্চিত জেনেও আপনি কেন মুসলিম লীগের নমিনেশন নিয়ে ইলেকশনে দাঁড়িয়ে নিজের সুনিশ্চিত পরাজয় ডেকে আনছেন?'' উত্তরে আমি বলেছিলাম যে তোমরা নবীন সামরিক অফিসার যা জানোনা বা দেখতে পাওনা এবং তোমাদের বদ্ধ মাতাল ও ক্ষমতালোভী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যা বুঝছেনা বা মদের নেশায় যা দেখতে পাচ্ছে না তা-আমি উজ্বল নক্ষত্রের মতো দেখতে পাচ্ছি। তাই আমি আমার নির্বাচনী বক্তব্য ও ক্রিয়া কর্মের মাধ্যমে রেকর্ড করিয়ে যাচ্ছি যে আসন্ন জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে একদিকে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা ও রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান, এবং ভারতীয় সরকারের গোপন আঁতাতের মাধ্যমে এই নির্বাচনে নিঃসন্দেহে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে এবং যেই মসুলিম লীগ পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিল তা এই তিন গোপন আঁতাতের মাধ্যমে গোহারা হারবে। তারপরে, তোমরা ও তোমাদের চীফ অব ষ্টাফ মাতাল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যেটা দেখনা বা বুঝনা সেটা হলো যে কোন ভাবেই হোক পাকিস্তান ভেঙ্গে দু'টুকরা হয়ে যাবে। আমার ধারণা এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়, ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরে পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে আমার পূর্ববর্তী আশংকা সত্য বলে প্রমাণিত হলো।

আয়ুব খান সহেব আমেরিকা হতে হার্ট অপারেশন করে কয়েক দিন পূর্বে ইসলামাবাদ (পাকিস্তানের রাজধানী) ফিরেছেন। অসুস্থতার কারণে খুব কমই সাক্ষাতকার দেন। কিন্তু আমি সাক্ষাত কার চাওয়ার সাথে সাথে ১১ই ডিসেম্বর সকাল দশটায় আমাকে সাক্ষাতকার দিলেন। শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসাবাদের পর এই বিরল সাক্ষাতকারে আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—কী কারণে তিনি পূর্বোল্লিখিত দীর্ঘ রাত্রি কালীন ভোজে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান কে একা ডেকেছিলেন? তার উত্তরের সারমর্ম নিম্নরূপ;

"পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানবাসীরা শেখ মুজিব ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে আন্দোলন করে প্রমাণ করলো দেশবাসী আমার পরিবর্তে অন্য কাউকে রাষ্ট্রপতি পেতে চায়। তাই আমিও শান্তিপূর্ণ ভাবে বিনা রক্তপাতে রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দিয়ে রক্তপাত ও মার্শাল ল' এড়াবার জন্য কোন রাজনীতিবিদের হস্তে এ ক্ষমতা অর্পণ করতে চেয়েছিলাম যিনি সকল রাজনীতিবিদদের মনোনীত নেতা

ইয়হিয়া খান-শেখ মুজিব আঁতাত

আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক ৬ দফা ও ইয়াহিয়া খানের লিগাল ফ্রেম ওয়ার্ক আদেশ ছিল পরস্পর পরিপন্থী। তবুও ক্ষমতার ভাগাভাগির স্বার্থে আওয়ামী লীগ লিগাল ফ্রেম ওয়ার্ক আদেশের বিরুদ্ধে কোন প্রকার সক্রিয় আন্দোলন করেনি। ক্ষমতা লাভের আশায় আওয়ামী লীগ ইয়াহিয়া খান বা তার লিগাল ফ্রেম ওয়ার্কের বিরুদ্ধে কোন প্রচারনা করেনি। ইয়াহিয়া খান সরকারও আওয়ামী লীগের ৬ দফার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেনি যদিও তা ছিল পরস্পর পরিপন্থী। এই দু'মুখো নীতি অবলম্বন করে কিছু দিনের জন্য দু'পক্ষেই নির্বাচন প্রচারনা চলতে লাগল। এবং শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়লাভ করলো।

১৯৭০ সনের নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়

১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে ও জলোচ্ছ্বাসে ভোলা–হাতিয়া সন্দীপ সহ সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকার বিশ পঁচিশ লক্ষ অধিবাসীর প্রাণহানি ঘটে। এবং বেসুমার গবাদি পশু, ঘর বাড়ি, আসবাবপত্র ও ফসলাদির ক্ষতি হয়। এই পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ ব্যতীত সকল রাজনৈতিক দলই নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার জন্য সভা ও শোভাযাত্রা করতে থাকে।

রাওয়ালপিন্ডি রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে বিরোধী দলের সকল নেতাগণ শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব ভার গ্রহন করার জন্য মনোনীত করাতে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাব মূর্তি পাকিস্তানের মধ্যে সর্বোচ্চ তুলে দিল। সাথে সাথে আওয়ামী লীগ দলের ভাব মূর্তিও সারা পাকিস্তান ব্যাপী প্রাধান্য পেল, তাই সারা পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবুর রহমান ও তার আওয়ামী লীগকে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় করে তুলল। তার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের দাবী দাওয়া দীর্ঘ দিন ধরে আওয়ামী লীগ যে ভাবে তুলে ধরেছে আমার মনে হয় অন্য কোন পার্টি ততটা তুলে ধরেনি। এই সব কারণ মিলে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা পূর্ব পাকিস্তানে তখন তুঙ্গে।

এর সাথে যোগ হল নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়। জিতবার জন্য ইয়াহিয়া খান পূর্বপরিকল্পিত মতে আওয়ামী লীগকে এবং এর নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে এই নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়কে আল্লাহ প্রদত্ত একটি সুযোগ হিশেবে ব্যবহার করলেন। এই ঘূর্ণিঝড় বিধবস্ত এলাকায় ত্রাণ বিতরণের জন্য ইয়াহিয়া খান প্রায় সকল ত্রাণ

হবেন এবং যিনি অতি সহজেই দেশে আইন ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে পারবেন। গোল টেবিল বৈঠকে আমন্ত্রিত সকল রাজনৈতিক নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে এ দায়িত্ব নেয়ার জন্য মনোনীত ও অনুরোধ করলেন কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান উপুর্যপুরি এই দায়িত্ব গ্রহন করতে অস্বীকার করে যাচ্ছিলেন। তাই আমি তাকে বাসায় ডেকে সরকারী ফাইল দেখিয়ে শেখ সাহেবকে সম্যক বুঝাতে চেষ্টা করেছিলাম যে এই উদ্ভুত অশান্ত পরিস্থিতিতে তিনি দেশ শাসনের ভার নিয়ে শান্ত পরিস্থিতি ফিরিয়ে না আনলে আমাকে দেশে শান্তি ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনার জন্য (তখন দেশে আন্দোলন তুঙ্গে, ভাংচুর ও হরতাল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার) আমি চীফ অব ষ্টাফ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট শাসন দন্ড অর্পণ করা ছাড়া আর কোন সঠিক বিকল্প উপায় দেখছি না। তখন ইয়াহিয়া খান দেশে মার্শাল ল' জারী করবে, গোলাগুলি চালিয়ে অফুরন্ত রক্তপাত করে দেশের শান্তি ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করবে। অগণিত জনগনের নেতা হয়ে শেখ মুজিবুর রহমান কী সেই পরিস্থিতি বাঞ্চনীয় মনে করেন?" উত্তরে শেখ সাহেব বলেছিলেন যে, ঢাকা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময়ে ছাত্র নেতাগণ বারে বারে তাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে যে, নির্বাচনের পূর্বে তিনি (শেখ মুজিবুর রহমান) যেন মন্ত্রিত্বের ক্ষমতা বা দেশ শাসনের দায়িত্ব অপরিহার্য ভাবে পরিত্যাগ করেন। তিনি এই দায়িত্ব নিয়ে ছাত্র নেতাদের নির্দেশ অমান্য করে ঢাকা ফিরতে পারবেন না। তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনি ছাত্রদের নেতা, না ছাত্র নেতারা আপনার নেতা? শেখ সাহেব এর কোন উত্তর দেন নাই। এই সব আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল–খানাটা, উপলক্ষ মাত্র। তাই আমাদের আলোচনা একান্ত ও দীর্ঘায়িত হয়েছিল। আমিও (আয়ূব খান) গোপন সূত্রে জানলাম যে শেখ মুজিবুর রহমান ইতি মধ্যে দুই বার গোপনে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে নির্বাচনের পরে ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট থাকবেন আর শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। এই গোপন আঁতাতের কারণেই শেখ মুজিবুর রহমান আমার নিকট থেকে শাসন ক্ষমতা নিতে অনীহা প্রকাশ করে ছিলেন।"

আমি তাকে আর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলাম যে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পরিস্থিতি কী? তিনি বলেছিলেন যে পশ্চিম পাকিস্তান খুব শক্তিশালী হবে এবং ইরান–ইরাক ও তুরস্ক প্রভৃতি মুসলিম দেশ গুলির নৈকট্য থাকাতে শক্তিশালী এক জোট হয়ে থাকবে। আর পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন হয়ে পড়বে এবং ভারতীয় হিন্দু সরকারের প্রভাবাধীন থাকবে। এই ভবিষ্যৎ বাণী কতদূর সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে তা সহৃদয় পাঠক বর্গের বিবেচনার উপরই ছেড়ে দিলাম।

আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক ৬ দফা ও ইয়াহিয়া খানের লিগাল ফ্রেম ওয়ার্ক আদেশ ছিল পরস্পর পরিপন্থী। তবুও ক্ষমতার ভাগাভাগির স্বার্থে আওয়ামী লীগ লিগাল ফ্রেম ওয়ার্ক আদেশের বিরুদ্ধে কোন প্রকার সক্রিয় আন্দোলন করেনি। ক্ষমতা লাভের আশায় আওয়ামী লীগ ইয়াহিয়া খান বা তার লিগাল ফ্রেম ওয়ার্কের বিরুদ্ধে কোন প্রচারনা করেনি। ইয়াহিয়া খান সরকারও আওয়ামী লীগের ৬ দফার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেনি যদিও তা ছিল পরস্পর পরিপন্থী। এই দু'মুখো নীতি অবলম্বন করে কিছু দিনের জন্য দু'পক্ষেই নির্বাচন প্রচারনা চলতে লাগল। এবং শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়লাভ করলো।

১৯৭০ সনের নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়

১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে ও জলোচ্ছ্বাসে ভোলা–হাতিয়া সন্দীপ সহ সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকার বিশ পঁচিশ লক্ষ অধিবাসীর প্রাণহানি ঘটে। এবং বেসুমার গবাদি পশু, ঘর বাড়ি, আসবাবপত্র ও ফসলাদির ক্ষতি হয়। এই পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ ব্যতীত সকল রাজনৈতিক দলই নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার জন্য সভা ও শোভাযাত্রা করতে থাকে।

রাওয়ালপিন্ডি রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে বিরোধী দলের সকল নেতাগণ শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব ভার গ্রহন করার জন্য মনোনীত করাতে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাব মূর্তি পাকিস্তানের মধ্যে সর্বোচ্চ তুলে দিল। সাথে সাথে আওয়ামী লীগ দলের ভাব মূর্তিও সারা পাকিস্তান ব্যাপী প্রাধান্য পেল, তাই সারা পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবুর রহমান ও তার আওয়ামী লীগকে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় করে তুলল। তার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের দাবী দাওয়া দীর্ঘ দিন ধরে আওয়ামী লীগ যে ভাবে তুলে ধরেছে আমার মনে হয় অন্য কোন পার্টি ততটা তুলে ধরেনি। এই সব কারণ মিলে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা পূর্ব পাকিস্তানে তখন তুঙ্গে।

এর সাথে যোগ হল নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়। জিতবার জন্য ইয়াহিয়া খান পূর্বপরিকল্পিত মতে আওয়ামী লীগকে এবং এর নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে এই নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়কে আল্লাহ প্রদত্ত একটি সুযোগ হিশেবে ব্যবহার করলেন। এই ঘূর্ণিঝড় বিধবস্ত এলাকায় ত্রাণ বিতরণের জন্য ইয়াহিয়া খান প্রায় সকল ত্রাণ

সামগ্রী আওয়ামী লীগের হাতে বিলি করাবার জন্য পূর্ব পাকিস্তান সরকারকে নির্দেশ দিলেন। এই সকল কারণে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা কল্পনাতীত বেড়ে গেল। আমিও এই ১৯৭০ এর ইলেকশনে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বাকেরগঞ্জ জেলার হিজলা-মুলাদী ও মেহেদীগঞ্জ থানার কনষ্টিটিউয়েন্সী থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলাম। আওয়ামী লীগকে ভোট দিলে পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে–এর কোন কারণ বা যুক্তি ভোটাররা আমল দেয়নি। যদিও আমার অকাট্য যুক্তি মতে এই নির্বাচনের পরবর্তীতে পাকিস্তান ভেঙ্গেই গিয়েছিল। বলা বাহুল্য সেই নির্বাচনে আমি আওয়ামী লীগ প্রার্থীর নিকট হেরে গিয়েছিলাম। তখন নির্বাচনে কারচুপি বা মিডিয়া ক্যু ইত্যাদি ছিল না। জনপ্রিয় দলের পক্ষে মানুষ নিজে দু'একটা জাল ভোট দিত। যদিও তাতে ফলাফল একই হত।

অবিভক্ত পাকিস্তানের ১৯৭০ সনের ঐতিহাসিক নির্বাচনের ফলাফল সকল দল মত এমন কি আওয়ামী লীগের ধারণার অতিরিক্ত ভালো হলো। জাতীয় পরিষদ আসনের আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের মোট ৩০০ আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন পেয়ে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল। এ সবই পূর্ব পাকিস্তানে অর্জিত আসন। পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ একটি আসনও পেলনা। তেমনি জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপল্স পার্টি পশ্চিম পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে ৮৮ আসন দখল করে পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহত্তম দল বা পাকিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম দলে পরিণত হল। কিন্তু এই পার্টিও পূর্ব পাকিস্তানে একটি আসনও পেল না। নির্বাচনের ফলাফল দেখে সকলের নিকট প্রতীয়মান হল যে, আসনের সংখ্যার দিক দিয়ে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেলেও এর জনপ্রিয়তা শুধু পূর্বপাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ। আর পিপলস পার্টি পাকিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম পার্টি হলেও এর জনপ্রিয়তা পশ্চিম পাকিস্তানের সীমা ছাড়িয়ে পূর্বপাকিস্তান স্পর্শ করতে পারেনি।

আওয়ামী লীগের নির্বাচন বিজয় উৎসব

১৯৭১ সনের ৩রা জানুয়ারি ঢাকা রেস কোর্সে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের এই নির্বাচন বিজয় উৎসব পালন করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য বৃন্দের ৬ দফা বাস্তাবায়নের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন– সেই শপথ নামাটি ছিল নিম্নরূপ।

করুণাময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তালার নামে, বীর শহীদান ও যোদ্ধাদের নামে যারা জীবন বিসর্জন করে ও অশেষ দুঃখ-যাতনা স্বীকার করে আমাদের প্রাথমিক বিজয় নিশ্চিত করেছেন, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মেহনতী জনতা ও এই দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের নামে আমরা নব নির্বাচিত জাতীয় ও প্রদেশিক পরিষদ সদস্যরা এতদ্বারা শপথ গ্রহণ করছি যে, জাতীয় সাধারণ নির্বাচনে এই দেশের জনগণ আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব ও কর্মসূচীর প্রতি যে ব্যাপক সমর্থন ও অবিরল আস্থা জ্ঞাপন করেছিল তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমাদের সকল শক্তি নিয়োজিত করবো।

আমরা সর্বতোভাবে ৬ দফা (আঃলীগ) ও ১১ দফা (ছাত্র) কর্মসূচীর প্রতি জনগণের ম্যান্ডেটের প্রতি বিশ্বস্ত থাকব এবং উভয় কর্মসূচীকে শাসনতন্ত্রে প্রতিফলিত করতে এবং ৬ দফা ও ১১ দফা কর্মসূচী ভিত্তিক স্বায়ত্ব শাসনের নীতিমালাকে দৈনন্দিন কর্মে প্রতিফলিত করতে আমাদের সর্ব ক্ষমতা নিয়োগ করব।

আমরা আওয়ামী লীগের কর্মসূচীর প্রতি শান্তিপূর্ণ ভাবে অনুগত থাকব। এবং বর্তমানে অঞ্চলে অঞ্চলে ও মানুষ মানুষে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বৈষম্য বিরাজ করছে তা দূর করব। এবং এমন একটি শোষণমুক্ত সমাজের ভিত্তি স্থাপনের সংগ্রাম করব যেখানে অন্যায়ের পরিবর্তে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে।

আমাদের কর্মসূচী যার প্রতি জনগণের সমর্থন রয়েছে তাকে বানচাল করবার জন্য যদি কোন মহল ও দুষ্ট শক্তি তৎপর হয় তা হলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তুলব, এবং সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আপোষহীন সংগ্রামের জন্য আমরা সদ্য প্রস্তুত থাকব। আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টায় সহায় হোন– জয় বাংলা– জয় পাকিস্তান।

উল্লেখ্য এই শপথ নামায় দেখা যায় আওয়ামী লীগ আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করেছিলেন– স্বায়ত্ব শাসন তাদের লক্ষ্য ছিল। বাংলা ও পাকিস্তানের জয় তাদের কামনা ছিল। নির্বাচিত সদস্যরা স্বাধীন বাংলা কায়েম করবার বা ধর্ম নিরপেক্ষতার কোন শপথ নেয়নি। অথচ স্বাধীনতার পর আল্লাহকে বিসর্জন দিয়ে এই নির্বাচিত সদস্যগণই ভারতের অনুকরণে ধর্ম নিরপেক্ষতা আমাদের প্রথম গঠনতন্ত্রে (১৯৭২ সনে) জুড়ে দিল। তাদের নির্বাচন প্রচার পত্রেরও বিরুদ্ধে গিয়ে আল্লাহ ও তাঁর ধর্মকে গঠনতন্ত্রে গায়েব করে দিল। জনগণ কখন ও তাদের এই ক্ষমতা দেয়নি।

ইয়াহিয়ার সাথে শেখ মুজিবের আঁতাত শেষ ও ভুট্টোর সাথে শুরু

জেনারেল ইয়াহিয়া খানের পিছনে যে ক্ষমতাধর মিলিটারী জান্তা প্রকৃত পক্ষে রাষ্ট্রপ্রতি ইয়াহিয়ার শাসন ক্ষমতা চালাত তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিল ক্ষমতা লোভী মদ্যপায়ী–কুখ্যাত জেনারেল হামিদ গুল হাসান, পীরজাদা, ওমর প্রভৃতি প্রধান। যাদের পরামর্শে ইয়াহিয়া খান চলত। কিন্তু জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পাকিস্তান জাতীয় সংসদে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়াতে–ইয়াহিয়া ও তার মিলিটারী জান্তার সন্দেহ হোল যে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পুর্ব পাকিস্তনাবাসীরা সারা পাকিস্তানের সংসদ ও শাসন ক্ষমতা দখল করবে। পাঞ্জাবী বা পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্য লোপ পাবে। এই চিন্তাধারার বশীভূত হয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খান তার ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্টের পদ নিশ্চিত করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে পরামর্শের অজুহাতে সংসদ অধিবেশন স্থগিত রেখে কালক্ষেপন করতে লাগলেন। এখন ইয়াহিয়ার সামনে তিনটি দল যার সাথে বুঝা পরা করে তিনি ভবিষ্যতের পদক্ষেপ নিবেন। সবচেয়ে বড়ো দল পুর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ যারা পাকিস্তান পরিষদে সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়েছে। আর হলো পশ্চিম পাকিস্তানের পিপল্‌স পার্টি যারা জাতীয় পরিষদে দ্বিতীয় বৃহত্তর পাটি, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যগরিষ্ঠ পার্টি। আর একটি হলো ইয়াহিয়া খানের চরম সমর্থক বেতনভূক, ক্ষমতাধর সরকারী কর্মচারী ও সামরিক বাহিনী। ক্ষমতালোভী সামরিক জান্তা ও সরকারী কর্মচারির প্রতিনিধি জেনারেল ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তানী হুকুম কায়েম রাখবার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের সর্ব বৃহৎ পিপল্‌স পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথেই নতুন আঁতাত করা বাঞ্ছনীয় মনে করলেন। বোধ হয় সেই কারণেই ২৮শে ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত ভুট্টোর জনসভার দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই ১লা র্মাচ (১৯৭০) অপরাহ্ন ১টায় ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতবী ঘোষণা করেন। ভূট্টো সাহেব ইতিমধ্যে ঢাকা জাতীয় পরিষদে না আসার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী জাতীয় পরিষদের সদস্যদের বহু ভয় ভীতি এমন কি জিন্দা কবর দেওয়ারও ভয় দেখিয়েছিলেন। এতে পাকিস্তানের কবর রচনা হল।

রাজধানী ঢাকা ও মফস্বল শহরে প্রতিবাদের তুফান শুরু

ইয়াহিয়া খান জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে আঁতাত করে জাতীয় পরিষদ মূলতবী ঘোষণা করাতে পূর্ব পাকিস্তানবাসী বিক্ষুব্ধ হয়ে স্বতর্স্ফূতভাবে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। ইউনিভার্সিটিসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাই কোর্টের বার এসোসিয়েশন বিক্ষোভে যোগ দেয়। ঢাকা ষ্টেডিয়ামে ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়। সিনেমা হল বন্ধ হয়ে যায়। রাজপথে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের ঢল নামে। সকলের মুখে এক কথা। 'পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছাড়, বাংলাদেশ স্বাধীন কর।'

১লা মার্চ ১৯৭০ সনে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান এক আদেশ বলে প্রদেশ গুলিতে নিয়োজিত সামরিক শাসন কর্তাকেই গভর্নর পদে নিয়োগ করে সকল শাসন ক্ষমতা সামরিক বাহিনীর কুক্ষিগত করেন। তাই পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ভাইস এডমিরাল এস. এম আহসান পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শাসন কর্তা লেঃ জেনারেল সাহেবজাদা এম. ইয়াকুব খানের নিকট দায়িত্ব ভার বুঝিয়ে দিয়ে সরে পড়েন।

২রা মার্চ প্রতিবাদ মিছিল পালন কালে পুলিশের গুলিতে ২ ব্যক্তি শাহাদাত বরণ করেন এবং আরো অনেকে আহত হন। এ পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমান বহু ধৈর্য ধারণ করেছেন এবং পকিস্তান রক্ষার চেষ্টা করে আসছেন। কিন্তু পরিস্থিতি যখন তার ধৈর্য্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল–তখন ২রা মার্চ ১৯৭০ সন তিনি নিম্ন লিখিত কর্মপন্থা গ্রহণ করবার জন্য ঘোষণা দিতে বাধ্য হন।

১। ৩রা মার্চ থেকে ৬ই মার্চ পর্যন্ত ভোর ছয়টা থেকে বিকাল ২টা পর্যন্ত সারা পূর্ব পাকিস্তান ব্যাপী ধর্মঘট

২। ৩রা মার্চ জাতীয় শোক দিবস পালন।

৩। ৩রা মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্র জনতার জনসভা ও শেখ সাহেবের নেতৃত্বে মিছিল। শেখ সাহেব আরো ঘোষণা দেন যে, রেডিও টেলিভিশন ও সংবাদ পত্রে তাদের খবর ও বক্তব্য সঠিকভাবে প্রকাশ না করলে সকল পূর্বপাকিস্তানী কর্মচারিরা অসহযোগিতা করবে। ইতিমধ্যে সামরিক সরকার পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য পৌরসভা এলাকায় রাত্রি ৮টা থেকে ভোর ৭টা পর্যন্ত সান্ধ্য আইন জারী করেছিল। কিন্তু সর্বত্র সান্ধ্য আইন অমান্য করে সভা–শোভাযাত্রা, ব্যরিকেড তৈরী পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকে। বিদ্রোহী জনতা স্বাধীনতা পাওয়ার লক্ষ্যে অকাতরে প্রাণ দিতে থাকে। অধিকাংশ জনগণ সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করছে দেখে ৪ঠা মার্চ থেকে সরকার সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার করে।

দ্বিতীয় বার গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব

১। ৩রা মার্চ ১৯৭০ সনে অনুষ্ঠিত পল্টন ময়দানের বিশাল জনসমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমান অহিংস আন্দোলনের ডাক দেন। এবং জনগণের নির্বাচিত সদস্যগণের সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত খাজনা ও ট্যাক্স বন্ধ-ঘোষণা করেন।

২। সরকারের নিকট অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করার আহবান জানান।

৩। সশস্ত্র বাহিনীকে ব্যারাকে প্রত্যাবর্তন ও

৪। জনপ্রতিনিধিগণের নিকট ক্ষমতা অর্পণ করার দাবী করেন।

ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকারের এত উস্কানীমূলক কার্যকলাপ, গোলাগুলি, সান্ধ্য আইন জারী সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ ও নেতা শেখ মুজিবুর রহমান যথেষ্ট ধৈর্য ধরে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের ও প্যাকিস্তান–অটুট রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন।

সংকট উত্তরণ প্রচেষ্টায় ইয়াহিয়া খান আরো একটি ফন্দি করলেন

তিনি ১২ জনের পার্লামেন্টারী পার্টির নেতৃবর্গকে ঢাকায় আর এক গোলটেবিল বৈঠকের আহবান জানান। যার মধ্যে আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবুর রহমান ও জনাব নূরুল আমীন ছিলেন। কিন্তু তারা উভয়ই এই গোল টেবিল বৈঠক প্রত্যাখ্যান করে জাতীয় পরিষদের বৈঠকের জন্য ইয়াহিয়া খানকে অনুরোধ করেন। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানের পিপল্‌স পার্টির নেতা জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহবানের পূর্বে গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাবকে সমর্থন জানান। মনে হয় কালক্ষেপনের জন্য এও একটি ইয়াহিয়া ভুট্টোর আঁতাতের কৌশল মাত্র।

লেঃ জেনারেল টিক্কাখান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিযুক্ত

এই নব নিযুক্ত লেঃ জেনারেল টিক্কা খান মানুষ এবং আর্মি অফিসার হিশেবে কেমন ছিলেন সেই সম্বন্ধে কিছু বলা আমি দরকার মনে করি। প্রথমতঃ তার নাম এমন অদ্ভুত যা নিজেই প্রকাশ করে দিবে যে সে খুব অশিক্ষিত ও নিম্নস্তরের

পাঞ্জাবী মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহন করেছে। নতুবা–তার পিতা মাতা আর কোন ভাল নাম না রেখে এ অদ্ভুত শব্দ টিক্কা খান কেমন করে রাখলেন। টিক্কার এক অর্থ আগুনের টুকরা বা আগুন জ্বালাবার জন্য বিশেষ এক টুকরা জ্বালানী। আর এক অর্থ সুস্বাদু এক প্রকার কাবাবের টুকরা। এই দুই অর্থেই পাঞ্জাবের শীতের দেশে গরীব পরিবারে টিক্কা নামটি বিশেষ আদরের।

পাকিস্তান আর্মিতে একটা গল্প সবিশেষ প্রচলিত। তা হলো একদিন ডাক্তার ব্রিগেডিয়ার (ইন্ডিয়ান মিলিটারী সার্ভিস) জিলানী সাহেব রাওয়ালপিন্ডি থেকে কোথাও যাচ্ছিলেন। বলে রাখা ভালো যে ব্রিগেডিয়ার জিলানী সাহেব খুব উচ্চ বংশের পাঞ্জাবী। নিজেও খুব শিক্ষিত ডাক্তার। বিলেতে পড়া লেখা কালীন বিলেতি বউ বিয়ে করেছিলেন। তিনি যখন রাওয়ালপিন্ডি প্লাট ফরমে এসে দেখলেন যে তার ফার্ষ্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে আর একজন মিলিটারী অফিসার যাচ্ছেন, যার নাম মেজর জেনারেল টিক্কা খান তখন তিনি গোস্বা করে বলে উঠলেন "what! am i to travel with Tikka Khan Bhutta Khan and Anda Khan" "কী! আমি কি ভ্রমণ করব–টিক্কা খান, ভুট্টা খান ও আন্ডা খানের সাথে"? তিনি তার প্রাইভেট সেক্রেটারিকে বললেন যে ষ্টেশন মাষ্টার অথবা গার্ডকে ডাকো এবং টিক্কা খানের সিট না হয় আমার সিট অন্য কম্পার্টমেন্টে দিতে বল।" সে মতে তার প্রাইভেট সেক্রেটারী ষ্টেশন মাষ্টার ও গার্ড দু'জনকেই তার সামনে ডেকে আনলেন। তারা উভয়ই জানালেন যে অন্য কম্পার্টমেন্টে যাত্রীরা সব এসে গেছে। তারা যার যার সিটে বসে গেছে। এখন তাদের পক্ষে সিট বদলী করা অসম্ভব। তখন ডাক্তার ব্রিগেডিয়ার জিলানী সাহেব তার প্রোগ্রাম এবং ভ্রমণ বাতিল করে বাড়ি চলে গেলেন, তবুও টিক্কা খানের মতো লোকের সাথে এক কম্পার্টমেন্টে গেলেন না।

টিক্কা খান ওয়াই ক্যাডেট, অর্থাৎ সিপাহী ট্রেনিংএ ভর্তি হয়েছিলেন যেখান থেকে তিনি ধীরে ধীরে কর্ম দক্ষতা ও নিষ্ঠুরতার কারণে প্রমোশন পেয়ে লেঃ জেনারেল হয়েছেন। দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য ক্রমে আমি ও টিক্কা খান উভয়ই মেজর র‍্যাংকে কোয়েটা ষ্টাফ কলেজের মেসে এক সাথে এক বছর কাটিয়েছিলাম। তবে লোকটা কোন দিন মদ খেত না ও পারত পক্ষে নামাজ ও রোজা ছাড়ত না। বেলুচিস্তানের লোকের উপর সামান্য অছিলায় গুলি করে বিদ্রোহ দমন করার জন্য বা নিষ্ঠুরতার জন্য সামরিক বাহিনীতে বিশেষ করে পাঞ্জাবী মহলে তার সুনাম ছিল। বোধ হয় এই নিষ্ঠুরতার কারণেই পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহ দমন করার জন্য তার মত একটি নির্দয় লোককে পূর্ব পাকিস্তানের মিলিটারী গভর্নর করে পাঠানো হয়েছিল।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও
জুলফিকার আলী ভুট্টোর ঢাকা বৈঠক

পূর্ব পাকিস্তানী নেতাদের সাথে বুঝাপরা করে রাজনৈতিকভাবে সংকট নিরসনকল্পে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৫ই মার্চ ১৯৭১ সন ঢাকা আগমন করেন। ১৬ই মার্চ শেখ মুজিবুরের সাথে দীর্ঘ আড়াই ঘন্টা এবং পরবর্তীতে ১৭ই মার্চ থেকে ২১ শে মার্চ শেখ মুজিবর রহমানের সাথে রাজনৈতিক সংকট নিরসনের জন্যই হোক বা পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত সামরিক বাহিনীকে পূর্ব পাকিস্তানে আঘাত হানার জন্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার জন্যই হোক শেখ মুজিবুরের সাথে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের আলাপ দীর্ঘায়িত হতে লাগল। ক্যান্টনমেন্ট ও বি, ডি, আর এ পরিখা খনন করে সুরক্ষিত হতে লাগল। আর ও দিকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবুরের সাথে আলোচনা অব্যাহত রাখল। এই আলোচনায় কোন আলো দেখা গেল না রইল শুধু চনা (মূত্র)।

১৯৭১ সনের ২৫ শে মার্চ পাক বাহিনীর দানবীয় হামলা

এইভাবে ইয়াহিয়া খান ভুট্টোকে সাথে নিয়ে শেখ মুজিবর রহমানের সাথে আলোচনার অজুহাতে কালক্ষেপন করতে লাগল। ২৫ শে মার্চ ১৯৭১ সন পাক বাহিনী আঘাত হানার জন্য সম্পূর্ণ তৈয়ার হয়ে গেল।

আমার বাড়ির অতি নিকটে, চোখের সামনে ই, পি, আর (বর্তমান বি, ডি, আর) এর প্রধান ফটকসহ চার পাশে পরিখা খনন করে আত্মরক্ষার জন্য সড়কের দিকে মুখ করে চতুর্দিকে মেশিন গান ইত্যাদি বসানো হয়। এইভাবে ২৪ তারিখ ঘুরে ঘুরে দেখলাম ঢাকা ক্যান্টনমেন্টেও জনগণের গণ হামলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য এর চতুর্দিকে প্রয়োজনীয় জায়গাতে পরীখা খনন ও মেশিন গান ইত্যাদি বসানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ সব দেখে আমার আর বুঝতে বাকি রইল না যে আসলে পাক বাহিনী আঘাত হানার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিচ্ছে। শেখ সাহেবের সাথে ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর আলোচনা শুধু ছলনা ও কাল হরণ মাত্র। পাক বাহিনির এই আঘাতের ভয়াবহতা কতখানি হতে পারে তা অনুভব করে আমি আমার পড়শী প্রাক্তন সামরিক বাহিনীর এন-সি ও ও বর্তমান অবসর প্রাপ্ত সাব ইন্সপেক্টর অবঃ পুলিশ মিঃ সামছুল হক ও মিঃ মুজাফফর

আহমেদ এম-পি কে আমার বাসায় খবর দিয়ে আনালাম। তারা উভয়ই বৃহত্তর কুমিল্লার অধিবাসি ও আওয়ামী লীগের নেতা খন্দকার মুশতাক আহমেদ এম-পি, (পরে মন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি)র বিশেষ বন্ধু। তাদের এই অবশ্যম্ভাবী পাক বাহিনীর হামলা ও তার পরিণতি কী হতে পারে তা বিশদ বুঝিয়ে বললাম। তাদের দু'জনকেই অনুরোধ করলাম তাড়াতাড়ি গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান ও খন্দকার মুশতাক প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতাদের আলোচনার নামে অযথা কালক্ষেপণ না করে দেশ ও জাতিকে বাঁচানোর জন্য সময়োচিত কী করতে হবে তার নির্দেশ দিতে। উপরোক্ত দুই পড়শী আমাকে পরে জানালেন যে, আমার পরামর্শ মতো তারা আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাদের আমার মনের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন।

২৫শে মার্চের সূর্যাস্তের পরে ক্যান্টনমেন্টে রাতের অন্ধকারে ট্যাংক, কামান সহ পদাতিক সামরিক বাহিনীর লোকজন শহরে এসে হামলা করার জন্য পুরোপুরি তৈরী হচ্ছে। এই খবর আমি পাওয়া মাত্র বাঙ্গালী জাতির আসন্ন ভবিষ্যতের বিপদের আশংকায় বিশেষ ভাবে বিচলিত হলাম। বিশেষ বার্তা বাহকের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে- তক্ষুনি এই খবর পৌছে দিয়েছিলাম। এর পরে যা হবার তাই হলো। ২৫ শে মার্চ মধ্য রাত্রিতে পূর্ব পরিকল্পনা মতো লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেমের বাড়ি, আওয়ামী লীগের কয়েকজন মন্ত্রির বাড়ি, শেখ মনির বাড়ি ইত্যাদিসহ পাক বাহিনী নির্দয় ভাবে হামলা করে। লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেমকে বাড়ি হতে ধরে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। ইনি ছিলেন আগড় তলা ষড়যন্ত্র মামলার আসল প্রধান নেতা ও আসামী। শেখ সাহেবকে বন্দী করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়। তার পরিবারের সকল সদস্যকে সাময়িকভাবে বন্দী করে রাখে। ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ডঃ জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, ও ফজলুর রহমান খান, ডঃ মোহাম্মদ সাদত আলী এবং আরো কয়েক জন প্রফেসরকে হত্যা করে। ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন হলগুলি আক্রমন করে বহ ছাত্র ছাত্রীকে নির্মম ভাবে হত্যা করে। বহু ঘর বাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। জনসাধারণকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করার জন্য বহু কামান ও ট্যাংকের গোলা আকাশে নিক্ষিপ্ত করে। এভাবে যুদ্ধকালীন অবস্থা সৃষ্টি করে আন্দোলন স্তব্ধ করার চেষ্টা করা হয়।

শেখ মুজিবুর রহমানকে তার বাড়ি হতে বন্দী করে নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে রাখা হয়। কিন্তু হাতে পেয়েও তাকে হত্যা করা হয়নি। ২রা এপ্রিল তাকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং মিয়ানওয়ালী কারাগারে তাকে বন্দী করে রাখা হয়। আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় এবং তাদের সমর্থক অন্যান্য দলের নেতৃস্থানীয় কিছু লোক সেই রাত্রে গা ঢাকা দিয়ে জান বাঁচান এবং তার পরে যে যার সুযোগ

মতো প্রতিবেশি ভারতে আশ্রয় নেয়। এইভাবে পাক বাহিনীর আক্রমন কাল ক্রমে সকল শহর ও গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে গড়ে এবং গ্রাম-গঞ্জ থেকেও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বহু যুবক যুবতী এবং পারিবারিক লোকজন বিষয় সম্পত্তির মায়া ছেড়ে জান বাঁচানোর জন্য প্রতিবেশি ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে আগড়তলা হেঁটে যায়। এই রিফিউজির সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে বেড়ে প্রায় কোটি খানেক হয়েছিল। বলা বাহুল্য পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা স্টেটের জনগণ অকৃপণভাবে এই সব শরণার্থীর আশ্রয় দান ও সেবা যত্ন করেছেন। তা চিরদিন বাংলাদেশী জনগণ কৃতজ্ঞতার সাথে মনে রাখবে। ভারত সরকার খাদ্য ও ঔষধের ব্যবস্থা করেছে–তা আমাদের কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে হবে। হঠাৎ এই বিপুল সংখ্যক শরণাথীর পশ্চিম বঙ্গে আগমন যার মধ্যে অসংখ্য মা-শিশু বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ছিল। পশ্চিমবঙ্গ এদের রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেও এর মধ্যে বহু শিশু বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে মৃত্যু বরণ করতেহয়েছে।

আমাদের উদ্দেশ্য স্বাধীনতা অর্জন ঃ ভারত সরকারের উদ্দেশ্য ঃ পাকিস্তান বিভাজন বা বিচ্ছিন্নকরণ

ভারতের জনগণ ও সরকার বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের যথাসাধ্য প্রাণ ঢালা সাহায্য ও সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন কিন্তু দিল্লী সরকার (ইন্দিরাগান্ধী সরকার) ও ভারতের বর্ণবাদী হিন্দুদের মনে ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে সিকিমের মত একটি তাবেদার রাষ্ট্র করা, পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র নয়। স্বাধীনতা উত্তর ভারত সরকারের কর্মকান্ড আমার এই উক্তির জাজ্বল্যমান প্রমাণ। সে কথা পরে আসবে।

ভারতীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারের সহায়তায় শরণার্থীদের ভরণ-পোষন ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন। ভারতীয় সেনা বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের জন্য শরণার্থীদের মধ্য হতে নওজোয়ানদের বেছে বেছে মিলিটারী ট্রেনিং দেয়। অবশ্য আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কর্নেল এম-এ, জি ওসমানীর নেতৃত্বে লেঃ কর্নেল আব্দুর রব, মেজর সফিউল্লাহ, মেজর জিয়াউর রহমান মেজর জলিল প্রমুখের সক্রিয় সহায়তায় মুক্তি যোদ্ধাগণ একটি দুধর্ষ সেনা বাহিনীতে পরিণত হয়। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য অকাতরে তারা প্রাণ দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম করে। পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তকে বিভিন্ন সেক্টরে বিভক্ত করে ভারতীয় নিয়মিত আর্মির তত্ত্বাবধানে পাক বাহিনীর সৈন্যদের সাথে রীতিমত যুদ্ধ করে এবং পূর্ব

পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করতে থাকে।

অপর দিকে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'য়ের নেতৃত্বে ভারতের দেরাদুনে মুজিব বাহিনী নামে সমান্তরালভাবে রক্ষী বাহিনী নামে একটি সংস্থার ট্রেনিং হতে থাকে। এই বাহিনীর নেতত্বে থাকে শেখ মুজিবের আপন ভাগ্নে শেখ মনি। ভারতের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে সিকিমের মত একটি তাবেদার রাষ্ট্র সৃষ্টি করে এই বিশ্বস্ত রক্ষী বাহিনী দেশ শাসন করবে এবং সামরিক বাহিনী ভেঙ্গে দিবে। প্রকৃত স্বাধীনতা প্রিয় এবং দীন ইসলামের অনুসারীদের নির্মূল করবে। রক্ষিবাহিনীর স্বাধীনতা উত্তর কার্যকলাপ আমার এই উক্তি বলিষ্ঠভাবে প্রমাণ করে।

বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণা

জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজউদ্দীন প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বেশ কয়েকবার আলাপ আলোচনার পর ১০ই এপ্রিল ১৯৭১ সন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। এই স্বাধীন রাষ্ট্রের অস্থায়ী গভর্নমেন্টের প্রেসিডেন্ট করা হয় জনাব শেখ মুজিবুর রহমানকে। তার অনুপস্থিতিতে ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব প্রেসিডেন্টের সকল দায়িত্ব পালন করবেন বলে স্থির হয়। জনাব তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১সন কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথপুর গ্রামকে মুজিবনগর নাম করা হয়। এবং এই মুজিব নগরে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করেন। তাই মেহেরপুর ও মুজিবনগর বাংগালী জাতির গণমনে খ্যাতি লাভ করে।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু

বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ ১১ই এপ্রিল ১৯৭১সন বেতার ভাষণে অস্থায়ী সরকারের পক্ষ থেকে পাকিস্তান আমলের কর্নেল আতাওল গনি ওসমানীকে জেনারেল পদে উন্নীত করে মুক্তি যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ও কর্নেল আব্দুর রবকে মেজর জেনারেল পদে চীফ অব ষ্টাফ নিযুক্ত করেন। প্রথম দফায় মেজর সফিউল্লাহ, মেজর জিয়াউর রহমান ও মেজর খালেদ

রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান

মোশাররফকে যথাক্রমে ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলা এবং শ্রীহট্ট ও কুমিল্লা জেলার সেক্টর কমান্ডার হিশেবে নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে অবশ্য সমগ্র বাংলাদেশকে মোট ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে চতুর্দিক থেকে বাংলাদেশকে পাক বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করার যুদ্ধ চলে। এই মুক্তিযুদ্ধ ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সন পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ পর্যন্ত চলতে থাকে।

মুক্তিযুদ্ধ চলা কালীন কয়েকটি বিশেষ ঘটনা

আর্ন্তজাতিক–পরিস্থিতি–আমেরিকান সরকার উপরে উপরে পাকিস্তান সরকারকে সমর্থন করেছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে মার্কিন সরকার কোন বক্তব্য বা ক্রিয়া কর্ম রাখেনি। ভারত সরকারকে ভয় দেখাবার জন্যই হোক বা পাকিস্তান সরকারকে সমর্থন দেখাবার জন্যই হোক শক্তিশালী ৭ম নৌবহরকে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগরে স্থানান্তরিত করা হল। কিন্তু এই ৭ম নৌবহর ভারতীয় জল সীমান্তের নিকটেও আসেনি। বা শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান সামরিক বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য কোন পদক্ষেপ রাখেনি। ও দিকে পাকিস্তানের চির কালের বন্ধু চীন সরকার পাকিস্তান সরকারকে মৌখিক ভাবে খুব সমর্থন করেছিল এমনকি শক্তিশালী চীনা সামরিক বাহিনী সীমান্তের কাছাকাছি এনে ভারতকে ভয় দেখিয়েছিল কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভারতের বিরূদ্ধে এবং পাকিস্তানের স্বপক্ষে কোন সক্রিয় সামরিক পদক্ষেপ রাখেনি।

আমার মনে হয় মার্কিন ও মহাচীন উভয়ই দেখেছিল যে অতীতে পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানবাসির প্রতি আর্থিক সামাজিক ও রাজনৈতিক কোন ন্যায় বিচার করেনি এবং বর্তমানেও পাক বাহিনী ন্যায় অন্যায় বিচার না করে পাইকারী হারে সমস্ত পূর্ব পাকিস্তান ব্যাপী অত্যাচার, জুলুম ধ্বংস ও নিধন যজ্ঞ শুরু করেছে তাতে পূর্ব পাকিস্তানবাসিরা প্রায় সকলেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার পক্ষমতাবলম্বী–। তাই ভিতরে ভিতরে হয়ত মার্কিন ও মহাচীন উভয়ই পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার পক্ষে ছিল। সে কারণেই হয়ত উভয় রাষ্ট্রে পাকিস্তানের পক্ষে কোন সামরিক সক্রিয় পদক্ষেপ নেয়নি। যদিও বাক যুদ্ধে তারা পাকিস্তান সরকারকে সমর্থন করেছিল।

ওদিকে ভারত সরকার ও তার বন্ধু রাষ্ট্র রাশিয়া প্রথম দিকে পাকিস্তান সরকার ও পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধি আওয়ামী লীগের সাথে পাকিস্তান

রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে একটি সমঝোতায় আসার জন্য খুবই চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পাকিস্তান সরকার আমেরিকা ও চীনের কূটনৈতিক ও সামরিক সাহায্যের আশ্বাসের উপর নির্ভর করে ভারত ও রাশিয়ার প্রস্তাব বার বার প্রত্যাখ্যান করল। তাতে ভারত সরকার ও মার্কিন সমকক্ষ পরাশক্তি রাশিয়া খুবই ক্ষুব্ধ হলো। রাশিয়া ভারত সরকারকে আশ্বাস দিয়ে থাকবে সে আমেরিকা এবং চীন পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধে নামলে রাশিয়াও ভারতের পক্ষে যুদ্ধে আসবে। এই আশ্বাস পাওয়ার পরেই মনে হয় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বের প্রধান প্রধান কয়েকটি রাষ্ট্রের সরকার ও জনসমর্থন আদায়ের জন্য বেরিয়ে পরেন। সমর্থন পাওয়ার পর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে সাহস পায় এর পূর্বে নয়।

পূর্বপাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হলে ভারতের স্বার্থ কী

পূর্ব পাকিস্তানকে যদি পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় তা হলে ভারতের বহু সামরিক ও আর্থিক স্বার্থোদ্ধার হয়।

প্রথমতঃ পূর্ব পাকিস্তানের উত্তর সীমান্ত ঠাকুরগাঁও তেতুলিয়া এলাকার শেষ সীমান্ত আর স্বাধীন রাষ্ট্র নেপালের পূর্ব ও দক্ষিণ কোণের মাঝখানে মাত্র ১২/১৪ মাইল চওড়া এলাকা স্বাধীন ভারতের অন্তর্গত। এই সংকীর্ন এলাকার ৮/১০ মাইল পাহাড় পবর্তে অবস্থিত। অবশিষ্ট এই এলাকা দিয়ে ভারতের কুচবিহার মেঘালয়, আসাম, নাগাল্যান্ড প্রভৃতি ভারতের পূর্ব সীমান্ত প্রদেশগুলির একমাত্র যাতায়াতের সড়ক ও রেলপথ অবস্থিত। আধুনিক যুদ্ধাবস্থায় ভারতের অভ্যন্তর থেকে এই উত্তর পূর্বে অবস্থিত আসাম অঞ্চলে একটি আধুনিক আর্মি তো পরের কথা একটি কোর বা ডিভিশনেরও যুদ্ধাবস্থায় দ্রুত গমন করা খুবই কষ্ট সাধ্য ব্যাপার। যদি কোন কারণে আকাশ থেকে বোমা মেরেই হোক বা ভূমি থেকে বিস্ফোরণ করেই হোক, যদি এই সংকীর্ণ পথের রেল এবং পুল উড়িয়ে দেয়া যায়, তা হলে ভারতের অভ্যন্তরের বিশাল অঞ্চল থেকে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার খুবই আশংকা আছে। তা ছাড়া এই সংকীর্ণ পথ দিয়ে আধুনিক সামরিক বাহিনী কৌশলগত আকারে যাতায়াত করতে গেলে তার পার্শ্ব নিরাপত্তার জন্য (ফ্ল্যাংকং প্রোটেকশন) পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক রংপুর, দিনাজপুর জেলা দুটি একান্ত প্রয়োজন। আমার এই উক্তি বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হয়েছে ১৯৬২ সনের শেষের দিকে যখন চীন ভারতের উত্তর পূর্ব সীমান্ত নেফা এলাকা দিয়ে প্রায় ৪০ মাইল ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ভারত তাদের রুখতে

পারেনি। এই ঘটনা আসলে উক্ত সত্যতা প্রমাণিত করবে। কাজেই মহাচীনের বিরূদ্ধে যুদ্ধই হোক, বা আসাম অঞ্চল, নাগাল্যান্ড, মনিপুর, মিজোরাম প্রভৃতির বিদ্রোহ দমনের জন্যই হোক ভারতের বড় রকমের সামরিক অপারেশনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জয়পুর জেলার উত্তর সীমান্ত হতে গাইবান্ধা, জামালপুর জেলার বখশীগঞ্জ থানা এলাকা সোজা পথে মাত্র ৯০ মাইলের মত বাংলাদেশের ভূমি অতিক্রম করতে পারলে অতিদ্রুত এই সোজা রাস্তায় উত্তর ভারতের অংশ থেকে মেঘালয় প্রভৃতি অঞ্চলে পৌছানো যায়। এই সোজা পথটির দিকে ভারতের শ্যেন দৃষ্টি আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।

দ্বিতীয়তঃ ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল ত্রিপুরা রাজ্য পর্যন্ত সামরিক ও বেসামরিক চলাচল, বাণিজ্যের মালামাল আমদানী ও রপ্তানীর জন্য পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্বতী গঙ্গা, ব্রম্মপুত্র ও মেঘনা নদী ভারত বিশেষ প্রয়োজন মনে করে। কারণ পথ খুব সোজা, সহজগম্য এবং মাথা প্রতি ও টন প্রতি খরচ খুব কম হয়।

তৃতীয়তঃ পূর্ব পাকিস্তানের পাট সম্পদ পৃথিবী বিখ্যাত। যদি পূর্ব পাকিস্তান ভারতের দখলে থাকে তা হলে পাট ও পাট জাত দ্রব্য বিক্রী করে ভারত বিশাল অংকের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে।

এই তিন বিশেষ কারণে ভারত বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করতে ও তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিল, চাচ্ছে, এবং ভবিষ্যতেও চাইবে। আমার উক্তির সত্যতা প্রমাণ করে যে, স্বাধীনতার পরে পরেই ভারতীয় বে সামরিক নৌযান আমাদের এই তিন নদী ব্যবহার করে সোজা রাস্তায় অতি অল্প খরচে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ আসাম, মনিপুর, মিজোরাম, আগরতলা, নাগাল্যান্ড, মেঘালয় প্রভৃতি স্থানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। এবং বাংলাদেশের জুট বোর্ডকে ঢাকা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করেছিল। পরে অবশ্য স্বাধীনতা ও দেশ প্রিয় জনগণের চাপে জুট বোর্ড আবার ঢাকাতে স্থানান্তরিত করা হয়। এবং পূর্ব পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ জলপথ যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়।

যা হোক পাকিস্তানের অন্ধ স্বার্থপরতা ও একগুয়েমির কারণে এবং ভারতের উপরোক্ত স্বার্থোদ্ধারের জন্য পাক ভারত ও বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে কোন সমঝোতা হলো না। এর সাথে আর একটি মানবীয় ও আর্থ-সামরিক দিক এসে যোগ হল। বাংলাদেশ থেকে প্রায় কোটি খানেক লোক পাক বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ থেকে বাঁচবার জন্য ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের সাধারণ ভাবে খাওয়া পরার জন্য প্রচুর অর্থ খরচ হয়েছিল। যত বেশি দিন তারা ভারতে অবস্থান

করবে তত বেশি টাকা খরচ হবে। মানবতার সাহায্যকল্পে যে সব দেশ ও সাহায্যসংস্থা ও সরকার এই শরণার্থীদের খরচার জন্য বহু দান খয়রাত দিয়েছেন তারাও অনির্দিষ্ট কালের জন্য এই দান খয়রাত আর নাও দিতে পারে। তারপর বেশি দিন সময় অতিবাহিত হলে হয়ত পাকিস্তান সরকার ও পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের মধ্যে একটা আপোষ ও সমঝোতার সৃষ্টি হতে পারে। এই ত্রিবিধ কারণের জন্য ভারতের হাতে পাওয়া এই সুবর্ণ সুযোগ ফসকাতে না দিয়ে বাংলা ভাষাভাষী জনগণের মনোবল ও সমর্থন থাকাকালীন অবস্থায় দ্রুত এই পূর্ব পাকিস্তান ও পাক ভারত সমস্যা চিরদিনের জন্য মিটানোর লক্ষ্যে ভারত সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে গেল।

তাই ১৯৭১ সনের ৩ রা ডিসেম্বর পাক ভারত যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। জলে, স্থলে ও আকাশে দুর্ধর্ষ যুদ্ধের সূত্রপাত হলো। ঢাকা হতে শ্রীলংকা হয়ে আকাশ পথে পশ্চিম পাকিস্তানে এবং জলপথে চট্টগ্রাম বা চালনা হতে শ্রীলংকা হয়ে করাচী যাতায়াত সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। শুধু ইথারের মাধ্যমে বেতার যন্ত্রের সাহায্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যোগাযোগ রইল। আমি অতীতে এই কথা বহুবার পাকিস্তান সংসদের ভিতরে ও বাইরে বলেছিলাম। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার আমার কথা আমল দেয়নি। সেই কথা আজ বাস্তবে সত্য হলো।

প্রথম দিকে ভারতীয় হাওয়াই জাহাজ খুব নীচুতে নেমে ঢাকা বা পূর্ব পাকিস্তানে বম্বিং করত। তখন পাকিস্তান বিমান বিধ্বংসী কামান তাদের নাগালের মধ্যে পেয়ে কয়েকটি ভারতীয় বিমান ধবংস করেছিল। ভারতীয় বিমান বাহিনীর স্কোয়াড্রন লিডার ভুটানী সহ কিছু ভারতীয় বিমান বাহিনীর হাতে বন্দী হলো। এতে পাক-সামরিক বাহিনী কমান্ডার খুবই আনন্দিত হয়েছিল বলে মনে হয়। এই বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার পরের দিন আর ভারতীয় বিমান হামলা হয়নি। সম্ভবতঃ তারা নতুন আকাশ যুদ্ধ কৌশল নির্ণয়ের জন্য দিল্লীতে কনফারেন্স করেছিল।

আমার অনুমান বোধ হয় সঠিক ছিল। কারণ পরবর্তীতে দেখা গেল ভারতীয় বিমান আর নীচু হয়ে বম্বিং করেনি। খুব উঁচুতে পাক বাহিনীর বিমান বিধ্বংসী কামানের নাগালের উপর থেকে নির্বিঘ্নে বম্বিং করত। যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের কোন দীর্ঘ পাল্লার বিমান বিধ্বংসী কামান ছিলনা সেহেতু ভারতীয় বিমান বাহিনী পাকিস্তান বিমান বিধ্বংসী কামানের ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে নির্বিঘ্নে লক্ষ্য স্থলের উপর সঠিক বম্বিং করে যেত।

তখনকার গভর্ণর হাউস যা বর্তমান সরকারের প্রেসিডেন্টের বাড়ি এবং

অফিস যা বঙ্গভবন নামে অভিহিত তারও কিয়দংশ ভারতীয় বম্বিংয়ে ধ্বংস করা হয়েছিল। স্বাধীনতার পরে তা মেরামত করা হয়েছে।

ভারতীয় বাহিনীর আক্রমণে দেশের বাইরে ও ভিতরে মুক্তি বাহিনী ও জনগণের সমর্থনে, চতুর্দিক থেকে ভারতীয় বাহিনী ও অস্ত্রধারী মুক্তি যোদ্ধাগণ বেশ সাফল্যের সাথে দ্রুত গতিতে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। যদিও মাঝে মধ্যে কয়েকটি যুদ্ধ বেশ বড় আকারের উভয় পক্ষের সাহসিকতার সাথে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু নৈতিক বল, গোলা বারুদ, অস্ত্র-শস্ত্র ও সৈন্যবাহিনী আমদানী করার সুযোগ ভারত ও মুক্তি যোদ্ধাদের অনুকুল ছিল তাই সকল যুদ্ধ ক্ষেত্রে যৌথ ভাবে মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় বাহিনীর বিজয় সুনিশ্চিত হতে লাগল। সর্বশেষে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের সামরিক বাহিনী ও মুক্তি যোদ্ধাদের যৌথ ভাবে জয় হলো যদিও ভারত দেখাতে চায়, যেহেতু ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর নিকট পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে সেহেতু এই বিজয় ভারতের একক ব্যাপার। মুক্তি যোদ্ধাদের ভূমিকা ভারত গৌণ বলে প্রতীয়মান করতে চায়।

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সনে পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের সময় মুক্তি যোদ্ধা কমান্ডারের নিকট পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ না করে লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা কমান্ডিং ইন-চীফ ইন্ডিয়া এন্ড বাংলাদেশ ফোর্সেস— ইষ্টার্ণথিয়েটারের নিকট আত্মসমর্পণের সনদ সই করল। সনদটি নিম্নরূপ

Text of The Instrument of Surrender

The Pakistan Eastern Command agree to surrender all Pakistan armed forces in Bangladesh to Lieutenant General Jagzit Singh Aurora, General officer Commanding-in Chief of the Indian and Bangladesh forces in Eastern Theatre.

This surrender includes all Pakistan Air, Land and Naval Forces and also all Para Military forces and Civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the Command of lieutenant General Jagzit Singh Aurora.

The Pakistan Eastern Command shall come under the

orders of lieutenant General Jagzit Singh Aurora, as soon as this instrument is signed.

Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usage of the war. The decision of the Lieutenant General Jagzit Singh Aurora will be final, should any doubts arise as to the meaning or the interpretation of the surrender terms.

Lieutenant General Jagzit Singh Aurora gives a solemn assurance that the Perssonnel who surrender shall be treated with the dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with the provission of the Geneva Convention and Guarantees, the safety and wellbeing of all Pak Military and Para Military forces who surrender. Protection will be provided to foreign nationals, Ethnic minorities and personnel of West Pakistan origin by the forces under the Command of Lieutenant General Jagzit Singh Aurora.

Jagzit Singh Aurora	**Amir Abdullah Khan Niagi,**
Lieutenant General	Lieutenant genaral.
General officer Commanding	Marshall Law administrator
in-chief India and Bangladesh	Jone-B and Commander
Forces in the Eastern Theatre	Eastern Command (Pakistan)
16th Dec, 1971	16th Dec. 1971

বঙ্গানুবাদ,

পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড পূর্ব রণাঙ্গনে ভারত ও বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান জেনারেল অফিসার কমান্ডিং লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নিকট বাংলাদেশে অবস্থানরত সকল পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী আত্মসমর্পণ করতে সম্মত হয়েছে। পাকিস্তান স্থল, বিমান ও নৌবাহিনী এবং প্যারা মিলিটারী ও সামরিক সশস্ত্র বাহিনী এ আত্মসমর্পনের অন্তর্গত। এই সামরিক বাহিনী লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার পরিচালনাধীন নিকটবর্তী সামরিক বাহিনীর নিকট অস্ত্র-শস্ত্র জমা দিতে হবে। এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার সাথে সাথে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার পরিচালনাধীন হবে। এই আদেশের লংঘন আত্মসমর্পণের শর্ত লংঘন বলে বিবেচিত হবে। এবং প্রতিষ্ঠিত আইন ও যুদ্ধের ব্যবহৃত রীতি নীতি অনুযায়ী এর

বিচার হবে। আত্মসমর্পণের শর্তাবলীর অর্থ বা ব্যাখ্যার ব্যাপারে কোন সন্দেহ উত্থিত হলে লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এই মর্মে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, জেনেভা কনভেনশনের নিয়মানুযায়ী আত্মসমর্পণকারী সৈন্যদের সঙ্গে সম্মানের সাথে আচরণ করা হবে। এবং আত্মসমর্পণকারী সকল পাকিস্তান সামরিক প্যারা মিলিটারী বাহিনীর নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা হবে। জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার পরিচালনাধীন বাহিনী সকল বিদেশী নাগরিক, জন্মগত (এথনিক) সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যক্তি বর্গের রক্ষনাবেক্ষণ করবে।

স্বাক্ষর	স্বাক্ষর
জগজিৎ সিং অরোরা	**আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী**
লেঃ জেনারেল অফিসার কমন্ডিং	লেঃ জেনারেল মার্শাল-ল
-ইন-চীফ পূর্ব রণাঙ্গনের	এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর জোন-বি এবং কমান্ডার
ভারত ও বাংলাদেশ বাহিনী।	পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড (পাকিস্তান)
১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সন	১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সন

উক্ত আত্মসমর্পণের চুক্তি পত্রে দেখা যায় পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর কম্যান্ডিং ইন-চীফ লেঃ জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী তার সকল বাহিনী নিয়ে ভারতীয় সমকক্ষ দায়িত্ব সম্পন্ন অফিসার লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। এই আত্মসমর্পণ দলিলে কোথাও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বা তার প্রতিনিধি কারও নাম উল্লেখ নাই। পাক বাহিনী পাকিস্তান নাগরিক, বৈদেশিক নাগরিকের রক্ষনাবেক্ষণ বাংলাদেশের ভূখন্ডে ভারতীয় কমান্ডিং ইন চীফের উপর বর্তিত। এখানেও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বা কোন প্রতিনিধির নামও দেখা যায় না। এই আত্মসমর্পণ পত্রটি মুক্তিযুদ্ধের কোন গৌরব ও স্বীকৃতি বহন করে না।

সে যা হোক ১৬ ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সন থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। আমরা তখন থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক। এই ঐতিহাসিক দিবসটি আমাদের ও আমাদের উত্তরসুরীদের গর্ব ও আনন্দের দিবস বলে বিবেচিত হবে। এই দিবসটিতেই প্রকৃত বাংগালী জাতির, বাংগালী জাতীয়তাবাদের স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হল। বিশ্বমানব সমাজে বাংলা ভাষাভাষীদের একটি মাত্র স্বাধীন দেশ– বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হল। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

আজ ১৬ ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সন। বাংলদেশের স্বাধীনতা দিবস। এই দিবসটি প্রত্যেক বাঙ্গালীর জন্য মহাআনন্দের অতীব খুশির ও পবিত্র দিন।

শিশু যেমন জন্ম নিয়ে কাঁদতে থাকে, মা যে রকম সুতিকাগারে রক্তস্রাবে আপ্লুত হয়ে সন্তানের প্রসব বেদনায় গোঙ্গাতে থাকে কিন্তু সুতিকাগারের আশে-পাশে অপেক্ষমান আপনজন ও আত্মীয় স্বজন শিশুর জন্মের কান্না শুনে আনন্দোৎফুল্ল হয়ে উঠে, নব্য প্রসূত শিশু সন্তানের চাঁদ-মুখ দেখে মা যেমন তার প্রসব বেদনা ভুলে যান সেরূপ বাংলাদেশের প্রতিটি জনগণ আজ স্বাধীনতা সূর্যোদয়ের সাথে সাথে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার ও হানাদার পাক বাহিনীর শত অপরাধ নির্যাতন, নরহত্যা লুন্ঠন ও নারী নির্যাতন ভুলে গিয়ে এক মহানন্দে রাস্তায় নেমে পড়ে। সন্তান হারা পিতা, মাতা, স্বামীহারা বধু, মাতা, ভ্রাতৃহারা ভাই বোনেরা সকল দুঃখ ভুলে গিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশকে অভ্যর্থনা জানাতে, আনন্দ উৎসবে যোগ দেয় মুক্তি বাহিনীর সদস্যগণ মহাআনন্দে আকাশের দিকে গুলি ছৌড়ে, আনন্দ উৎসবে স্বতষ্ফূর্ত জনগণকে সাথে নিয়ে মিছিলে মিছিলে বাংলাদেশ স্বাধীনতার জয়ধ্বনি করতে থাকে।

নিয়মিত ভারতীয় সামরিক বাহিনী প্রধান প্রধান সড়কে পরিকল্পিত মতে তাদেরট্যাংক-সাজোয়া ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে আনন্দ উৎসবে যোগ দেন শান্তি ও শৃংখলা আনয়নের চেষ্টা করেন ও নিজেদের সামরিক শক্তি প্রদর্শনের মহড়া দেয়। ঢাকা মহানগরের মধ্যে অবস্থিত মুক্তি বাহিনী যাদের আমি কৌশল করে পাক বাহিনীর হাত থেকে, নির্ঘাত মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা করেছি, মহাসংকটের সময় খাদ্য যোগিয়েছি তারাও আজ আত্মপ্রকাশ করে মহাআনন্দ-উৎসব করছে। আমাকে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে মুক্তি যোদ্ধারা আমার সামনে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে শত সহস্র গুলি ছৌড়ে আমাকে তাদের সামরিক সালাম ও ভক্তি জানাল। জনগণ, মুক্তিযোদ্ধা ও সামরিক বাহিনীর এই আনন্দ-উৎসব সারাদিন ও রাত ভরে চলল। এমন কি কয়েক দিন পর্যন্ত এ আনন্দ-উৎসব চলেছিল।

আমার মনে পড়ে ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা লগ্নে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বহু হিন্দু-মুমলমান আত্মাহুতি দিয়েছিল, বহু ঘর বাড়ি, মসজিদ, মন্দির ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, কয়েক কোটি হিন্দু ও মুসলমান ভারত ও পাকিস্তানে সর্বহারা হয়ে শরণার্থী হয়েছিল। কিন্তু ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষনার পর

মুহূর্তে সে-কি প্রাণ ঢালা আনন্দ, হিন্দু-মুসলমানে গলাগলি। সব দুঃখ ভুলে স্বাধীনতার আনন্দে একে অন্যের সাথে কোলাকুলি করছে। স্বাধীনতার প্রসব বেদনা ও রক্তস্রাব অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে শুরু করে পাক ভারতের স্বাধীনতা পর্যন্ত যত লোক বৃটিশের হাতে শহীদ হয়েছে, ফাঁসিতে ঝুলেছে– হিন্দু মুসলিম দাঙ্গায় যত লোক হতাহত হয়েছে বাস্তুহারা হয়েছে সব দুঃখ ভুলে গেল আজ এই শুভক্ষণে–স্বাধীনতার লগ্নে। বাংলাদেশেও তার চেয়েও বেশি আনন্দ উৎসব হয়েছিল বলে আমার মনে হয়। এই দুই দেশে, দুই স্বাধীনতা দিবসে আমি প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করেছি, দর্শন করেছি, স্বাধীনতা মানুষের নিকট প্রাণের চেয়েও সকল কিছুর চেয়েও বেশি প্রিয়। এ শুধু কবির কল্পনা নয় সাহিত্যিকের রচনা নয়, উর্ধতন কর্মচারির হুকুম মানতে গিয়ে যুদ্ধের সৈনিকের প্রাণ বিসর্জন নয়, স্বাধীনতা সব কিছুর উপর স্থান পেয়েছে ও পাবে। যেহেতু আমাদের প্রবাসী সরকার এখনও বাংলাদেশে আগমন করেনি সেহেতু ভারতের জেনারেল অরোরার সামরিক সরকারই এখন সর্বময় কর্তৃত্ব করছেন।

আমার PEACE COMMITTEE-তে যোগদানের কার

স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা, যারা মুক্তি যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার জন্য ভারতে চলে গিয়েছিল আমি কৌশলে তাদের বাড়িঘর ও পিতা মাতা–আত্মীয় স্বজনদের পাক বাহিনীর জুলমু ও অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছিলাম। এই খবর মুক্তি যোদ্ধারা ভারতে অবস্থান কালে জানত। তাদের পিতা মাতা, আপনজন, তাদের কাছে এই কথা জানিয়েছিল। যদিও আমি পুর্ব পাকিস্তানের সর্বোচ্চ শান্তি সমিতির সদস্য তবুও আমার দ্বারা জনগণের কোন ক্ষতিতো হয়ইনি বরং অনেককে মৃত্যুর কবল থেকে, পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর হাত থেকে বাঁচিয়েছি। স্থানীয় লোকজনদের নরহত্যা, অগ্নি সংযোগ, লুন্ঠন, নারী নির্যাতন থেকে যত দূর সম্ভব রক্ষা করেছি, এ জন্য কলিকাতা থেকে স্বাধীন বাংলা রেডিও মারফতে–বা চিঠি দিয়ে আমাকে কোন চরম পত্র দেওয়া হয়নি। তদুপরি ময়লা বস্ত্র পরিধানরত, স্বাস্থ্যহীন, খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে আমার স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকাতে এসেই তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। এবং আমার বাড়ি পাহারা দিতে লাগল। যাতে অন্য এলাকার মুক্তি যোদ্ধারা ভুল বুঝে বা আমার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিরা এই সুযোগে আমার প্রতি আক্রমণ করতে না পারে সে জন্য আমার জানমাল রক্ষার জন্য তারা দলে দলে ২৪ ঘন্টা আমার বাড়ি পাহারা দিতে লাগল। এমন কি আমার অফিস ঘরে তারা

মুক্তিযুদ্ধের একটি অস্থায়ী অফিসও স্থাপন করল। আমি এই সুযোগে ঐ মুক্তিযোদ্ধা সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা জানাচ্ছি।

১৮ই ডিসেম্বর বিকেলে পাঁচজন ভারতীয় রাজপুত রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন, মেজর ও লেঃ কর্নেল র‍্যাংকের অফিসার যারা বর্তমান বি, ডি-আর ক্যান্টনমেন্টে (আমার বাড়ির অনতিদূরে) অবস্থান করছিল তারা কি করে জানতে পায় যে, গত বিশ্বযুদ্ধের সময় আমি ভারতীয় রেজিমেন্টে চাকুরি করেছিলাম এবং বর্তমানে অবসর প্রাপ্ত অবস্থায় আছি, তাই তারা আমার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতকারের জন্য আমার বাড়িতে এলেন। চা পান করার ফাঁকে ফাঁকে তারা আমার সাথে বিভিন্ন ধরনের আলাপ করছিলেন, এক পর্যায়ে তারা বললেন যে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মাধ্যমে তারা প্রতিপন্ন করেছেন যে মিঃ জিন্নার দ্বি-জাতি তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভুল ছিল। আমি তাদের বলেছিলাম যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মাধ্যমে প্রমাণ হল যে, ভারত উপমহাদেশে এখন ৩টি স্বাধীন জাতি কাজেই কংগ্রেসের এক জাতি তত্ত্ব একেবারেই ভুল ছিল। জিন্নার দুই জাতি তত্ত্ব–তিনের কাছাকাছি হওয়াতে মনে হয় কিছুটা সঠিক ছিল। আমি আরও তাদের বলেছিলাম যে এই যুদ্ধে আমাদের সম্পূর্ণ বিজয় হলো পাকিস্তান তো হারলই–কিন্তু ভারতও যে এই যুদ্ধে হেরেছে– অচিরেই তা বুঝতে পারবে। অতীত ইতিহাস ও ভূগোলের উদ্ধৃতি দিয়ে শিখ, রাজপুত ও আরও অনেকে হারানো রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করবে। আমার এই উত্তরে ঐ পাঁচজন ভারতীয় অফিসারের হাসি খুশি মুখগুলি মলিন হয়ে গেল। আজকে দেখি আমার ঐ ভবিষ্যত বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমানিত হয়েছে। আজ দশ বছর হলো শিখেরা স্বাধীনতার জন্য রক্ত ঢালছে। অগনিত তুষার শার্দুল কাশ্মিরীরা স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে, আসাম-মনিপুর নাগাল্যান্ড-মিজোরাম স্বাধীনতার জন্য অকুতোভয় সংগ্রাম করছে। ভবিষ্যতে আরও কত রাজ্য স্বাধীনতা সংগ্রাম ঘোষাণা করে এবং ইন্দিরা ও রাজিব গান্ধীর মত কতজন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের হাতে প্রাণ বিসর্জন করে তা একমাত্র অনাগত ভবিষ্যতই বলতে পারে।

কেন্দ্রীয় শান্তি সামিতির সদস্য হওয়ার প্রায়শ্চিত্ত

শুনেছি ধর্মের ঢাক আপনি বাজে। কিন্তু আমার ঢোল কে বাজাবে–? তাই আমি একটু বাজাচ্ছি– নতুবা এই কথা গুলি চিরদিন অজানাই থেকে যাবে। এবং

আমাকে চিরদিন ভুল বুঝবে। তাই নিম্ন লিখিত বর্ননা করে যাচ্ছি। সঠিক বিচারের ভার সুবিবেচক পাঠকের উপরই রইল।

আওয়ামী লীগের নব নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য গণ এবং স্বাধীনতা প্রিয় নেতৃস্থানীয় লোকজন ও যুব সম্প্রদায় প্রায় বেশির ভাগই প্রতিবেশী ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। মুক্তি সংগ্রামের জন্য সেখানে পারে প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি নিচ্ছে। দেশের মধ্যে দল ও মত নির্বিশেষে পাক বাহিনীর হাতে মানুষ মারা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পিস কমিটি বা শান্তি সমিতি গঠিত হলো। দেশে বিরাজমান পাকিস্তান সামরিক শক্তি যারা ইচ্ছামত শাসন-শোষণ ও জুলুম চালাচ্ছে আর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা ভারতে আশ্রয় নিয়ে নিজেদের বিপদ মুক্ত মনে করছেন কিন্তু যে অগনিত বিরাট সংখ্যক গরিষ্ঠ জনগণ পাক বাহিনীর শত অত্যাচার সহ্য করেও যে কোন মুহূর্তে পাক বাহিনীর হাতে মৃত্যু হতে পারে জেনেও মাতৃভূমি ছেড়ে কোথাও যায়নি বা যেতে পারেনি তাদের দুঃখ কষ্টের কথা বলার কেউই রইল না। সেই অবস্থাতে দেশের জনদরদী নেতৃস্থানীয় লোক মিলে দেশে একটি তৃতীয় ধারা বা শক্তি হিশেবে জনগণকে বাঁচাবার জন্য, শান্তিতে বসবাস করতে পারার জন্য উপরোক্ত শান্তি সমিতি গঠিত হলো।

যে কোন সরকারের সময় কতগুলি লোক নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সরকার পার্টিতে যোগ দেয় এবং তাদের অপকর্মের জন্য জনগণ ও সরকারী পার্টিকে দায়ী করে। দেখা গেছে অতীতে রাজনৈতিক বড় বড় মিছিলের সাথে কিছু সংখ্যক লুটেরা গুন্ডা যোগ দেয়। এবং ঠিক সময় মতো যান বাহন ও দোকান পাট ভাংচুর ও লুটপাট করে। সেই রূপ ভাবে এই পিচ কমিটি বা শান্তি সমিতিতেও যে কিছু লুটেরা পার্টি যোগ দিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করেনি তা আমি বলব না। এই কমিটির সকল সদস্যই যে ধোয়া তুলসী পাতা ছিল তাও বলা যায় না। কিন্তু পিস কমিটির অধিকাংশই নিঃস্বার্থভাবে দেশ ও জনগণের কল্যাণ সাধন করে গেছেন। খুব কম লোকেই দেশের ও দশের অমঙ্গল করে নিজেদের স্বার্থোদ্ধার করেছে। জনগণের এই মহাবিপদের সময় যারা জনগণের ক্ষতি করেছেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই দুনিয়াতে ও আখেরাতে তারা তাদের ন্যায্য সাজা পাবেনই পাবেন।

কেন্দ্রীয় পিস কমিটি গঠন হওয়ার সময় প্রথম দিকেই আমাকে সামিল হওয়ার জন্য ডাক পড়ল। কিন্তু আমি যোগ দেয়া উচিত কি অনুচিত তা চিন্তা ভাবনা ও ইতস্ততঃ করেছিলাম। এমন সময় স্থানীয় কয়েক জন রাজনীতিবিদ, প্রশাসক ও বুদ্ধিজীবী আমাকে কেন্দ্রীয় পিস কমিটিতে যোগ দিয়ে দেশবাসির উপর যে অত্যাচার অবিচার ও জুলুমের বান ডেকেছে– তা আমার এককালের

সহকর্মী ও বর্তমান গভর্ণর ও সামরিক শাসক লেঃ জেনারেল টিক্কা খানের নিকট জানাবার সুযোগ গ্রহন করতে অনুরোধ করলেন। তারা আমাকে পিস কমিটিতে যোগ দিয়ে এই মহা সংকটের সময় দেশবাসির খেদমত করলেও স্বাধীনতা উত্তর কালে আমার নিজস্ব বিপদ আপদ ও জেল ফাঁসির ঝুঁকি আছে তাও স্মরণ করে দিলেন। আমি তাদের নাম লিখে তাদের কোন বিপদে ফেলতে চাই না। কিন্তু পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ণ আমার সামনে তুলে ধরার জন্য আমি তাদের শ্রদ্ধা জানাই। অনির্বায মৃত্যুর সম্ভাবনা জেনেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলাম। প্রয়োজনে ভারতের স্বাধীনতা সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে আনয়নের জন্য জীবন-মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েছিলাম, তাই এ বারও দেশে নির্বাচিত জন প্রাতনিধিদের অবর্তমানে দেশবাসিকে এই সংকট মুহূর্তে শান্তি ও সঠিক পথে পরিচালানার জন্য আবারও মৃত্যুর ঝুঁকি নিলাম। আমি তাই কেন্দ্রীয় পিস কিমিটির সক্রিয় সদস্য হিশেবে অংশ গ্রহণ করলাম। আমার এক কালের সহকর্মী গভর্ণর লেঃ জেনারেল টিক্কা খান ও ১৪ শ ডিভিশন কমান্ডার লেঃ জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজিকে যথা সম্ভব চেষ্টা করেছি নিরীহ লোকজনের উপর পাইকারী অত্যাচার, জুলুম ও নরহত্যা রুখতে। এতে কিছু ফলও হয়েছিল বলে মনে হয়। তবে তাদের শত অনুরোধ সত্ত্বেও বে-আইনী ভাবে মার্শাল-ল' এর মাধ্যমে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সদস্যদের সিট খালি ঘোষণা করে আমাকে নির্বাচনে দাঁড় করতে পারেনি। এই অবৈধ ইলেকশনে দাঁড়ানোটাই আমি অন্যায় বলে মনে করেছি। দ্বিতীয়তঃ পাক বাহিনীর জুলুম ও অত্যাচার সমর্থন করে আমাকে দিয়ে পাক সরকার কোন বিবৃতি দেওয়াতে পারেনি। তাদের কোন অন্যায় কাজে আমার সহযোগিতা পায়নি। এ বিষয়ে কারো কোন সন্দেহ থাকলে তৎকালীন সরকারী রেকর্ড পত্র ও দৈনিক খবরের কাগজ দেখলে আমার উক্তির সত্যতা প্রমানিত হবে।

দেশের সদ্য নির্বাচিত আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিরা দেশকে কোন যুদ্ধকালীন আত্মরক্ষার পরিকল্পনা না দিয়েই হঠাৎ করে যে যে পথে পেরেছে ভারতে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছে, তাই আমরাও নিজের বুদ্ধিমতে যেমন করে হোক মানুষকে বাঁচাবার পরিকল্পনা করেছি। বলা বাহুল্য আমরা স্বদেশে জনগণের মধ্যে থেকে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েও জনগণের সেবা করেছি।

স্থানীয় আওয়ামী লীগ ছোট নেতা ও কর্মীদের পরামর্শ দিয়ে (বড় নেতারা তো ভারতে আশ্রয় নিয়েছে) তাদের সকলকে পিস কমিটির সদস্য করলাম। কারফিউ পাশ এনে দিলাম, দিন রাত কর্মীরা ডিউটি করে মা বোনদের পাক

বাহিনীর জুলুম থেকে ও দোকান পাট ঘর বাড়ি লুঠ থেকে বাঁচালাম। আওয়ামী লীগ কর্মীদের ও সমর্থকদের পাক বাহিনীর অহেতুক নির্যাতন থেকে রক্ষা করলাম। বর্তমান এম-পি হেমায়েতউল্লাহ আওরঙ্গ, শেখ মারুফ, (শেখ মনির ছোট ভাই) সহ বহু আওয়ামী লীগ কর্মীকে পাক বাহিনীর হাতে নির্ঘাত মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচিয়েছি। আমার হিজলা থানার ও, সি কে হত্যা করে মুক্তি বাহিনী থানা লুঠ করে অস্ত্রপাতি নিয়ে যায়– তবুও পাক বাহিনী আমার চেষ্টার ফলে হিজলা থানাতে গিয়ে জনগণকে কোনরূপ অত্যাচার, অবিচার বা অপারেশন করতে পারেনি। লুটপাটতো দূরের কথা নিজের অতি কষ্টার্জিত সঞ্চয় থেকে আটকে পরা মুক্তিযোদ্ধা ও বিপদগ্রস্ত জনগণকে সাহায্য করেছি। এই ভাবে সুকৌশলে পিস কমিটির মধ্যে থেকে আমি জনগণের উপকার করেছি। যা পিস কমিটির বাহিরে থেকে করা সম্ভব হতো না।

কিন্তু আফসোসের বিষয় যে সব নেতা ও উপনেতা মুক্তিযুদ্ধ না করেও কলিকাতা শহরে ভারতীয় সরকারের খরচে ও আরাম-আয়াসে আফসে থেকেছেন তারাও আমাদের যারা স্বদেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে আত্মরক্ষা করিনি বরং মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে স্বদেশে জনগণের মধ্যে থেকে জনগণের জন্য কাজ করেছি তাদেরও পাকিস্তানী দালাল, বা কোলাবোরেটর কোন মুখে বলতে পারেন তা পাঠকদের বিচারের উপরই ছেড়ে দিলাম। তবে আমি আমার নিজের কথা বলে যাচ্ছি যে, পিস কমিটিতে থেকে আমি যদি জনগণের অহিতকর কোন কাজ করে থাকি বা অসদোপায়ে ধনসম্পদ অর্জন করে থাকি তা হলে যেন বর্তমান সরকার বা ভবিষ্যতের সরকার তার বিচার করেন আমি এই অনুরোধ করে গেলাম।

আগেই বলেছি যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সাথে এই পিস কমিটি সম্বন্ধে ভুল বোঝাবুঝি এমন কি জেল-ফাঁসির সম্ভাবনা আছে জেনেও আমি জনগণের মঙ্গলের জন্য পিস কমিটিতে যোগ দিয়েছিলাম। তাই স্বাধীন হওয়ার পূর্বেই সংসার চালাবার ব্যবস্থা হিশেবে আমার ছেলেরা তিনজন নাবালক থাকাতে আমার স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও উপদেশ দিয়ে কিছু দিন চালাবার মতো ব্যাংক চেক কেটে তার হাতে দিলাম যাতে পরিবারিক কাজ কর্ম ও সংসার চালাতে তার কোন আপাতত কষ্ট না হয়। আমার স্ত্রীকে তার শত অনুরোধ সত্বেও এই নির্দেশ ও চেক লেখার কারণ এবং আমার জেলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্বেও তা জানতে দেইনি। আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে জেলে যাওয়ার জন্য স্বগৃহে অপেক্ষা করছিলাম।

আমার শ্রীঘরে যাত্রা

১৮ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সন। দিবাগত রাত্রি স্বাধীনতার মাত্র ২ দিন পরে। কনকনে শীতের শেষ রাত্রেই তদানীন্তন ঢাকার এস-পি, একজন এ-এস-পি দু'জন সার্জেন্ট এবং বোধ হয় ডজন খানেক বন্দুকধারী কনেষ্টবল যানবাহন নিয়ে আমাকে ধরে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসলেন। আগেই বলেছি আমার এলাকার অস্ত্রধারী মুক্তিযোদ্ধারা আমার জানমালের নিরাপত্তার জন্য ২৪ঘন্টা ডিউটিতে ছিল। তারা তো পুলিশকে কিছুতেই আমার বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছিল না। আমার নিদ্রাবস্থায় আমার বাড়ির সামনে আমারই জন্য একটা অঘটন সংঘটন হতে পারত কিন্তু এস-পি সাহেবের উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তির কারণে তা ঘটেনি বলে আমি এস-পি সাহেবের নিকট যার নাম ভুলে গেছি বলে আমি দুঃখিত ও পুলিশ বাহিনীর সকলের নিকট এবং মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

এস-পির সাথে নির্ধারিত ব্যবস্থা মতো মুক্তিযোদ্ধারা আমার ছেলে শাহরিয়ার, নেসার ও মইনকে দিয়ে আমাকে ঘুম থেকে তুলে ঘটনা বর্ণনান্তে আমার সদর দরজায় এস-পি সাহেবের সাথে কথা বলতে নিয়ে গেল। এস-পি সাহেব ইউনিফর্মে ছিলেন বলে বোধ হয় আমাকে সম্মান দেখাবার জন্য সেল্যুট করলেন। তারপরে বুঝিয়ে বললেন যে বর্তমানে পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেল আব্দুল খালেক সাহেব স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পুলিশ ইন্সপেক্টর জেলারেল, চীফ সেক্রেটারী, প্রধানমন্ত্রী এক কথায় বাংলাদেশ সরকারের দায়দায়িত্ব বহন করেছেন। তার উপরে কোন অফিসার বা প্রশাসক বা কোন মন্ত্রী-মিনিষ্টার এখনও বাংলাদেশে এসে পৌছায়নি। তাই খালেক সাহেবের হুকুম হচ্ছে পাইকারী ভাবে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের গর্ভনর– সকল মন্ত্রী, ও কেন্দ্রীয় পিস কমিটির সকল কর্মকর্তা ও সদস্যদের এরেষ্ট করে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে পাঠাতে। যেহেতু আমি কেন্দ্রীয় পিস কমিটির সদস্য সেহেতু তিনি আমাকেও এরেষ্ট করতে আসছেন। এস-পি সাহেবের আসার কারণ সম্পূর্ণ আইনত সঠিক বলে আমি মুক্তি যোদ্ধাদের শান্ত করলাম। এবং এস-পি সাহেবের সাথে আমি সেন্ট্রাল জেলে যাব বলে মুক্তি যোদ্ধাদের কাছে আমার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। আমার তৈরী হতে বেশী দেরি হলো না। কারণ প্রস্তুত তো হয়েই ছিলাম। আমার ভাগ্য ভাল যে আমার অতি বৃদ্ধা ও অসুস্থা মাতা সাহেবানী তখনো ঘুমে ছিলেন। তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানতে পারেননি। আমি আমার স্ত্রীর কাছে বিদায় নিয়ে পুলিশের জীপে গিয়ে বসলাম।

গাড়ী আমাকে নিয়ে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের দিকে ছুটল। দেখতে পেলাম আমার পিছে পিছে আমার গাড়ী নিয়ে আমার বড় ছেলে শাহরিয়ার কয়েকজন মুক্তি যোদ্ধা নিয়ে পুলিশের জীপের পিছে পিছে আসছে। আমি পুলিশের গাড়ীর মধ্যে এসে মুসলিম লীগের নেতা জনাব ইরতিজা সাহেবকে দেখতে পেলাম। তাকে নিয়ে জেলখানায় পৌছলাম। এস-পি সাহেব আমাকে জেইলার সাহেবের নিকট বুঝিয়ে দিয়ে আবারও সম্মান দেখাবার জন্য সেলুট দিয়ে বিদায় নিলেন। আমি আমার ছেলে ও মুক্তিযোদ্ধাদের দোয়া করে উপদেশ দিলাম যে তারা যেন ক্ষমতার অপব্যবহার করে জনগণের কোন ক্ষতি না করে।

জেলখানায় কয়েদী হওয়ার এই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। ছেলেদের সকলের কাছে বিদায় নিয়ে জেল গার্ডের পিছনে পিছনে প্রথম কয়েদী ইরতিজা সাহেব ও দ্বিতীয় কয়েদী মেজর আফসার উদ্দীন স্বাধীন বাংলাদেশের ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের প্রথম রাজনৈতিক বন্দী কয়েদখানায় তাদের নির্ধারিত কক্ষের দিকে চলল।

আমার কারাবাসের অভিজ্ঞতা

শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন সদ্য সকাল। পূর্ব দিগন্তে লাল সূর্য উঠি উঠি করছে। সারাটা জেলখানা নিরব নিস্তব্ধ। কারণ ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীনতা দিবস সকালে কারাগারের সদর দরজা খুলে সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন সকল হাজতী যে যার পথে কারাগার ছেড়ে চলে গেছে। আমি ও ইরতিজা সাহেব স্বাধীন বাংলাদেশের ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রবেশ করে যেন নতুন বাড়ি ঘর সঞ্চার করলাম। আমাদের এ জেলখানার অফিসের নিকটতম সেলে রাখা হল। খুব সম্ভব ৮ নম্বর সেলের প্রবেশ দ্বারে ঝুলছিল 'কনডেম্‌ডসেল' সাইন বোর্ড। বুঝতে পেলাম যাদের মৃত্যু দন্ড দেয়া হয়েছে তাদেরই এই সেলে রাখা হয়। আমকে মৃত্যুদন্ড দেয়া না হলেও দেয়া হবে। এই সেলের এই ক্ষুদ্র সাইন বোর্ডটি আমার মনে গভীর বিষাদের ছায়া নিক্ষেপ করল। কিন্তু হিশেবে নিকেশ করে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েই যখন পিস কমিটির মাধ্যমে জনগণের উপকারার্থে কাজ করেছিলাম তখন মৃত্যুর চিন্তায় মুষড়ে পরিনি। মনোবল একেবারে হারাইনি।

সেলের মধ্যে প্রবেশ করে দেখি যে জেলখানা আবর্জনাময়। সেরূপ সেলের মধ্যে মলমূত্র ভর্তি পাত্রগুলিও কেউ সাফ করেনি। দুর্গন্ধে ঘর ভর্তি হয়ে গেছে। আমার কক্ষরক্ষীর কাছে রিপোর্ট করলে সে জানালো যে, মলমূত্র সাফ করা থেকে শুরু করে সকল সাফাই নাপিত ধোপা ও রান্নাবান্নার সকল কাজ সাজা প্রাপ্ত নির্ধারিত

কয়েদীরাই করত। জেলখানা ছেড়ে চলে যাওয়াতে এ হেন নিকৃষ্ট কাজ করবার কেহ নেই। এই পরিস্থিতিতে অতি দুর্গন্ধময় ঘরে নিজেই মলমূত্র পরিস্কার করে অন্ততঃ কোন রকম বেঁচে থাকার মত পরিবেশ সৃষ্টি করলাম। কতক্ষণ পরে এক জেল গার্ড বেশ পুরাতন দুর্গন্ধময় দু'টো কম্বল এনে দিয়ে বলল, একটা পাতবেন আর একটা গায়ে দিবেন। মাথায় দেয়ার কিছু নেই। এ-ই সাধারণ কয়েদীদের প্রাপ্য।

ঘন্টা দুই পরে শেরে বাংলা ফজলুল হকের একমাত্র ছেলে ফয়জুল হক কয়েদী হিশেবে জেলখানায় আমাদের সাথে যোগ দিল। বেলা প্রায় ১০টার সময় এক সিপাই আমাদের তিনজনের জন্য ডাল-চাল মিশানো একটা খিচুরি জাতীয় খাদ্য দ্রব্য যা জেলখানায় লাপসি বলে কথিত নিয়ে আসল। জেলখানাতে কতদিন থাকতে হবে তা অনিশ্চিত ভেবে বেঁচে থাকার জন্য এ খাদ্যদ্রব্যগুলি আমি পেট পুরে খেলাম। কিন্তু আমার সাথী ইরতিজা ও ফয়জুল হক সাহেব কিছুতেই খেলেন না। কেঁদে কেটেই সময় কাটাতে লাগলেন। না খেয়ে আর কতক্ষণ থাকা যায়। পরে অবশ্য তারা জেলখানার সকল খাদ্যই বাধ্য হয়ে খেয়েছিলেন।

দুপুরের দিকে এক জেল গার্ড এসে আমাদের জুতা, মোজা, স্যান্ডেল ইত্যাদি নিয়ে গেল। কনকনে শীতের দিবা রাত্রিতে আমরা খালি পায়ে চলতে লাগলাম। ৭/৮ দিন পরে ডি, আই, জি প্রিজনের হুকুমে ঐ সব ব্যবহারের জন্য ফেরত পেলাম।

এর পরে যতদিন যায় ততই তথাকথিত পাকিস্তান কোলাবোরেটর বা পাকিস্তানী দালাল ও বিহারিরা এসে জেলখানা ভরতে শুরু করল। ভরতে ভরতে এত ভরল যে, যেখানে পুরো জেলখানায় তিন হাজার কয়েদী রাখার হুকুম ছিল সেখানে প্রায় ১৪হাজার কয়েদীকে যেন তেন প্রকারে চেপেচোপে থাকতে হল। সে এক সীমাহীন কষ্ট।

বোধ হয় মাসখানেক পরে আমাকে ডিভিশন দেয়া হল। ডিভিশন অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর সম্মানিত কয়েদী হিশেবে আমাকে একটি ছোট চৌকি, বিছানা, বালিশ, মশারি, খানতিনেক কম্বল দিয়ে একটি ছোট কুঠরিতে থাকার সুবিধা দেয়া হল। এবং খাওয়া দাওয়ার জন্যও প্রথম ডিভিশনের আলাদা লঙ্গর খানার অন্যান্য সাধারণ কয়েদীদের থেকে কিছুটা উচ্চ মানের খানা মঞ্জুর হল। আমার এই ডিভিশন পাওয়ার জন্য আমার স্ত্রী নূরজাহান বুলবুল ও মরহুমা মাননীয়া শাশুড়ি বেগম তোহফাতুন্নেছা আজীম যিনি প্রভাবশালী আওয়ামী লীগের সদস্যা ও প্রাদেশিক সংসদ সদস্যা ছিলেন, তাদের ও আরও যে সব জননেতা ও সরকারী

কর্মচারী এ জন্য সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

এতদিনে ডিভিশনেও বেশ লোক আসতে লাগল। তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ফজলুল কাদের চৌধুরী (চট্টগ্রাম), লেঃ কর্নেল (অনারারী) ডক্টর আব্দুল বাছেত, খুলনার ডি-সি মিঃ আব্দুর রশীদ, ডি-আই-জি অব পুলিশ মিঃ নওয়াব, রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ সাজ্জাদ হোসেন, ঢাকা ইউনিভার্সিটির ডঃ মহর আলী ডঃ কাজী দীন মোহাম্মদ,ডঃ মোস্তাফিজুর রহমান, ও আরও কয়েকজন শিক্ষাবিদ রাজনীতিবিদদের মধ্যে ছিলেন খান আবদুছ সবুর, শাহ আজিজুর রহমান, খাজা খয়েরউদ্দীন, আব্দুল মতিন, জাষ্টিস ইসলাম, ও আরও অনেকে।

ডিভিশনের লঙ্গরখানা খোলা অবধি প্রথম থেকে আমি প্রায় এক বছরের উপর ডিভিশনের মেস ম্যানেজার ছিলাম। আমার প্রধান কর্তব্য ছিল সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত রেশন হিশেব মত বুঝে ষ্টোর রুম থেকে আনানো, সঠিক ভাবে পাকের ব্যবস্থা করা ও ফালতু ডিভিশন প্রাপ্ত কয়েদীদের খেদমতের জন্য পৌছানো এই সুবাদে আমার সারা জেলখানায় যাতায়াতের অনুমতি ছিল।

আমি এই সুযোগের খুবই সদ্ব্যবহার করতাম। কে কেমন আছে তার খরব নিতাম। এবং জেল কর্মচারির অগোচরে আমাদের সাথী কয়েদীদের খবর ও চিঠি পত্র গোপনে বাড়ি পৌছাবার ব্যবস্থা করতাম।

কারাগারে যদি কেহ ভাল ভাবে সময় কাটাতে চায় তা হলে তাদের প্রচুর আধ্যাত্মিক সাধনা, পড়াশুনা ও ফুল বাগানে মালির কাজ করা উচিত। কারাগারের পাহারাদার সিপাইদের সাথে খুব ভাল ব্যবহার করলে তারাও কায়েদীদের সবিশেষ উপকার করতে চেষ্টা করে। আমার মনে হয় জেলখানার প্রত্যেকটি নিরাপত্তা বন্দী ও বিচারাধীন হাজতীদের শুধু শুধু নিষ্কর্ম বসে বসে খাওয়ার চেয়ে তাদের সম্মান ও উপযোগিতানুযায়ী কিছু কাজ দেয়া উচিত যেমন খুনী ডাকাত ইত্যাদি কয়েদীদের সৎপথে আনানোর জন্য ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদান, মুর্খ ও অক্ষরহীন কয়েদীদের অক্ষর জ্ঞানদান ও হস্ত শিল্পের কিছু কাজ তাদের দিয়ে করানো। এটা দেশের আর্থিক উন্নতি আনয়ন করবে। এ বিষয়ে আমি দেশের কর্তৃপক্ষের বিশেষ করে জেল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ইত্যবসরে আমার প্রায় দেড় বছর ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে অতিবাহিত হলো। সরকারের সাধারণ ক্ষমার পূর্বেই বিনা বিচারে কোর্ট কাছারিতে একদিন না গিয়েও আমাকে মুক্তি দেয়া হল। পরে জানতে পেলাম আমাকে জেল থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য স্বরাষ্ট্র সচীব বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সাহস পায়নি স্বয়ং বাংলাদেশ সরকারের

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান আমাকে মুক্তি দেয়ার আদেশ পত্রে সই করেছেন। এ জন্যও আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ ও তার রূহের মাগফেরাত কামনা করছি।

আমার কারামুক্তি

দীর্ঘ দেড় বছর আমার কারাবাসের পর ১৯৭৩ সনের মাঝামাঝিতে আমার কারামুক্তি হয়। আমি দেখেছি আইন ও শৃংখলা আজকালকের তুলনায় বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলেও খুব ভাল ছিল। বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে আজকালকের তুলনায় শিক্ষাঙ্গনে ও গ্রামেগঞ্জে খুব কম সংখ্যক সাধারণ খুন খারাপি ও ডাকাতি ইত্যাদি হতো। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর কালের মতো যেখানে সেখানে অস্ত্রের ছড়াছড়ি, খুনখারাপি, ডাকাতি অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে জোর করে চাঁদা আদায়, ক্ষুদ্র কারণে শিক্ষাঙ্গনের মধ্যে সহপাঠিদের মধ্যে ছোট খাটো যুদ্ধের মতো অস্ত্র ও বোমাবাজি, হত্যা ও ভাংচুর, অস্ত্রের মুখে ও ককটেল ফাটিয়ে বিবাহ বাসরে অপরের স্ত্রীকে ছিনিয়ে নেয়া ইত্যাদি গুরুতর আইন-শৃংখলা ভাঙ্গার অপরাধ বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে প্রায় ছিল না বললেই চলে। হাইজাকিং শব্দটা শিখলাম ও এর কার্যকারিতা দেখলাম বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে। আগে দেখেছি সরকারই সর্বময় ক্ষমতার মালিক সামরিক বাহিনী দূরের কথা, প্যারা মিলিটারী ও সশস্ত্র পুলিশ সরকার ও প্রশাসনের হুকুম ছাড়া কখনও বেসামরিক লোকদের উপরে হস্তক্ষেপ করতে পারতনা। কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে দেখি স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে আর একটি সরকার অবস্থান করছে— যার নাম রক্ষী বাহিনী।

রক্ষীবাহিনী

বিভিন্ন বইপত্রে দেখতে পেলাম যে, এই রক্ষীবাহিনীকে পরিচালিত করবার জন্য মুক্তি বাহিনীর ভারতে অবস্থান কালে ভারতীয় গুপ্তচর বাহিনী (Raw) শেখ মনি, তোফয়েল আহমেদ প্রমুখ যুবনেতাদের নিয়ে মুজিব বাহিনী নামে একটি বিশেষ বহিনীকে আলাদা ভাবে প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল। এই রক্ষীবাহিনী স্বাধীনতার পরে বর্তমান সাভার এলাকার কোন স্থানে ভারতীয় Raw-এর নেতৃত্বে বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষণ ও মটিভেশন নিচ্ছিল। তার পরে তাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ও থানায় নিজস্ব কমান্ডারের অধীনে স্বাধীন ভাবে কাজ করার জন্য পোষ্টিং করা হত। তারা সরকারী প্রশাসক যেমন ডি, সি, এস-পি বা থানার কোন কর্মকর্তার

হুকুমেও চলতনা বা কোন ধারও ধারত না।

এরূপভাবে একটি দল আমার নিজস্ব থানায়ও পোষ্টেড ছিল। স্থানীয় ডাক বাংলায় তাদের বাসস্থান ও অফিস ছিল। পুরো ডাক বাংলা এলাকাটা তারা নতুন টিন দিয়ে ঘেরাও করে এমন ভাবে রেখেছিল যে বাইরের থেকে কোন লোক তাদের কাজ কর্ম ও চলাফেরার উপরে নজর রাখতে না পারে। মনে হচ্ছিল যেন কোন পর্দানশীন ফ্যামিলি সেখানে বাস করছে। প্রায় রাত্রিতেই সেখান থেকে মানুষের ক্রন্দন ও গোঙ্গানি শোনা যেত। গ্রামের গরু ছাগল–হাঁস মুরগী–দোকানের মাল যেটাই তাদের পছন্দ হতো সেটাই ঐ সব মালামালের মালিক তাদেরকে বিনা মূল্যে উপহার দিতে বাধ্য হত।

আমি জেল থেকে বেরিয়ে প্রথম বারের মতো দেশের বাড়ি গেলাম। পাঁচ সাত দিন পরে হয়ত আমার পরিচয় জানতে পেরে ঐ রক্ষীবাহিনী ক্যাম্পের প্রধান কর্মকর্তা হাবিলদার আমার সাথে দেখা করতে আসল। সৌজন্য সাক্ষাতকারের জন্য এসেছিল বলে পাঠকবৃন্দ মনে করবেন না। সেই হাবিলদার আমাকে ইঙ্গিতে নয় পরিস্কার বঙ্গ ভাষায় বুঝাল যে, রক্ষী বাহিনী থানার ভার প্রাপ্ত অফিসার তো দূরের কথা তারা জেলার ডি-সি, বা এস-পির কোন আদেশ মানতে বাধ্য নয়। তারা স্বাধীনভাবে বিচার আচার যাকে খুশী যে সাজা উপযুক্ত মনে করবে মৃত্যুদন্ড সহ তাই তারা দিবে– তা জানাতে।

দেশের যখন আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃংখলা নাই বলেই চলে তখন দেশে নিরীহ নাগরীকরা কি করে এই দেশে বসবাস করবে সেই চিন্তায় আমার মন খুব ভারাক্রান্ত। দেশে বাস করতে পারবো কিনা সে ব্যাপারে সবিশেষ চিন্তিত।

আমার এ মনের ভাব জানাতে ও সময়োপযোগী নির্দেশ দিতে সার্বিক ক্ষমতাধর শেখ মুজিবর রহমানের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁর ধানমন্ডির ৩২নং রোডের বাড়িতে গেলাম। তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারিকে দিয়ে আমার আগমনের সংবাদ পৌছালাম। আমি বসার ঘরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কতক্ষণ পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান উপর থেকে নেমে আসলেন। তিনি সহাস্য বদনে আমার সাথে করমর্দন না করে বিশাল বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে গভীর আলিঙ্গন করলেন। আমি তাঁর বহুদিনের ভালবাসার স্মৃতি প্রদর্শনের জন্য অভিভূত হয়ে গেলাম। আজ আমি অতি ক্ষুদ্র মানুষ। আর তিনি শুধু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নন–বঙ্গবন্ধু ও জাতির কর্নধার। তিনি আমার সাথে দেখা না করলেও পারতেন।

যা হোক আমাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। তার পরে দেশের বিরাজমান পরিস্থিতিতে সারা বাংলাদেশই একটা বৃহৎ

কারাগারে পরিনত হয়েছে এবং রক্ষী বাহিনীর হাতে জিম্মী বলে মনে হয়। এই অবস্থায় আমার মত লোক দেশে থাকবো না বিদেশে পাড়ি জমাবো তা তার কাছে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে বললেন যে, আমার জন্মস্থান বাখেরগঞ্জ জেলার এবং বর্তমান বাসস্থান ঢাকা শহরের ডি, সি, এস-পি, এস-বি, এন-এস-আই ডি, এফ-আই ও আওয়ামী লীগের পক্ষ হতে নিরঙ্কুশ ভাল রিপোর্ট না পেলে তিনি আমাকে কিছুতেই ছাড়বার হুকুম দিতেন না। যেহেতু সংশ্লিষ্ট সকল তরফ থেকে আমার সম্বন্ধে ভাল রির্পোট এসেছে সে অবস্থায় আমাকে জেলে রাখলে অযথা সরকারী টাকা পয়সা ব্যয় হবে এবং আইনতঃ ও ন্যায়ত ক্ষমতার অপব্যবহার হবে সেজন্য উনি আমাকে কারামুক্তির আদেশ দিয়েছেন। তারপরে গলার সুরটা আর একটু নরম করে জানালেন যে বিরাট একটা মুক্তিযুদ্ধের পরে দেশ স্বাধীন হয়েছে এই মুক্তিযুদ্ধের রেশ ও অরাজকতা কিছুদিন চলবেই। এই অবস্থায় আমার মত লোকের দেশ ছেড়ে যাওয়া অন্যায় হবে বরং দেশে থেকে সুবুদ্ধি দিয়ে তাকে সাহায্য করা উচিত হবে। সাভার থানা এলাকায় ফুলবাড়িয়া চরাঞ্চলে আমার কিছু জমি ছিল। স্বাধীনতার পরে আমি জেলে থাকা কালীন সময়ে সেই জমি স্থানীয় দুর্বৃত্তরা জবর দখল করে নেয়। আমি একদিন সেই জমি দেখবার জন্য ফুলবাড়িয়া এলাকায় যাই। স্থানীয় কিছু হিন্দু-মুসলমান ভাল অধিবাসিরা আমাকে নিভৃতে উপদেশ দিলেন যে এই এলাকায় তখন ত্রাসের রাজত্ব চলছে, স্থানীয় ডাক বাংলায় প্রায় প্রত্যেক রাত্রেই কোথা হতে কারা লোকজন ধরে নিয়ে আসে, বেদম মারধর করে, প্রহৃত লোকজনের কান্না কাটি ও চিৎকার শোনা যায়, মৃতদেহও সংলগ্ন বুড়িগঙ্গা নদীতে জোয়ার ভাটায় ভেসে থাকতে দেখা যায়। আমাকে জানমাল ও মান সম্মান নিয়ে বাঁচতে চাইলে এই জমি ভোগ করার আশা ছেড়ে দিয়ে এই এলাকায় না আসারই পরামর্শ দিলেন। আমি অবশ্য তাদের পরামর্শ মেনেছি। কিন্তু পুরোপুরি নয়। ঢাকা কোর্ট কাছারির মাধ্যমে ঐ জমি দখল করে পরবর্তিতে পানির দরে আমার জমি বিক্রী করে দিয়ে ঐ এলাকায় যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি।

রক্ষীবাহিনীর ছত্রছায়ায় হোক বা না হোক আর একটি অরক্ষীবাহিনী তবে প্রায় রক্ষীবাহিনীর মতই ক্ষমতাবান হয়ে গড়ে উঠেছিল, এই বাহিনীটি সংখ্যায় বিরাট ছিল। শহরে-বন্দরে-গ্রামে-গঞ্জে তারা দিবা রাত্রি লুন্ঠন, হত্যা, পরস্ত্রী বা কন্যা বা জায়গা জমি ও বাড়ি ঘর জবর দখল করত কখনও সরকারী ব্যাংকও লুট করত, সর্বত্র ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করত। দেশের অর্থনীতি একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। এই অর্থনীতি ভাঙার একটি কারণ হলো ভারতীয় দখলদার সেনা বাহিনীর লাগামহীন লুঠপাট। মোটরগাড়ী, মালবাহী রেলওয়ে ওয়াগন, যাত্রীবাহী

রেলওয়ে কোচ, মিল কল ও ফ্যাক্টরীর মালামাল এমন কি ক্যান্টনমেন্টের (হাসপাতাল সহ) মূল্যবান যন্ত্রপাতি ভারতীয় দখলদার বাহিনী লুটপাট করে নিয়ে গেল।

পাকিস্তান আমলের ছাপানো টাকা অবৈধ ঘোষণা করে স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন টাকা ভারত থেকে ছাপালো। ভারতও এই সুযোগে একই নাম্বার দিয়ে বহু টাকা ছাপালো। মনে হয় নাম্বার দৃষ্টে এক সেট টাকা অর্ডার মাফিক বাংলাদেশ ব্যাংককে দিয়ে বাড়তি টাকাগুলি সব ভারতে রেখে দিল। সেই টাকা অর্থাৎ শুধু কাগজের বিনিময়ে বে-আইনী ভাবে বাংলাদেশ থেকে মালামাল খরিদ করতে লাগল এই ভাবে বাংলাদেশকে আর্থিক ভাবে ফতুর করতে লাগল। পরে হাটে বাজারে একই মানের নোট একই নাম্বারের কয়েকটি ধরা পড়াতে দেশে হৈ-চৈ হলো, খবরের কাগজে লেখা লেখি হলো তবে তা বন্ধ হল। ইত্যবসরে ভারত বাংলাদেশকে কয়েক হাজার কোটি টাকা লোকসান করালো। সরকারি ভাবে ও পাচারের মাধ্যমে ভারতীয় পণ্যে বাংলাদেশের বাজার ছয়লাব হয়ে গেল।

ভারত প্রত্যাগত আমাদের সরকার ও সরকারি কর্মচারিদের আচার আচরন ও ব্যবহার দেখে ভারত সন্তুষ্টির জন্য প্রায় সকল স্তরের অধিকাংশ মানুষও ভারতীয় হিন্দুর আচার আচরণ ও সংস্কৃতি গ্রহন করতে ব্যস্ত হয়ে গেল। ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতিতে দেশে প্লাবন আসল। আজ অবশ্য এ দেশ বাসির নিজস্ব সংস্কৃতি প্রধান্য পাচ্ছে। এবং ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি মোহ কমে যাচ্ছে।

শিক্ষার অঙ্গনেও অন্ধভাবে ভারতের শিক্ষা পদ্ধতি–বই পুস্তক–সাহিত্য ও কৃষ্টি অন্ধভাবে অনুকরণ ও অনুসরণ চলছিল। কিছু দিনের জন্য মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ ছিল। পরে অবশ্য ধর্ম প্রাণ মুসলমানের চেষ্টায় বিশেষ করে সরকারী দল আওয়ামী লীগের মরহুম মাওলানা তর্কবাগীশসহ কয়েকজন আলেম ও ওলেমার চেষ্টায় আবার তা চালু হয়।

আমার একদিন ইচ্ছা হলো আমাদের সামরিক বাহিনী কেমন করে চলছে, তাদের উন্নয়নের ধ্যান-ধারণা কী জানবার ইচ্ছা হলো। আমি একদিন আমাদের এয়ার ফোর্স হেড কোয়ার্টারে গেলাম। এরা সবই আমার খুবই জুনিয়র এবং অপরিচিত। আমি যে তথাকথিত কোলাবরেটর হিশেবে দীর্ঘ দেড় বছর কারাগারে বন্দী ছিলাম তা হয়ত সব অফিসারই জানে। তাই আমি মনে মনে ইতস্ততঃ করছিলাম।

আমি প্রাইভেট সেক্রেটারির মাধ্যমে তখনকার এয়ার ফোর্স চীফ অব ষ্টাফ এয়ার ভাইস মার্শল এ, কে, খন্দকারের নিকট আমার সৌজন্য সাক্ষাতকারের

খবর পৌছালাম। তিনি খুব সৌজন্যের সাথে সাক্ষাত দিলেন। বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করলেন এবং কৃতজ্ঞতার সাথে আমাকে জানিয়ে মুগ্ধ করলেন যে আমি যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটি অফিসার্স ট্রেনিং কোরের এ্যাডজুটেন্ট তখন আমিই ইনজিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের মধ্যে হতে তাকে ইউ, ও, 'টি, সি ট্রেনিংয়ের জন্য ও পরবর্তিতে এয়ার ফোর্সে অফিসার্স র‍্যাংকে ভর্তি হওয়ার জন্য রিকমেন্ড করি। তিনি জানালেন আমার ঐ উৎসাহদানের জন্য তিনি আজ এই চেয়ারে বসতে পেরেছেন। এই কৃতজ্ঞতাবোধ থাকার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানালাম।

তারপরে আমি একদিন একই উদ্দেশ্যে (Naval) হেডকোয়ার্টারে গেলাম। সেখানেও ন্যাভাল চীফ অব ষ্টাফ রিয়ার এডমিরাল খানের নিকট যথারীতি আমার সৌজন্য সাক্ষাতকারের খবর পৌছালাম। তিনি বম্বে ডাফরিন ন্যাভাল একাডেমির ছাত্র ছিলেন। নৌবাহিনীর কাজ কর্মে তার দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা আমাদের আর্মি ও এয়ার ফোর্স চীফ অব ষ্টাফদের তুলানায় অনেক বেশী ছিল। তিনি আমাকে দুঃখের সাথে জানালেন যে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার তাকে হুকুম দিয়েছেন যে পেনশনের সময় হলে নৌবাহিনীর অফিসার ও নাবিকরা পেনশনে যাবে; কিন্তু সেই শূন্য পদে আর কোন লোক ভর্তি হবে না। প্রকৃত পক্ষে নৌবাহিনীতে ভর্তি করা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। এর অর্থ হলো কোন ক্রমে নৌবাহিনী আর তেমন শক্তিমান ও কর্মক্ষম থাকবে না। অথচ বঙ্গোপসাগরে আমাদের পানি সীমা তদারকের জন্য, জলদস্যুতা বন্ধের জন্য এবং চোরাচালানী প্রতিরোধ ও ধর পাকড়ের জন্য নৌ-বাহিনী আমাদের একান্ত প্রয়োজন। তার পরে ঝড় তুফান, সাইক্লোন, টাইডালবোরের জলোচ্ছ্বাসের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বিচ্ছিন্ন–হাতিয়া –সন্দীপ সেন্টমার্টিন প্রভৃতির ন্যায় দুর্গম স্থানে সাহায্য পৌছানোর জন্য নৌবাহিনীর প্রয়োজনীতা অপরিহার্য। এ হেন প্রয়োজনীয় নৌবাহিনীকে নব্য স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার আরো উন্নত মানের করা তো দূরের কথা আমাদের নৌ বাহিনী অচিরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে শুনে আমার গা আতঙ্কে শিহরিয়ে উঠল।

আমার মনে হলো এ হেন আত্মঘাতী হুকুম সরকার আমাদের সৈন্য ও বিমান বাহিনীকেও দিয়ে থাকবেন। এর অর্থ করলে দেখা যায় তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশ্য ছিল আমাদের সামরিক বাহিনীকে বিলুপ্ত করে দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃংখলার ভার রক্ষীবাহিনীর উপর অর্পণ করা। আর সীমান্ত, আকাশ সীমা ও সমুদ্র সীমা রক্ষার ভার ভারতীয় সামরিক বাহিনীর উপরেই ছেড়ে দেয়া। অর্থাৎ বাংলাদেশকে সম্পূর্ণভাবে হয় ভারতের একটি প্রদেশ নয় একটি করদ রাজ্য অথবা সিকিমের মত একটি তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করা।

আমি আর একদিন আমাদের আর্মি হেড কোয়ার্টারে গেলাম। তখনকার আর্মি, চীফ অব ষ্টাফ মেজর জেনারেল শফীউল্লাহ এবং অন্যান্য সিনিয়র আর্মি অফিসার, তদানীন্তন ব্রিগেডিয়ার পরে লেঃ জেনারেল ও রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, কর্নেল খালেদ মোশাররফ প্রমুখের সাথে আমি সৌজন্য সাক্ষাত করি। তারা প্রত্যেকে সুযোগ্য অফিসার ছিলেন। আমার সাথে যথেষ্ট ভদ্রোচিত ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সরকারী ও সামরিক কাজ কর্ম সম্বন্ধে আইন ও শৃংখলা রক্ষা করার জন্য একটি কথাও বলেননি। আমি এ জন্য তাদের প্রশংসা করি কিন্তু জুনিয়ার অফিসারদের মধ্যে সরকার ও সরকারী কাজ কর্মের কঠোর সমালোচনায় ব্যস্ত দেখলাম, আইন ও শৃংখলা নিচের দিকে বেশ শিথিল মনে হলো। যেই সৈন্য বাহিনী সরকারের মহাবিপদের সময় একান্ত সম্বল হয় তারা যখন সরকারের বিরুদ্ধে এতটা প্রতিবাদমুখর তখন এই সরকার আর বেশী দিন টিকার বলে আমার মনে হলো না। যদিও তাদের সরকারের উপর অসন্তুষ্টির অনেক কারণ ছিল। যেমন ক্ষয়িষ্ণু সামরিক বাহিনী বনাম বর্ধিষ্ণু রক্ষীবাহিনী যেই সামরিক বাহিনী মুক্তি যোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে বহু জানমাল ও এক সাগর রক্তের বিনিময়ে সদ্য স্বাধীনতা অর্জন করেছেন সেই স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য এই অফিসারগণ যে ব্যাকুল হবেন তা তো অতি স্বাভাবিক। স্বাধীনতা বিকিয়ে দেয়ার সরকারের প্লান ও প্রোগামের মধ্যে সম্পৃক্ত আছে তা জুনিয়র অফিসার ও সিপাই সুবেদার খোলা মনে আলাপ আলোচলা করছে। আর সিনিয়র অফিসাররা মনের দুঃখ ও দাবানল আইন ও শৃংখলার খাতিরে চেপে রাখছেন এই যা তফাৎ। সামগ্রিক ভাবে সারাটা সামরিক বাহিনীতে এই ক্ষোভ বিদ্যমান বলে আমার নিকট প্রতীয়মান হলো। আমি একটা বিরাট হতাশা ও উৎকণ্ঠা নিয়ে ঘরে ফিরলাম।

ভারতের সঙ্গে গোপন চুক্তি

বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ প্রয়োজনের তাগিদে হোক বা দিল্লী সরকারের চাপের মুখেই হোক একটি গোপন চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন বলে লোক মুখে বহুল প্রচারিত হচ্ছিল। কদাচিত কাগজে কলমেও এই গোপন চুক্তির আভাস ইঙ্গিত বেরোত। চুক্তির প্রধান শর্ত গুলি নিম্নরূপ ছিল বলে প্রচারিত হয়;

১। ভারতীয় সামরিক কমান্ডারদের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে আধা সামরিক বাহিনী গঠন করা হবে। এই বাহিনী অস্ত্রশস্ত্রে ও সংখ্যায় বাংলাদেশের সামরিক

বাহিনী হতে বড় ও শক্তিশালী হবে। (বোধ হয় রক্ষীবাহিনী গঠনের ইঙ্গিত)

২। বাংলাদেশের সমরোপকরণ অস্ত্র-শস্ত্র ইত্যাদি ভারত হতে ক্রয় করতে হবে। এবং ভারতীয় সামরিক কমান্ডারদের পরামর্শানুযায়ী তা করতে হবে।

৩। বাংলাদেশের বহির্বানিজ্য কর্মসূচী ভারতীয় পরামর্শ অনুযায়ী হতে হবে।

৪। বাংলাদেশের বাৎসরিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ভারতীয় পরিকল্পনার সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

৫। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির অনুরূপ হবে।

৬। ভারত বাংলাদেশ চুক্তিগুলি ভারতের সম্মতি ব্যতীত বাতিল করা যাবে না।

৭। ১৯৭১ সন ডিসেম্বরে পাক ভারত যুদ্ধের পুর্বে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ভারত যে কোন সময়, যে কোন সংখ্যায় বাধা দান কারী শক্তিকে ধ্বংস করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে।

এ হেন চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ খর্ব করা হলো কিনা তা সহৃদয় পাঠকগণই বিবেচনা করবেন।

বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তি

১৭ই মার্চ ১৯৭২ সন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে ঢাকা সফরে আসেন। ১৯ শে মার্চ বাংলাদেশের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান এবং ভারতের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ২৫ বছর মেয়াদী 'বন্ধুত্ব, সহযোগিতা, ও শান্তি চুক্তি' স্বাক্ষর করেন। বহুল প্রচারিত এই চুক্তিটিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রিয় জনগণ ২৫ শালা দাসত্ব চুক্তি নামে অভিহিত করেন।

২৭ মে মার্চ ১৯৭২ সন ভারতের সাথে অবাধ সীমান্ত বানিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির নামেই অর্থ বুঝা যায় যে, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বানিজ্য আর কোন কাষ্টম ফরমালিটিস বা বাধা বিঘ্ন রইলো না। বাংলাদেশ ভারতের পণ্যের অবাধ বানিজ্যের ক্ষেত্রে পরিণত হলো।

স্বাধীনতা প্রিয় নাগরিকদের চাপে পড়ে বাংলাদেশ সরকার বাধ্য হয় এই চুক্তি গুলির কার্যকারিতা বন্ধ করতে। প্রকৃত প্রস্তাবে দেখা যায় এই প্রস্তাব গুলির কোন কার্যকারিতা নাই বললেই চলে। তবু কথা ২৫ শালা চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে ভারত ইচ্ছা করলে কোন অজুহাতে কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদের মতো আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে ঢুকে পড়বে। তারপরে সাম্প্রদায়িক ও বর্ণবাদী হিন্দুদের দ্বারা

ও ভারতীয় সামরিক আধাসামরিক ও পুলিশ বাহিনীর সহযোগিতায় বাংলাদেশের মুসলমানদের গণহত্যা লুন্ঠন ও নারী নির্যাতন করবে। যেমন করছে অযোধ্যা-দিল্লী-আগ্রা-বম্বে আহমেদাবাদ–আজমীর ও কাশ্মিরে। আর এ জন্য বাংলাদেশের ভারতের সাহায্যকারী–অনুরাগী ভক্ত, চর, অনুচর, ও গুপ্তচর বাহিনী তো আমাদের দেশে ভারত আগে থেকেই বহুল পরিমাণে সৃষ্টি করে রেখেছেন। তাই সময় থাকতে আমাদের সরকার ও স্বাধীনতা প্রিয় জনগণ চেষ্টা করলে হয়ত আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এখনও রক্ষা করা যায়।

একদলীয় সরকার গঠন

কিছু কিছু রাজনৈতিক দল বিশেষ করে বামপন্থী দলগুলি যারা রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট সরকারের একান্ত অনুরক্ত এবং যারা স্বাধীনতা সংগ্রাম উপলক্ষে ভারতের ভাত পানি খেয়েছেন তারা মুক্তিযোদ্ধার অধিকার নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের কিছু কিছু সমালোচনা করতেন। এদের নেতৃত্বে ছিল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি একদিন দেখা গেল আওয়ামী লীগ গোস্বা হয়ে ন্যাপ (মোজাফ্ফর) নেতা ও কর্মীদের শিক্ষা দেয়ার জন্য ভাল একটি মার দিল। তোপখানা রোডের উশ্রী নামক বাড়িটিতে ন্যাপের অফিসের তালা বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু তবুও ন্যাপ ও অন্যান্য রাশিয়ানপন্থী বাম দলগুলি 'মেরেছ কলসি কানা তাই বলে কী প্রেম দিব না' নীতি অনুসরণ করে আওয়ামী লীগ সরকারকে রাশিয়ার পথ অনুসরণ করাবার জন্য তাদের (আওয়ামী লীগের) সাথে লেগেই রইল।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল রাশিয়ান পন্থী বাম দলগুলির উদ্দেশ্য কৃতকার্য হলো। শেখ মুজিবর রহমান রাশিয়ার অনুকরনে তার সংসদকে দিয়ে ২৪ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ সন বাংলাদেশে সকল রাজনৈতিক দল বাতিল করে কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠনের আদেশ জারী করেন। রাশিয়ার কুম্যনিষ্ট পার্টির অনুকরনে বাংলাদেশেও বাকশাল নামে একটি মাত্র রাজনৈতিক পার্টি ছাড়া আর কোন পার্টি রইল না।

তারপর হুকুম হলো শুধু জনগণই নয় সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখাবার জন্য সকল বেসামরিক ও সামরিক কর্মচারীদেরও এই পার্টিতে যোগ দিতে হবে। তথাস্তু। প্রায় সকল সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারিরা তাদের চাকুরি রক্ষার জন্য অর্থাৎ বৌ–বাচ্চা– ইত্যাদি প্রতিপালনের জন্য বাধ্য হয়ে বাকশালে যোগ দিল। প্রত্যেক অফিস থেকে রাশি রাশি দরখাস্ত বাকশালে যোগ দেয়ায় জন্য

অফিসে জমা হতে লাগল।

কিন্তু গণতন্ত্রমনা জনগণ শেখ মুজিবের অদূরদর্শিতাপূর্ণ এই খামখেয়ালী কাজের জন্য সমালোচনামুখর হয়ে উঠল। আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য জেনারেল আতাওল গনি ওসমানী ও ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন (দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি) প্রতিবাদে সংসদ সদস্য পদ ত্যাগ করলেন। তবুও বাকশালে যোগ দিলেন না।

কিছুকাল অতিবাহিত ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর দেখা গেল প্রাক্তন আওয়ামী লীগের অধিক সংখ্যক সদস্যগণ শেখ মুজিবের কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শেখ মুজিবের ভূল বুঝতে পেরে আবার আওয়ামী লীগ পুনর্জীবিত করলেন। এতেই প্রমাণিত হয় যে শেখ মুজিবের সকল রাজনৈতিক দল রহিত করে একমাত্র বাকশাল রাজনৈতিক দল গঠন করা ভুল পদক্ষেপ ছিল। শুধু তাই নয় শেখ মুজিবের কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগে এত দলীয় রাজনৈতিক দল ও প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্ম অব গভর্নমেন্ট গঠনের পরিবর্তে সংসদীয় সরকার সমর্থন করেন। বহু দলীয় ও গণতান্ত্রিক শাসন পুরো কায়েম করবার জন্য স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করেন। এতেও প্রমাণ হয় শেখ সাহেবের একদলীয় ও এক নায়কত্ব মূলক রাজনৈতিক দর্শন কত ভুল ছিল। আওয়ামী লীগ পার্টি শেখ মুজিবের হাতের রাবার স্ট্যাম্প ছিল।

এও হতে পারে যে, শেখ মুজিবর রহমান ও তার পরবর্তি এক নায়ক সরকার প্রধান ও রাষ্ট্র প্রধানগণ মনে করেছিলেন যে, এক নায়কত্বের পথেই বাংলাদেশের মতো একটি অনুন্নত দেশকে এবং বিভিন্ন চিন্তা ধারার লোককে উন্নয়নের ও উৎপাদনের পথে ধাবিত করবার শ্রেষ্ঠ পথ ও মত। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য শুধু মহৎ হলেই চলবে না সেই উদ্দেশ্য হাসিলের মত ও পথও মহৎ হতে হবে।

এই কথা যারা ভুলে যাবেন– তারা অবশ্যই ভুল করে ভুল পথ গামী হবেন।

প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্ম অব গভর্ণমেন্ট

স্বাধীনতা উত্তর কালে শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তান থেকে মুক্তি পেয়ে স্বদেশে আসার পর তাকে গণ্য করা হতো স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে। বাংলাদেশের জনগণ তাকে ভালবাসত ও বঙ্গবন্ধু বলত। সকল ক্ষমতার উৎস তিনিই থাকতেন। তা যদি সরকারের প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট না হয়ে শুধু সরকারী দল আওয়ামী লীগের দলপতি থাকতেন তা হলেও। কিন্তু অতীতে দেখা গেছে তিনি ক্ষমতায়

থাকতেই বেশি পছন্দ করতেন। তাই তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য ১৯৭৫ সনের ২৫ শে জানুয়ারী মাত্র ৪ মিনিটের মধ্যে সংসদ সদস্যদের ভোটে সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনির মাধ্যমে পার্লামেন্টারী ফর্ম অব গভর্ণমেন্টকে পরিবর্তন করে প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্ম অব গভর্ণমেন্টে রূপান্তরিত করেন। এবং তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী প্রেসিডেন্ট হয়ে গেলেন।

দোর্দন্ড প্রতাপে দেশ শাসন করতে থাকেন। কেহ তার শাসনের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা না করতে পারে সে জন্য খবরের কাগজের কন্ঠ রোধ করে সারাদেশে মাত্র ৪টি দৈনিক খবরের কাগজ রাখলেন। এই ৪টি কাগজেও শুধু সরকার ও বাকশালের খবরাদি ছাড়া জনগণের প্রকৃত অভিযোগ ও সরকারের সমালোচনা ছাপতে পারত না। গণতন্ত্রের সমাধি হল।

এর পরেও শেখ মুজিবর রহমান সুনিশ্চিত হতে পারলেন না। তিনি তার দলের ও মতের বাকশালীদের মধ্য হতে একান্ত অনুগত লোকদের বেছে বেছে জেলা গর্ভনর মনোনীত ও নিযুক্ত করলেন। কর্মরত ডিপুটি কমিশনারগণ এই জেলা গভর্ণরদের নির্দেশমত আপন আপন জেলার কার্যনির্বাহ করতে বাধ্য থাকার হুকুম ছিল। প্রকৃতপক্ষে জেলা পর্যন্ত সকল ক্ষমতা শেখ মুজিবর রহমান ও তার বাকশালের কুক্ষিগত হলো। এর পরেও হয়ত মহকুমা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যন্ত বাকশালীদের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের মতলব ছিল। কিন্তু সে মতলব হাসিলের সময় ও সুযোগ বাকশালীরা পেয়ে ওঠেনি।

১৯৭৫ সনের ১৫ই আগষ্টের সামরিক অভ্যুত্থান

আগেই বলেছি যে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্বাধীনতা সংগ্রামী বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী ও বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাগণ বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনে অযোগ্যতা আইন ও শৃংখলার চরম অবনতি রক্ষিবাহিনীর সীমাহীন অত্যাচার ও জুলুম দেখে সরকারের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট ও বিক্ষুব্ধ ছিল। তার পরে সকল ক্ষমতা বাকশালের নেতা শেখ মুজিবর রহমানে কুক্ষিগত হওয়াতে– সামরিক বাহিনীর কিছু লোক অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। জনগণের ভোটের মাধ্যমে যখন এই সরকার পরিবর্তনের কোনই সম্ভাবনা রইল না তখন যা হবার তাই হলো। সামরিক বাহিনীর কয়েকটি দুঃসাহসী তরুণ অফিসার অতিগোপনে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের পরিকল্পনা করছিল ও সুযোগ খুঁজছিল।

সেই সুযোগ তাদের হাতে এসে গেল। ১৫ই আগষ্ট সকাল বেলা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক অনুষ্ঠানে স্বাধীন বাংলার সকল ক্ষমতাধর প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান সেই অনুষ্ঠানে রাজকীয় মহাসমারোহে প্রধান অতিথির আসন গ্রহন করবেন বলে ঘোষিত হল। যখন সরকারের সকল প্রশাসনের এই অনুষ্ঠানকে মহা ধুমধামের সাথে সুসম্পন্ন করবার জন্য সকলেই ব্যস্ত সেই সুযোগে এই ১৫ আগষ্টের শেষ রাত্রিতে সুপরিকল্পিত ভাবে শেখ মুজিবর তার ভগ্নিপতি ও মন্ত্রী আব্দুর রব সেরনিয়াবাদ ও শেখ সাহেবের আপন ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনির বাড়ি বিদ্রোহী সামরিক বাহিনী হানা দেয়। এবং তাদেরকে যার যার বাসস্থানে সপরিবারে হত্যা করে। এই অভ্যুথানের মাধ্যমে শেখ মুজিবর রহমান ও তার বাকশালের এক নায়কত্ব শাসনের সম্পূর্ণ পট পরিবর্তন ঘটে।

খোন্দকার মোশতাক আহমেদের রাষ্ট্রপতির আসন গ্রহণ

সামরিক বাহিনীর অফিসার ও জোয়ান যারা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই অভ্যুথান ঘটালেন তারা কেহই ক্ষমতায় না গিয়ে শেখ মুজিবর রহমানের মন্ত্রীসভার সদস্য ও বহুকালের সহযোগী খন্দকার মুশতাক আহমেদকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

প্রকাশ থাকে যে, এই নতুন রাষ্ট্রপতি নিজেও বাকশালের নেতা–এবং তিনিও বেছে বেছে বাকশাল নেতাদের নিয়ে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করেছিলেন। আর এই নতুন সরকারকে পরিচালিত করবার জন্য সামরিক অভ্যুথানের নেতৃস্থানীয় অফিসারগণ স্থান নিলেন বঙ্গভবনে। সামরিক অভ্যুথানের কর্মকর্তা ও বেসামরিক শাসন কর্তা ও তার মন্ত্রীপরিষদের মধ্যে মত বিরোধ হলে মধ্যস্থতা করতেন এককালের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম চীফ অব ষ্টাফ অবসর প্রাপ্ত জেলারেল আতাওল গনি ওসমানী।

এই সামরিক অভ্যুথানের বিরুদ্ধে যে সকল সামরিক অফিসার ও জোয়ান বিরোধিতা করতে লাগলেন তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। তাদের প্রধান দাবী ছিল দুটি;

(১) যে সকল অফিসার ও জোয়ান অভ্যুথান ঘটিয়েছে তারা রাষ্ট্রপতি ভবনে অবস্থান না করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে যার যার বাসস্থানে ফিরে আসতে হবে। এবং সরকারী কাজ কর্মে বাধা সৃষ্টি না করে যার যার নিজ নিজ সামরিক কর্তব্য পালন করতে হবে।

(২) ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে সেনা বাহিনীর চীফ অব ষ্টাফ করতে হবে। এই নিয়ে কয়েকদিন খুব যুক্তি তর্ক ও বাক বিতন্ডা চলে। শান্তিপূর্ণ ভাবে কোনই সুরাহা না হওয়াতে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ও তার সমর্থকরা তদানীন্তন চীফ অব ষ্টাফ লেঃ জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বন্দী করে কোন এক গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখে। খালেদ নিজেকে পদোন্নতির মারফতে চীফ অব ষ্টাফ ঘোষণা করাতে সমর্থ হন। এই ঘটনা ঘটে ৩রা নভেম্বর ১৯৭৫ সন। (যতদূর মনে পড়ে)

খালেদ মোশাররফ চীফ অব ষ্টাফ ঘোষিত হওয়ার পরে তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমেদের উপরে জোর চাপ সৃষ্টি করেন ১৫ই আগস্টের অভ্যুত্থানের সামরিক নেতাদের বঙ্গভবন থেকে বের করে ক্যান্টনমেন্টে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য। এই চাপের মুখে মোশতাক সরকারকে যেই সামরিক জান্তা ক্ষমতায় বসিয়েছে তাদেরকে প্রাণে বাঁচাবার জন্য ক্যান্টনমেন্টে না পাঠিয়ে কূটনীতির আশ্রয়ে তাদেরকে বিদেশে পাঠাতে সমর্থ হলেন।

রাজনৈতিক জেলহত্যা

প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমেদ ১৫ই আগষ্ট ক্ষমতায় বসে রাজনীতিক চাল চেলে তার বহু পুরাতন সহকর্মী বাকশালী নেতাদের তার সমর্থনে আনয়ন করলেন ও মন্ত্রীপরিষদেও কিছু কিছু বাকশালী নেতাকে আনয়ন করলেন। কিন্তু পারলেন না প্রবাসী সরকারের ও বাকশালের ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ, আরও একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (পাকিস্তান ন্যাশনাল গার্ড) মনসুর আলী ও প্রাক্তন মন্ত্রী কামরুজ্জামান হেনাকে। তারা খন্দকার মোশতাক আহমদকে দলত্যাগী, নীতিভ্রষ্ট ও বিশ্বাস ঘাতক ও খুনী বলে আখ্যায়িত করতেন। এই কারণে খন্দকার মুশতাক আহমেদ তাদেরকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন। কিন্তু অতি আশ্চর্য কে বা কাহারা, কার হুকুমে কেন্দ্রীয় কারাগার খুলে এই চার নেতাকে হত্যা করলেন যার আজও কোন অনুসন্ধান ও বিচার হলো না।

খালেদ মোশাররফের সামরিক অভ্যুত্থান ও খন্দকার মোশতাকের পদত্যাগ

১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ সনের সামরিক অভ্যুত্থানের সেনা কর্মকর্তাগণকে বাঁচাবার জন্য আড়াই মাসের রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক তাদেরকে যে ভাবেই হোক

বিদেশে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর নিজেকে অসহায় অনুভব করে ৩রা নভেম্বর ১৯৭৫ সন রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এ দিকে মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ নিজেকে চীফ অব ষ্টাফ ঘোষণা করে দিতে সরকারকে বাধ্য করেন। তিনি এই সুযোগে ডিপুটি চীফ মার্শাল-ল এডমিনিস্ট্রেটর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বন্দী করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের এক গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখেন। তখন ঢাকা শহর ও ক্যান্টনমেন্টে এক বিরাট অস্থিরতা বিরাজ করছিল। এই বিরাট অস্থিরতার মধ্যে ৩/৪ দিন অতিবাহিত হলো।

সিপাহী ও জনতার মিলিত গণ অভ্যুত্থান

৭ই নভেম্বর ১৯৭৫ সনে লেঃ কর্ণেল তাহের ও মেজর জলিলের নেতৃত্বে বিক্ষুব্ধ সিপাহী জনতা মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে তার বন্দী শালা থেকে উদ্ধার করে তাকে বাংলাদেশের প্রশাসনের পূর্ণ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত করেন। সারাটা ঢাকা শহর ও ক্যান্টনমেন্টে জিয়াউর রহমানের সমর্থক ও ভারতের আগ্রাসন বিরোধী জনগণের ঢল নামলো। সিপাই জনতা সব রাস্তা প্রদক্ষিণ করে সিপাহী জনতা জিন্দাবাদ জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ ভারতের আগ্রাসন মুরদাবাদ ভারতের দালাল খালেদ মোশাররফ মুরদাবাদ ধ্বনি দিতে দিতে সিপাহী জনতার অভ্যুত্থানের জয় ঘোষণা করেন।

মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ তার প্রাণ বাঁচাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেও বিফল মনোরথ হন। এবং নির্দয় ভাবে সিপাহীর গুলিতে নিহত হন।

খালেদ মোশাররফের দুর্ভাগ্য যে,তার ছোট ভাই আওয়ামী লীগ পার্টির সংসদ সদস্য ছিলেন। এবং তিনি তার বৃদ্ধা মাতা সাহেবানীর নেতৃত্বে খালেদ মোশাররফের শাসনের জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য ঢাকাতে এক বিরাট মিছিলের সমাবেশ করেন। আমার মনে হয় এতে খালেদ মোশাররফের জনপ্রিয়তা অর্জিত হয়ই নাই বরং ভারতের স্বপক্ষের লোক বলে– বাংলাদেশের সিপাহী জনতা সন্দেহ করতে লাগল। আর এই সন্দেহ-ই তার মৃত্যুর কারণ হলো। আমার নিজস্ব অভিমত এই যে, খালেদ মোশাররফ মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার দক্ষ সৈনিক, দেশপ্রেমিক, কিন্তু ক্ষমতালোভী সেনানায়ক ছিলেন। তিনি যখন তার স্বল্পকালীন শাসনামলে আর একজন মুক্তিযোদ্ধা সেক্টর কমান্ডার, দেশপ্রেমিক, লেঃ জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বন্দী করেছেন কিন্তু হত্যা করেন নাই হয়ত তার সাথে একটা সমঝোতায় আসার চেষ্টা করেছিলেন। তারপর খালেদ মোশাররফ যদি

ভারতীয় দালাল হতো তা হলে অতি সহজেই ভারতীয় হাই কমিশনের মাধ্যমেই হোক টেলিফোন বা বাঁতা বাহকের মাধ্যমেই হোক বা রেডিওর মাধ্যমেই হোক, বা তাকে সাহায্য করবার জন্য বাংলাদেশে প্রবেশের জন্য পূর্ণাঙ্গ তৈরী ভারতীয় সামরিক বাহনীকে বাংলাদেশে প্রবেশ করবার অনুরোধ জানাতে পারতেন তিনি যখন এর কোনটাই করেননি আমার নিজস্ব অভিমত খালেদ মোশাররফ আর যাই হোক ভারতীয় দালাল ছিলেন না।

লেঃ জেনারেল জিয়াউর রহমানের উত্থান ও পতন

শুনেছি কিন্তু কখনও দেখিনি মার্কিন সরকারের সি-আই-এ নাকি যে সব সমরনায়ক সরকার প্রধানের বা রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন তখন থেকে কখন কি বক্তৃতা দিতে হবে এবং কখন কি করতে হবে যা সবার জন্য প্রযোজ্য কয়েকটি বক্তৃতা এবং কর্মসূচী ইত্যাদি বই আকারে ছাপিয়ে রেখেছেন। উৎসুক সমরনায়কবৃন্দ সেই অনুকরণেই কাজ করলে মোটামুটি জনগণের সমর্থন আদায় ও সামরিক শাসন সাধারণের গ্রহণ যোগ্য করা যায়। দেখতে পেলাম ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান ও লেঃ জেনারেল জিয়াউর রহমান মোটামুটি একই ভাবে কথা বলেছেন, হ্যাঁ–না–ভোট দিয়েছেন। নিজস্ব শাসনতন্ত্র দিয়েছেন ও ইচ্ছা মতো সংসদ নির্বাচন দিয়েছেন। আমাদের দেশে একটু ব্যতিক্রম হলো এই যে, ১৯৭২ সনের প্রথম স্বাধীন বাংলার শাসনতন্ত্র রচনা করতে আওয়ামী লীগ সরকারের আইন ও সংসদীয় মন্ত্রীকে বেশ কয়েকবার দিল্লী সরকারের নিকট যাতায়াত করে ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতের অনুরূপ শাসনতন্ত্র আমাদের সংসদে পাশ করিয়ে নেয়া হয়। কিন্তু জিয়াউর রহমান সেখানে বিস্‌মিল্লাহির রহমানের রাহিম ও বেশ কয়েকটি সংশোধন সংসদে পাশ করে আমাদের শাসনতন্ত্র অনেকটা জনগণের গ্রহণযোগ্য করতে চেষ্টা করেন। তার পরে যেমন রাষ্ট্রপতি ফিল্ড মার্শাল আয়ুবের জামানায় আমাদের বর্তমান হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্ট বিল্ডিং, সেক্রেটারীয়েটের প্রথম সর্বোচ্চ বিল্ডিং জি, পি ও বিল্ডিং, বঙ্গভবন, বাংলাদেশ ব্যাংক ভবন, সোনালী ব্যাংক ভবন, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (বর্তমান জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর) সংসদ ভবন ইত্যাদি নির্মাণ করে তার সময়কার উন্নয়নের স্বাক্ষর রেখেছেন সেরূপভাবে জিয়াউর রহমান ও খাল খনন স্কীম, খেত খামার, ও কৃষি কাজের উন্নয়ন পকিকল্পনা ও রাস্তাঘাট নির্মাণ কার ধীরে ধীরে জনগণের অন্তর জয় করার প্রয়াস পান।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান

১৯৭৫ সনের ৭ই নভেম্বর ক্ষমতায় এসে ৩০ শে মে ১৯৮১ সন পর্যন্ত জিয়াউর রহমান স্বহস্তে রাজ শাসন করে দেশের যেমন উন্নয়ন করেছিলেন তেমন দেশের ভিতরে ও বাইরে কিছু ঈর্ষান্বিত শত্রুও সৃষ্টি করেছিলেন। শুধু তাই নয় তার জীবনের পরম শত্রুরা তারই সাথে বঙ্গভবনে এক সাথে কাজ করতেন। এবং তারা তথা কথিত বন্ধু-বান্ধবেরা সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন উচ্চ পদে অধিষ্টিত ছিলেন। লোকেরা বলেন ওরা সব ভারতীয় (Raw)-এর এজেন্ট ছিলো। এই সুবাদে ৩০ মে ১৯৮১সনে মধ্য রাত্রে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে বাংলাদেশের উদীয়মান রাষ্ট্রপতিকে আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা তারই সহযোগী ও সহকর্মিরা নির্মম ভাবে হত্যা করে।

জাষ্টিস আবদুস সাত্তারের শাসনভার গ্রহণ

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর স্বাভাবিক ভাবেই ভাইস প্রেসিডেন্ট জাষ্টিস আবদুস সাত্তারের উপর ক্ষমতা অর্পিত হয়। তার শাসনামলে ১৯৮১ সালের দিকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়– তার বিরুদ্ধে প্রার্থী ছিলেন আওয়ামী লীগের ডঃ কামাল হোসেন আরও কয়েক জন। নির্বাচনে সাত্তার সাহেব প্রেসিডেন্ট হিশেবে জয় লাভ করেন।

কিন্তু হলে কি হবে? আবার সামরিক শাসনের কালো মেঘ বাংলাদেশের আকাশ আচ্ছন্ন করে। রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তারকে অপসারিত করে চীফ অব ষ্টাফ লেঃ জেনারেল হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ ১৯৮২ সনের ২৪ শে মার্চ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা দখল করেন।

রাষ্ট্রপতি লেঃ জেনারেল এরশাদের আগমন ও প্রস্থান

তিনিও তার পূর্বসূরী সামরিক শাসকদের ক্রিয়া কর্মের মোটামুটি অনুসরণ ও অনুকরণ করেন। হাঁ–না ভোট করেন। সংসদের নির্বাচন দেন। অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেন। কিন্তু দেশের বৃহত্তম দল, বি, এন. পি। আওয়ামী লীগ, ছোট ছোট দলসহ নির্বাচনে অসদুপায়ে কারচুপি, ভোট ডাকাতি। মিডিয়া ক্যু হয়েছে বলে বহু সভা, শোভাযাত্রা, সুদীর্ঘ দশ বৎসরব্যাপী রক্তক্ষয়ী গণআন্দোলন করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত গণআন্দোলন জয়লাভ করে। ফলে ১৯৯০ সনের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ পদত্যাগ করে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতি হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ

নির্দলীয় সুপ্রিম কোর্টের চীফ জাষ্টিস শাহাবুদ্দিনের হস্তে অন্তর্বতী সরকারের নিকট অর্পণ করে প্রস্থান করতে বাধ্য হন।

সুপ্রীম কোর্টের মহামান্য বিচারকদের সুখ্যাতি রাজনীতির অঙ্গনে ব্যবহারের অশুভ পায়তারা

পৃথিবীর সকল দেশেই হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্ট বা দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারক মন্ডলীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়। কারণ মজলুম জনগণ ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচার পাবার আশায় তাদের ফরিয়াদ নিয়ে ধাপে ধাপে দেশের সর্বোচ্চ বিচারলয়ের বিচারকের নিকট হাজির হন। জনগণ প্রত্যাশা করে যে, এই বিচারালয়ের বিচারকগণ বিপক্ষ যতই শক্তিধর লোক হোক না কেন, এমনকি সব চেয়ে শক্তিধর সরকার হোক না কেন, ন্যয়বিচার ঠিকই করবেন। দেশে আইনের শাসন কায়েম রাখবেন। কিন্তু দেশবাসির সেই প্রত্যাশা জলাঞ্জলি দিয়ে নিজস্ব স্বার্থের খাতিরে, প্রেসিডেন্ট ভবনের আরাম-আয়াশ ভোগ করার জন্য এবং রাষ্ট্রপতির মহাআড়ম্বর পূর্ণ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য যদি কোন অবসর প্রাপ্ত বা কর্মরত সুপ্রীম কোর্টের মহা বিচারক একনায়কত্ব ও স্বৈরতন্ত্রের সাথে সহযোগিতা করবার জন্য তারা ক্ষমতা বিহীন রাষ্ট্র প্রধানের পদ অলংকৃত আর স্বৈরাশাসকের কালো আইনে দস্তখত দেন, আমার মনে হয় সেই সব মহা বিচারকগণ ঐরূপ কার্য দ্বারা সুমহান সুপ্রীম কোর্ট ও তার সদস্য পদ এর অমর্যাদা করে থাকবেন। যেমনটা দেখা গিয়েছিল ১৯৭২ সনের পর থেকে ১৯৮৩ সন পর্যন্ত জাষ্টিস আবু সাঈদ চৌধুরী, জাষ্টিস সায়েম ও জাষ্টিস আহসান উদ্দীন চৌধুরীর বেলায়।

তবে ১৯৯০ সনে সুপ্রীম কোর্টের মহামান্য চীফ জাষ্টিস শাহাবুদ্দীন সাহেব বাংলাদেশের অন্তর্বতী সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করে যে ভাবে ন্যায় ও আইনের সুশাসন কায়েম করেছিলেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম বারের মতো নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠ নির্বাচন দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম বারের মতো একটি গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করে বি, এন, পি সভানেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার হাতে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা প্রত্যার্পন করে আবার সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারকের আসনে স্বেচ্ছায় ফিরে যাওয়ার বিরল নিদর্শন প্রদর্শন করে গিয়েছেন তা বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। পূর্বসুরী তিন মহাবিচারকগণ যাই করে থাকুন না কেন এই বিরল দৃষ্টান্ত হাই কোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের গৌরব শতগুণ বর্ধিত হয়ে বাংলাদেশের জনগণের চোখের সামনে প্রতিভাত হতে থাকবে।

১৯৮৬ সনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আমার অংশ গ্রহণ

পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে দেখা যায় কোন দেশের স্বৈর শাসনের বিরুদ্ধে জনগণ যখন উত্তাল হয়ে উঠে– তখন সুচতুর স্বৈরশাসকরা জনগণকে ধোকা দেয়ার জন্যই গণতন্ত্রের নামকাওয়াস্তে নির্বাচন দেয়। আসলে এ নির্বাচনের লক্ষ্য সাময়িক ভাবে জনগণের রাজ পথের আন্দোলনকে স্তিমিত করা। যদিও এই নির্বাচন দিয়েই ভোট কারচুপি, ভোট ডাকাতি, ভোট বাক্স ছিনতাই, মিডিয়া ক্যু ইত্যাদির মারফত নিজেরাই আবার ক্ষমতায় ফিরে আসেন। আমাদের দেশেও এ অবস্থা হয়েছিল ১৯৮৬ সনে যখন হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন দিয়েছিলেন।

এদিকে গণতন্ত্রকামী রাজনৈতিক নেতারাও এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে এই আশায় যে এতে জিতবার কোন আশা না থাকলেও অন্ততঃ নির্বাচনের প্রার্থী হিশেবে স্বৈর শাসকের বিরুদ্ধে সঠিক সত্য দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য কিছু কথা বলা যাবে। কারণ গদিনশীল রাষ্ট্রপতি যতই স্বৈরাচারী হোক না কেন নির্বাচন দিয়ে সে বিরুদ্ধ পক্ষের প্রার্থীদের আইনত মুখ বন্ধ করতে পারে না। এই সুযোগ অন্য সময় থাকে না।

আমিও জানতাম এই নির্বাচনে আমার জিতবার কোনই আশা নেই তবুও আমি শুধু নির্বাচনে সময় ও সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্রপতি এরশাদের বিরুদ্ধে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলাম। যারা সামরিক ইউনিফর্ম পরে রাষ্ট্রপতির গদি দখল করে, স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করে, দেশ প্রেমিক সামরিক বাহিনীকে নিজের স্বার্থের কাজে সামরিক বাহিনীর পবিত্র দায়িত্ব পালনে কলঙ্ক সৃষ্টি করে, এই নির্বাচনের সুযোগে সরকারী পর্যায়ে তাদের সম্বন্ধে অনাগত ভবিষ্যতের জনগণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য যা তখন প্রকাশ্যে নির্বাচনের নিয়মানুযায়ী ছাপিয়ে প্রকাশ করেছিলাম এবং যার কপি সরকারী নির্দেশ অনুসারে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে দেয়া হয়েছিল এবং প্রকাশ্যে ভোটারদের মধ্যে বিলি করেছিলাম তার কিছু উদ্ধৃতি দিলাম;

প্রেসিডেন্ট পদ প্রার্থী আলহাজ্ব মেজর (অবঃ)
মোহাম্মদ আফসার উদ্দীন সাহেবের
গণতন্ত্র বাস্তবায়নের সংগ্রাম

আলহাজ্ব মেজর (অবঃ) মোহাম্মদ আফসার উদ্দীন, পিতা মরহুম মৌলভী ওসমান গনি, ১৯২০ সনে বাকেরগঞ্জ জেলার অর্ন্তগত হিজলা উপজেলায় শ্রীপুর

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া

গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বরিশালে শিক্ষা সমাপ্তির পর ১৯৪২ সনে তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৪৩ সনে তিনি কৃতিত্বের সাথে ভারতীয় মিলিটারী একাডেমী হতে গ্রাজুয়েশন লাভ করে রাজকীয় কমিশন প্রাপ্ত আর্মি অফিসার সেকেন্ড ল্যাফটেন্যান্ট নিযুক্ত হন।

যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলছিল তখন একজন পদাতিক অফিসার হিসাবে আলহাজ্ব মেজর (অবঃ) মোহাম্মদ আফসার উদ্দীন শত্রুর বিরুদ্ধে জীবন পণ লড়াই করেন। এবং তিনি বিভিন্ন সময় অভিযানিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসাবে বার্মা, শ্রীলংকা, ইরান, ইরাক, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, লেবানন, জর্দান, মিশর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কর্মরত ছিলেন। তিনি ফিল্ড মার্শাল মন্ট গোমারীর অষ্টম আর্মির সদস্য হওয়ার বিরল গৌরব অর্জন করেন। তিনি তাঁর তীক্ষ্ম মেধা, দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতার জন্য বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর সবচেয়ে অল্প বয়স্ক মেজর নিযুক্ত হন। তিনি ও মরহুম মেজর আব্দুল গণি ১৯৪৮ সনে একত্রে ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন করেন এবং ইহার তিনটি ব্যাটেলিয়ান মঞ্জুর করান। মুসলিম অধ্যুষিত কাশ্মিরে ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তিনি পাক বাহিনী নিয়ে জেহাদ করেন। ১৯৫৬ সনে তিনি সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

সামরিক বাহিনী হতে অবসর নেয়ার পর তিনি বাংলাদেশ আভ্যন্তরীন নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ গঠনে সৈয়দ মাসুদ হোসেন (প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান)–এর সাথে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বাঙ্গালী জাতির মধ্যে সামরিক চেতনা উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে তিনি তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানবাসী প্রাক্তন সামরিক বাহিনীর সদস্যদের সংঘবদ্ধ করেন এবং দেশ রক্ষা সপ্তাহ উদযাপন করেন। এই দেশ রক্ষা সপ্তাহ উদযাপনের ফলশ্রুতিতে আওয়ামী লীগের বিখ্যাত ৬ দফা ও ছাত্রলীগের ১১ দফার মধ্যে প্রথম বারের মত একটা দফা মিলিশিয়া সম্বন্ধে লেখা হয়। ১৯৫৯ সনে তিনি রোমে (ইটালী)এবং ১৯৬১ সনে প্যারিসে (ফ্রান্স) বিশ্ব প্রাক্তন সামরিক বাহিনীর সাধারণ সভায় পূর্ব পাকিস্তান প্রাক্তন সামরিক বাহিনীর সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব করেন ও তাহাদের দাবী দাওয়া তুলে ধরেন।

১৯৫৮ সন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত তিনি সক্রিয় রাজনীতি করে আসছেন। ১৯৬২ সনে তিনি তদানিন্তন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হন এবং একই সময় পাকিস্তান দেশরক্ষা পরিষদ-এর চেয়ারম্যান-এর দায়িত্ব পালন করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী দাওয়া জোরালো ভাষায় পেশ করেন। ১৯৬৪

সনে তিনি পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী থাকা কালীন তারই অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের জন্য আরও সাতটি ব্যাটালিয়ান গঠন করার মঞ্জুরী করান। বাঙ্গালী অফিসারদের মেজর পদ থেকে প্রমোশনের রুদ্ধ দ্বার খুলেদেন। প্রথমবারের মত এক স্কোয়াড্রন জঙ্গি বিমান এক রেজিমেন্ট আর্টিলারী পূর্ব পাকিস্তানে আসে এবং আর্মি নেভী ও এয়ারফোর্সে বাঙ্গালী ভর্তি করার ব্যাপারে নগন্য হারকে বৃদ্ধি করান। পরবর্তীকালে তারা স্বাধীনতা সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

১৯৮০ সনে তিনি বৈরুতে পি, এল, ও চেয়ারম্যান ইয়াসীর আরাফাতের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এবং বাংলাদেশী মুজাহিদদের নিয়ে তিনি মসজিদুল আক্সাসহ প্যালেষ্টাইন উদ্ধার করার জন্য ইসরাইলী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জেহাদ করেন।

বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক কারণে তিনি ইটালী, ফ্রান্স, জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, বেলজিয়াম, লুকসেমবার্গ, হল্যান্ড, ডেনমার্ক ও ইংল্যান্ড যান এবং ধর্মীয় ও শিক্ষানুষ্ঠানে তিনি একাধিকবার মুসলিম জাহানের ইরান, ইরাক, তুরস্ক, জর্দান, সিরিয়া, লেবানন, প্যালেষ্টাইন, মিশর, কাতার, কুয়েত ও সৌদী আরব যান। তিনি দুইবার পবিত্র হজ্ব ব্রত পালন করেন।

বিগত দশ বৎসর যাবত তিনি ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এন, ডি, পি)- এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং দশ দলীয় ঐক্য জোট বাংলাদেশ গণতন্ত্র বাস্তবায়ন পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি বাংলাদেশ ইমাম সমিতির সভাপতি সহ বাংলাদেশ মসজিদ সমাজ এবং কয়েকটি ধর্মীয় ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে বিশেষভাবে জড়িত আছেন।

নিম্নলিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি

লক্ষ্যঃ

স্বৈরাচারী সামরিক সরকারে চির-সমাধি রচনা করে শোষণহীন, স্বনির্ভর সুখী সমৃদ্ধশালী গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

উদ্দেশ্যঃ

১। এমন গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করা যাতে সামরিক বাহিনীর উচ্চাভিলাসী কোন ব্যক্তি নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করতে না পারে।

২। সর্বস্তরের নির্বাচনে ভোট ডাকাতি, কারচুপি, মিডিয়া-ক্যু ইত্যাদি শক্ত

গ্রন্থাগার
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

বাংলাদেশ মুজাহিদ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আলহাজ মেজর (অবঃ) মুহাম্মদ আফসার উদ্দিন ও পি.এল. ও'র মুজাহিদ বাহিনীর সদস্য বৃন্দইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত (১৯৮০)

১৯৮০ সনে ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত টায়ার সেক্টর কমান্ডারদের সঙ্গে বাংলাদেশ মুজাহিদ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মেজর আফসার উদ্দিন রণকৌশল নিয়ে কথা বলছেন।

হস্তে দমন করে জনগণের ভোটাধিকারের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

৩। সরকারী আমলাদের ঘুষ-দুর্নীতি কঠিন হস্তে দমন করে জাতির অর্থনৈতিক ও চারিত্রিক অবক্ষয় রোধ করা।

৪। অস্ত্রধারী দুস্কৃতিকারী গুন্ডাদের শিক্ষাঙ্গণ থেকে বিতাড়িত করে শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করে গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামুলক ও অবৈতনিক করা এবং পুরানো প্রতি জেলায় বিশ্ববিদ্যালয়/ কারীগরী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা।

৫। যে কোন রাষ্ট্রের সামরিক আগ্রাসনের মুখে যে কোন মূল্যে আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা।

৬। দেশ থেকে খুন-খারাবী, হাইজ্যাকিং, নারী ধর্ষণ, শিশুহত্যা, মাস্তানী ইত্যাদি কঠিন হস্তে দমন করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা।

৭। অসৎ ব্যবসায়ীদের দূর্নীতি, চোরচালানী ও কালোবাজারীদের আইনের মাধ্যামে কঠোর হস্তে দমন করে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার নিশ্চয়তা বিধান করা।

৮। সংগ্রামরত শ্রমিক-কর্মচারী ডাক্তার-নার্স, ছাত্র, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের ন্যায্য দাবীর সম্মানজনক সমাধান করা।

৯। শিল্পের বিকাশ ও শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার্থে সুষ্ঠু শিল্প ও শ্রমনীতি প্রণয়ন করে তা বাস্তাবায়ন করা।

১০। পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে আমরা ''সবার সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে বিরোধ নয়'' এই নীতি অনুসরণ করা। বিশেষ করে মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে নিবিড় ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে তোলা।

আলহাজ্ব মেজর (অবঃ) মোহাম্মদ আফসার উদ্দীন

দেশবাসীর নিকট আলহাজ্ব (অবঃ) মোহাম্মদ আফসার উদ্দীন সাহেবের আবেদন

প্রিয় দেশবাসী,

আস্‌সালামু আলাইকুম। আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন দেশ ও জাতির জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে বিগত উপজেলা ও সংসদ নির্বাচনের অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে হচ্ছে– এ নির্বাচনই হয়তো দেশের ভবিষ্যত নির্ধারণ করবে। এমন এক সময় দেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হতে যাচ্ছে যখন দেশে মহাদূর্যোগের

১৯৮৯ সনে ২২শে জুলাই যশোহর বেনাপুল বর্ডারে ভারতের বঙ্গসেনা তাড়াতে বাংলাদেশের মুজাহিদ বাহিনী পরিচালনা করছেন সর্বাধিনায়ক মেজর আফসার উদ্দিন।

শ্রীপুর গ্রামে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আফসার উদ্দিন সিনিয়র মাদ্রাসা।

মিসরের বিখ্যাত আল-আজাহার ইউনিভার্সিটি কর্তৃক আফসার উদ্দিন সিনিয়র মাদ্রাসাতে ডেপুটিশনে প্রেরিত প্রফেসর জনাব আল মাকসুদের সঙ্গে মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও গ্রন্থকার মেজর মুহাম্মদ আফসার উদ্দিন।

পারিবারিক পরিবেশে লেখকের জৈষ্ঠ পুত্র, পুত্রবধু ও তাদের ছেলেমেয়েকে দেখা যাচ্ছে।

পারিবারিক পরিবেশে গ্রন্থকার ও তাঁর পরিবার পরিজন

ঘনঘটা আসন্ন, জাতি হতাশায় তমসাচ্ছন্ন, বেদনায় মুহ্যমান–পিঞ্জিরাবদ্ধ পাখীর মতো মুক্তির প্রত্যাশায় ছটফট করছে তার প্রাণ।

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে এদেশে বারবার পট পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু আজও সাধারণ মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি। কেননা বিভিন্ন সময় যারা ক্ষমতায় এসেছিল তারা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি ছিল না, তারা সব সময়ই ধনী শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করতো।

দেশের অর্থনীতি আজ পঙ্গু। বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা ঋন করে তা ব্যয় করা হচ্ছে উচ্চপদস্থ সরকারী আমলাদের ভোগ বিলাস ও অনুৎপাদনশীল খাতে। উৎপাদনের রাজনীতির নামে মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থে জাতীয়করণকৃত মিল-কারখানা পানির দরে বিক্রি করা হচ্ছে ফলে পূঁজীবাদী অর্থনীতির ধারা অনুযায়ী দেশের ধন-সম্পদ কুক্ষিগত হচ্ছে সেই কতিপয় মুখচেনা লোকের হাতে। দিন দিন ধনী আরো ধনী এবং দরিদ্র আরো দরিদ্র হচ্ছে। শতকরা আশিজন লোকের জীবন যাত্রার মান দারিদ্র সীমার নীচে নেমে গেছে। গ্রাম বাংলার হাজার হাজার লোক অর্ধাহারে অনাহারে মানবেতর জীবন যাপন করছে। ঠিক তখন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জেনারেল এরশাদ সাহেব জনগণের পয়সায় হেলিকাপ্টারে ঘুরে ঘুরে গ্রামে-গঞ্জে যেয়ে তার সরকারের গুণকীর্তনে ব্যস্ত আছেন।

যে দূর্নীতির কথা বলে সামরিক সরকার নির্বাচিত সাত্তার সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতায় এলো সে দূর্নীতি আজ সমাজের সর্ব্বোচ্চস্তর থেকে শুরু করে সমাজের প্রায় সর্বস্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাসা বেঁধেছে। যাদের দূর্নীতিবাজ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল পর্যায়ক্রয়ে তাদেরকে নিয়েই গঠিত হয়েছে বর্তমান সরকারের মন্ত্রীসভা এমনকি সাজাপ্রাপ্ত এবং দূর্নীতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মন্ত্রীসভা থেকে বিতাড়িত সদস্যরাও বাদ পড়েনি। বর্তমান প্রেসিডেন্ট যেন ঘুষ দূনীতির পারমিট দিয়ে দিয়েছেন– তার প্রমাণ সরকারী কোন কাজ করাতে গেলে পেয়ে থাকবেন হয়তো।

আজ সমাজের কোন স্তরে আইনের শাসন নেই, আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতির সুবাদে খুন-খারাবী, হাইজ্যাকিং, নারীধর্ষণ, শিশু হত্যা ইত্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যুব সমাজের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। যুব ও ছাত্র সমাজের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে অস্ত্র ফলে সমাজে ছিনতাই, রাহাজানি, ডাকাতি ইত্যাদি মারাত্মক ভাবে গেছে বেড়ে। শিক্ষাঙ্গন পরিণত হয়েছে রণক্ষেত্রে, শিক্ষার

পরিবেশ হয়েছে বিঘ্নিত, ফলে চার বছরের শিক্ষাবর্ষ ৬/৭ বছরেও শেষ হয় না। শিক্ষার মান নিম্নমুখী, আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষার দাম গেছে কমে। আজও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হয়নি।

বর্তমান সামরিক সরকার গণতন্ত্রে উত্তরণের নামে বিগত উপজেলা, বিশেষ করে সংসদ নির্বাচনে তাদের অনুগত একশ্রেণীর মাস্তানদের দ্বারা ভোটকেন্দ্র দখল, সন্ত্রাস, কারচুপি, ভোট ডাকাতি করে জনতার গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরণ করা হয়েছে। বিচার বিভাগ সহ সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা আজও দেয়া হয়নি, সংগ্রামরত শ্রমিক-কর্মচারী, ডাক্তার-নার্স, সাংবাদিক, ছাত্রসমাজের দাবী সহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের ন্যায্য দাবী আজও মেনে নেয়া হয়নি।

বর্তমান সামরিক সরকারের অনুসৃত নতজানু পররাষ্ট্র নীতির ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় ভাবমূর্তি হয়েছে বিনষ্ট, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন প্রায়। দক্ষিণ তালপট্টি সহ বাংলাদেশের বহু জায়গা আজও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের দখলে, বেরুবাড়ি করিডোর মরুভূমি হতে চলেছে কিন্তু ফারাক্কা সমস্যা আজও সমাধান করা হয়নি। উপরন্তু চলছে তাদের সামরিক বাহিনীকে বিভিন্ন মারণাস্ত্রে সজ্জিত করে আধুনিকীকরনের প্রক্রিয়া যা নিঃসন্দেহে আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি স্বরূপ। এ বিস্ফোরনুখ অবস্থা দেশ ও জাতির জন্য কোন অবস্থাতেই শুভ হতে পারেনা।

কাজেই প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমার, দেশের এই বিপর্যয়ের সময় আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না। তাই আমরা জাতির চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করেছি নির্বাচন যাতে এরশাদ সাহেব, খালি মাঠে গোল করতে না পারেন। গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে নির্বাচন হচ্ছে প্রথম ও পূর্ব শর্ত। আমি কথা দিচ্ছি আল্লাহর রহমতে নির্বাচনে জয়ী হলে জাতির সামনে দেয়া আমার ওয়াদা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো ইন্‌শাল্লাহ। আর জয়ী না হলেও সংগ্রামী জনতার সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে আমরণ জেহাদ চালিয়ে যাবো।

মনে রাখবেন ভোট আপনাদের গণতান্ত্রিক অধিকার, গত উপজেলা ও সংসদ নির্বাচনের মতো এবারও সে অধিকার কেড়ে নিতে পারে– তাই প্রত্যেক গ্রামে-গঞ্জে, মহল্লায় মহল্লায় ''ভোট ডাকাতি প্রতিরোধ কমিটি'' গঠন করে তার উপযুক্ত জবাব দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন। নির্বাচন বর্জন করলেই নির্বাচন বন্ধ থাকে না যা গত উপজেলা ও সংসদ নির্বাচনে প্রমাণিত হয়েছে– তাই আসুন আমরা দলমত নির্বিশেষে সবাই মিলে নির্বাচনের মাধ্যমে সামরিক সরকারকে বৈধতার সার্টিফিকেট না দিয়ে দেশে আবার গণতান্ত্রিক সরকার ফিরিয়ে আনি।

ইচ্ছা থাকা সত্বেও সময়ের অভাবে আপনাদের সবার সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে দোয়া নিতে পারলাম না বলে দুঃখিত। তাই প্রচার পত্রের মাধ্যমে আমার আরজি পেশ করলাম। আশা করি আমার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। পরিশেষে আপনাদের নিকট আমার আকুল আবেদন আমাকে প্রেসিডেন্ট পদে তলোয়ার মার্কায় ভোট এবং সাধ্যানুযায়ী নৈতিক, আর্থিক ও কায়িক সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে উল্লেখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো বাস্তাবায়ন করে আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিন। এবং নব্য দখলদার বাহিনী 'উড়ে এসে জুড়ে বসা' সামরিক সরকার যদি বিগত নির্বাচনগুলোর মতো নির্বাচনের ফলাফলকে পাল্টিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে তবে এমন দুর্বার গণআন্দোলন সৃষ্টি করুন যার তোড়ে ভেসে যায় স্বৈরাচারী সামরিক জান্তা। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন। আমীন। বাংলাদশে জিন্দাবাদ। গণতন্ত্র বাস্তাবায়ন পরিষদ জিন্দাবাদ। ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি জিন্দাবাদ। গণতান্ত্রিক আন্দোলন জিন্দাবাদ।

আলহাজ মেজর (অবঃ) আফসার উদ্দীন

আমার কিছু আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় ক্রিয়াকর্ম।

ঐতিহাসিক ও আন্তর্জাতিক ক্রিয়া কর্মঃ

১। বাকেরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত হিজলা থানার অধিবাসী আলহাজ্ব মেজর (অবঃ) মোহাম্মদ আফসার উদ্দীন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (১৯৩৯-১৯৪৫) এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন রণক্ষেত্রের বীর সেনানী। তিনি পাকিস্তানের পাঞ্জাব রেজিমেন্ট থেকে ১৯৫৬ সনে অবসর গ্রহণ করেন।

২। তিনি বিশ্ব প্রাক্তন সামরিক সংস্থার আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে যোগ দিতে ১৯৫৯ সনে ইটালীর রাজধানী রোমে এবং ১৯৬১ সনে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে যোগদান করেন। সেই বৎসরই লন্ডনে অনুষ্ঠিত যুক্তরাজ্যের সকল প্রাক্তন সামরিক সংস্থার যুক্ত কনফারেন্সে যোগ দিতে আমন্ত্রিত হন।

৩। ইরাকের রাজধানী বাগদাদে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ইসলামী কনফারেন্সে তিনি একবার ১৯৮৫ সনে ও দ্বিতীয়বার ১৯৯০ সালে যোগদান করেন। তখন তিনি ইরাকের রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হোসেনের সাথে আন্তরিকভাবে সাক্ষাত লাভ করেন। বাগদাদে অবস্থানকালে তিনি বড়পীর হজরত আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) এর মাজার জিয়ারত করেন ও দেশবাসী সকলের মঙ্গলের জন্য মুনাজাত করেন।

৪। তিনি চেয়ারম্যান সৈয়দ মাসুদ হোসেনের সংগে ১৯৫৮ সনে ইনল্যান্ড

ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (আই, ডব্লিউ, টি, এ) প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠান তাহাকে ১৯৬১ সালে সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, লুকসেম্বার্গ, হল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডে আভ্যন্তরীন নৌ চলাচল ও নৌ যানের উন্নয়ন প্রভৃতি জেনে আসার (ষ্ট্যাডি করার) জন্য পাঠান।

৫। তিনি দু'বার পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন (১৯৭৮ ও ১৯৮০ সন)।

৬। তিনি বাংলাদেশ মুজাহিদ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ইয়াসির আরাফাতের আহবানে ১৯৮০ সনে বাংলাদেশী মুজাহিদ নিয়ে পি, এল, ও এর সাথে যৌথভাবে বায়তুল মোকাদ্দাস ও মসজিদুল আক্সা সহ ফিলিস্তিন রাষ্ট্র উদ্ধারের জন্য ইসরাইলী ইহুদীদের বিরুদ্ধে জেহাদে অংশ গ্রহন করেন।

জাতীয় ক্রিয়া কর্মঃ

৭। স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের উভয় অংশের রক্ষণ ব্যবস্থা মজবুত করতে তিনি মরহুম মেজর গনির সাথে একত্রে ১৯৪৮ সনে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন করেন। এই রেজিমেন্টের অফিসার মেজর (পরে লেঃ জেনারেল ও রাষ্ট্রপতি) জিয়াউর রহমান আমাদের স্বাধীনতা ঘোষনা করেন ও মুক্তিযুদ্ধের জন্য দেশবাসীকে আহবান করেন। তার আহবানে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

৮। হিজলা মুলাদী ও মেহেন্দীগঞ্জ থানা এলাকা হতে তিনিই সর্ব প্রথম পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন (১৯৬২ সনে)। এর পূর্বে এই এলাকা হতে অন্য এলাকাবাসী এমনকি অন্য জিলাবাসী পর্যন্ত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হতেন। পাকিস্তান সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর তিনিই এই এলাকাবাসীর মধ্যে সর্বপ্রথম পাকিস্তান বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তান রক্ষণ ব্যবস্থা আরও মজবুত, সামরিক বাহিনীতে নগন্য ৫% থেকে বাড়িয়ে অন্ততঃ পক্ষে ৫০% পূর্ব পাকিস্তানবাসী ভর্তি করা, পাকিস্তান রক্ষণব্যবস্থা আরও মজবুত করতে অরক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানে যুক্ত সামরিক বাহিনীর অপারেশনাল হেড কোয়াটারস স্থাপন এবং পর্যাপ্ত সামরিক বাহিনী মোতায়েন রাখা, প্রত্যেক সামরিক বিভাগের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের মত পূর্ব পাকিস্তানেও ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন, বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা দান ও গ্রাম গঞ্জে গণবাহিনী গঠন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

৯। তিনি স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অবসানের জন্য ১৯৮৬ সনে প্রেসিডেন্ট হুসেইন

মোহাম্মদ এরশাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বলাবাহুল্য নির্বাচনে সীমাহীন কারচুপি ও মিডিয়া ক্যুর মারফতে মিঃএরশাদ তাকে পরাজিত করেন। মেজর (অবঃ) মোহাম্মদ আফসার উদ্দীন ব্যতিত আর কোন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এবং পাকিস্তান জাতীয় সংসদের অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ রাজনীতির অঙ্গনে নেই বা বেঁচে নেই।

সাবেক সৈনিক, রাজনীতিবিদ, এখন গ্রন্থকারঃ

১০। তিনি ''আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ'', ''দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও আমার সৈনিক জীবন'' এবং ''আমার দেখা বৃটিশ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ'' নামে তিনটি বই রচনা করেছেন। আরও কিছু বই লেখার উপাদান মজুত আছে।

বাকেরগঞ্জ জেলার উন্নয়নের প্রচেষ্টা ঃ

১১। তার বিশেষ উদ্যোগে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল রহমতপুরে সুপারী গবেষণা ইনষ্টিটিউট, গৌরনদী কলেজ, পাতার হাট আর. সি. কলেজ ও মুলাদী কলেজ স্থাপিত হয়।

১২। তার একক চেষ্টায় হিজলা, মুলাদী ও মেহেন্দীগঞ্জ থানায় বেতার টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস স্থাপন করা হয়।

হিজলা থানার উন্নয়নে তার অবদানঃ

১৩। বহু বৎসর পূর্বে হিজলা থানা বদরটুনী মৌজায় থাকাকালীন এই থানার নাম ছিল বদরটুনী থানা। বদরটুনী মৌজা কালক্রমে মেঘনা নদী গর্ভে বিলীন হওয়ার পর এই থানা সাবেক হিজলা মৌজায় স্থানান্তরীত হলে পরে এর নাম বদলী করে মৌজার নাম অনুসারে ''হিজলা থানা'' নাম রাখা হয়। কালক্রমে সাবেক হিজলা মৌজা মেঘনা নদী গর্ভে বিলীন হওয়ার পর তিনিই হিজলা থানাকে ১৯৬৩ সনে শ্রীপুর মৌজায় বর্তমান স্থানে নিজ খরচে থানার জন্য টিনের ঘর তুলে পুনঃস্থাপিত করেন। পরে তারই তদবিরে এই থানার সকল ঘর সরকার দালান করে দেয়। কিন্তু আজ প্রায় ৩০ বৎসর অতিবাহিত হতে চলল থানার পুরানো নাম বর্তমান মৌজার নামে শ্রীপুর থানা না হয়ে হিজলা থানাই রয়ে গেল কেন তার কোন যক্তি নেই।

১৪। তিনি এই থানার দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি

সরকারকে দান করেন এবং সরকার কর্তৃক পাকা দালান তৈরী করার তদবির করেন। যতদিন এই থানায় হাসপাতাল মঞ্জুর না হয়, ততদিন এই দাতব্য চিকিৎসালয়ই হিজলা থানার আপামর জনসাধারণের খেদমত করে। পরে অবশ্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হয়।

১৫। এই থানার ডাক বাঙ্গলো স্থাপন করতে তিনি সরকারকে একবিঘা জমি দান করেন। এই জমির উপরে তারই চেষ্টায় পরবর্তীতে দালান তৈরী হয়।

১৬। এই থানার ৩/৪ মাইলের মধ্যে কলেজ তো দূরের কথা কোন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও না থাকাতে তিনি নিজ খরচে থানা সদরে ১৯৬৯ সনে সংহতি (পাইলট) উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

১৭। তার ঐকান্তিক চেষ্টায় ও এককালীন ৫০,০০০/= (পঞ্চাশ হাজার) টাকা দানে হিজলা কলেজটি স্থাপিত হয় এবং পরীক্ষার সেন্টার মঞ্জুর করা হয়।

১৮। তার একক চেষ্টায় ও প্রায়, ৫,০০,০০০/= (পাঁচ লক্ষ) টাকা ব্যয়ে হিজলা থানা সদরে আফসার উদ্দীন সিনিয়র মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরীক্ষার সেন্টার মঞ্জুর হয়। তারই ঐকান্তিক চেষ্টায় মিশর সরকারের সহায়তায় ঐতিহাসিক আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় হতে একজন অভিজ্ঞ মিশরী প্রফেসর এই মাদ্রাসায় পড়াইবার জন্য আনা হয়। এই নজীর বিহীন সুযোগ বাংলাদেশে আর কোন মাদ্রাসায় আজও হয়নি।

১৯। তারই দানকৃত জমির উপরে সরকারী মঞ্জুরী প্রাপ্ত ''সালেহা ওসমান গনি শিশু সদন (এতিমখানা)'' এই থানা সদরে অবস্থিত।

77744

গ্রন্থাগার
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

মেজর (অবঃ) মোহাম্মদ আফসার উদ্দিন লিখিত 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও আমার সৈনিক জীবন' একখানা অপূর্ব পুস্তক। এতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে এদেশের বুকে যে পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল সে সম্বন্ধে যেমন সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি এ বিশ্বের তৎকালীন ও পরবর্তী জীবনের আভাষ পাওয়া যায়। বর্তমানকালে আমাদের দেশে নানা রাজনৈতিক দলের আবির্ভাবের ফলে দেশের বুকে যে সব কান্ডকারখানা দেখা দিয়েছে তার সঠিক ও সত্যরূপের সন্ধান পাওয়া প্রায়ই দুর্লভ। আফসার উদ্দিন সাহেব এক্ষেত্রে অত্যন্ত সততার পরিচয় দিয়েছেন বলে তিনি ধন্যবাদের পাত্র। তার নিকট আমরা এ জাতীয় আরও পুস্তকাদি লাভের প্রত্যাশা করি।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ
(জাতীয় অধ্যাপক)
১০-১০-৯২ইং

বর্ষীয়ান বুদ্ধিজীবী জনাব মোহাম্মদ আজরফ-এর প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্য নিয়ে এই নব মুদ্রিত **'আমার দেখা বৃটিশ-ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ'** নামক বইখানি আশা করি আমাদের বর্তমানকালের প্রেক্ষাপটে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে।

মোহাম্মদ মঈনউদ্দিন
প্রকাশক